ডা. নীলমণি দেববর্মন

গদ্যসংগ্রহ

জনশিক্ষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রবন্ধ

ডা. নীলমণি দেববর্ম্মন

গদ্যসংগ্রহ (১ম খণ্ড)

[জনশিক্ষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রবন্ধ]

ভাষা
আগরতলা, ত্রিপুরা।
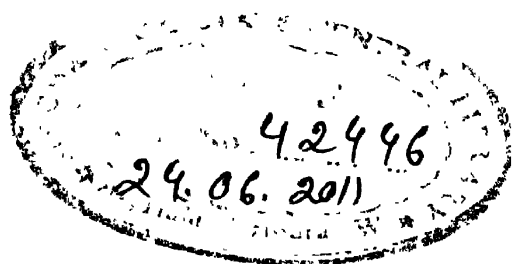
প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০৫
দ্বিতীয় পরিমার্জিত পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০

অক্ষর বিন্যাস ঃ ইনফোপ্রিন্ট, কৃষ্ণনগর, নতুনপল্লি, আগরতলা-১

গদ্যসংগ্রহ (১ম খণ্ড)

[জনশিক্ষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রবন্ধ]

GADYASANGRAHA [First Part]

[Janashiksha Andolan O Anyanya Prabandha]

a collection of bengali essays

by Dr. Nilmoni DebBarman

প্রচ্ছদ ঃ চন্দন চন্দ

ভাষা-র পক্ষে প্রকাশ করেছেন কল্যাণব্রত চক্রবর্তী,
প্রযত্নে *শান্তি কুটির*, নতুন পল্লী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা-১, ত্রিপুরা থেকে।
মুদ্রণ ঃ কমলা প্রেস, ২০৯ এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৬।
e-mail : bhasatripura@rediffmail.com
web : www.bhasa.co.in
ISBN : 81-8306-057-9

মূল্য ঃ ১১০ টাকা

প্রিয় আত্মজা

শর্মিলা, পাঞ্চালী

এবং

আত্মজ অনিন্দ্যকে

— বাবা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

উৎকৃষ্ট কিছু লেখা বলে যে আমার লেখাগুলো ছাপতে চেয়েছি, তা নয়। আসলে বিচারের নিক্তিতে এগুলোকে পাশাপাশি তোলার কোনো উপায় নেই। কারণ, অধিকাংশ লেখাই হারিয়ে গেছে। ছাপার অক্ষরে সেগুলো প্রকাশিত হবার সুযোগই ঘটেনি। কাজেই কোনগুলি উৎকৃষ্ট বা কোনগুলি নিকৃষ্ট — এ ব্যাপারটা নির্ধারণের বাইরে।।

আসল কথা হচ্ছে, লেখাগুলো একত্র করে একসঙ্গে রেখে দেয়া। তবে এইটুকুই আমার বক্তব্য যে, যে-কারোরই লিখিত ভাবনা, তার জীবনের কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা, সে-সময়ের কোনো বিশেষ ইতিহাস চিরকালের জন্য বই-বন্দি করা হলে তা পরবর্তী কোনো লেখক, ভাবুক, সংগ্রহকারীর ভাবনাচিন্তাকে উসকে দিয়ে তার লেখায় সাহায্য করতে পারে। কিছু রসদ যোগাতে পারে। সে অর্থে এই হয়তো সামান্য কিছু কাজে লাগতেও পারে। তবে আসল কথা হচ্ছে, আমার লেখাগুলোকে একত্র করা।

প্রথম খণ্ডে অনেক লেখা বাদ পড়ে গেল। কারণ সেগুলো ইংরেজি থেকে বা ককবরক থেকে অনুবাদের সময় করে উঠতে পারলাম না। আমি যে লেখাগুলো দিয়েছি, তা সবই আমার সত্য অভিজ্ঞতাপ্রসূত। সে অর্থে এখানে নির্মাণের কোনো স্থান নেই।

আগরতলা

১৫ই জানুয়ারি, ২০০৫। ডা. নীলমণি দেববর্মন

সংস্করণ প্রসঙ্গে

বছর তিনেক আগেই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপরে অনেকেই খোঁজ করেছেন। দিতে পারিনি। তাই এই দ্বিতীয় সংস্করণ। সামান্য কিছু পরিমার্জন এবং নতুন লেখা হিসেবে আমার 'ইউরোপ ভ্রমণের ডায়ারি' এই পর্যায়ে সংযোজিত হল।

লেখকদের সম্মিলিত উদ্যোগ 'ভাষা' এবারও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাদের ধন্যবাদ। বইটি সম্পর্কে কারো সুচিন্তিত অভিমত পেলে প্রাণিত বোধ করব।

১লা জানুয়ারি, ২০১০। ডা. নীলমণি দেববর্মন

প্র ব ন্ধ সূ চি

জনশিক্ষা আন্দোলন ঃ ভ্রূণ থেকে বনস্পতি

যেদিন উমাকান্ত বোর্ডিংয়ে এলাম তার পরদিন উঠেই বেশ খিদে পেল। বর্তমান বীরচন্দ্র লাইব্রেরির পুব কোণায় শিক্ষক মহাশয় রাজকুমার মজুমদারের বড়োভাই অশ্বিনীবাবুর একটি টংঘরের দোকান ছিল। সেখান থেকে আধা পয়সার মুড়ি কিনে আমরা তিনজনে খেলাম। তিনি স্নেহ করে কিছু বাতাসাও দিলেন। সেই আধা পয়সার মুড়ি আমরা তিনজনে খেয়ে শেষ করতে পারিনি। এসব কথা আজ কেউ সহজে বিশ্বাস করতে পারবেন না। ভাবলে আমার নিজেরই অবিশ্বাস্য লাগে।

তখন চালের মন ছিল আড়াই বা তিন টাকা। পুরাতন বোর্ডিংয়ের স্টাইপেন্ড ছিল মাসে পাঁচ টাকা। নূতন বোর্ডিংয়ের স্টাইপেন্ড মাসে সাড়ে তিন টাকা।

প্যারীমোহন ভট্টাচার্য, আনন্দমোহন দাসের সঙ্গে অনিল চক্রবর্তীও বোর্ডিংয়ে পড়াতে আসতেন। তাঁরা আসতেন সকালের দিকে। রাতে আমরা নিজেরাই একটা লম্বা বেঞ্চে বসে লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়তাম। জোরে জোরে চিৎকার করে পড়ার অভ্যাস ছিল আমাদের।

তখন উমাকান্ত একাডেমির হেডমাস্টার ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ব্রহ্মচারী, গম্ভীর। কোনো কথাই বলতেন না। ছাত্ররাও শ্রদ্ধায় ভয়ে চুপচাপ বসে থাকত। মাঝে মাঝে তিনি চেয়ারে বসে আপনমনে হাসতেন। ক্লাস তখন পিন ড্রপ সাইলেন্স। আমাদের ইংরেজি থার্ড পেপার পড়াতেন তিনি। কোনো পড়া নিতেন না। নিজেও পড়াতেন না। তখন আমরা ক্লাস নাইনে পড়ি। ঘন্টা পড়লে আবার নিজের অফিসঘরে নিজের চেয়ারে ফিরে যেতেন। স্কুলের কেরানি ছিলেন গোপী সিংহ, পুরো নাম গোপেন্দ্রলাল সিংহ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের ছোটোভাই। যেদিন এসেছিলাম খুব উঁচু গলায় প্রশ্ন করেছিলেন — 'কী নাম তোমার?' বাবার নাম জিজ্ঞেস করায় বলেছিলাম — গুরুচরণ। জোর বকা দিলেন — বেকুফ। বাবার নাম বলার আগে শ্রী বলতে হয়, বলবে শ্রী গুরুচরণ দেববর্মা, ওভাবে বলতে নেই। মনে থাকবে? মাথা নাড়লাম। মনে থাকবে।

পরের দিন বুধবার স্কুলে সাপ্তাহিক ছুটি। দেবেন্দ্র আমাদের স্কুলঘর দেখাবার জন্য নিয়ে গেল। বিকেল চারটায় গিয়ে দেখলাম একজন বেশ লম্বা-চওড়া লোক খালি গায়ে কাঁধে গামছা, লম্বা লম্বা টেবিল বেঞ্চ টানাহ্যাঁচড়া করে হলের ভিতর বিকট শব্দ করছে।

ভাবলাম ওঁর মত ক্ষমতাবান ব্যক্তি বুঝি এই স্কুলে আর নেই। পরে জানলাম ও আমাদের স্কুলের দপ্তরি রমণীমোহন দাস।

তখন উমাকান্ত একাডেমির দুদিকের উইংস এত লম্বা ছিল না। দক্ষিণে ছিল একটা ফুলের বাগান। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, তারপর মাঠ, এরপর আমাদের বোর্ডিং হাউস।

প্যারীবাবু অখিলবাবুরা ছাড়া পরে বোর্ডিংয়ে আমাদের পড়াতে এলেন নুটুবাবু, হরপ্রসাদ রায় এবং অবিনাশ গৌতম। নুটুবাবু অঙ্ক এবং অবিনাশবাবু পড়াতেন ইংরেজী। পরে অনিল দাশগুপ্ত মহাশয় আমাদের সুপার হয়ে এসেছিলেন, তার আগে ছিলেন নির্মল চক্রবর্তী। নির্মলবাবুর একটা পায়ে খুঁত ছিল। সেজন্য তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। পরবর্তীকালে আমায় পড়াশোনার ব্যাপারে তিনিই নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই সেদিন পর্যন্তও তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোর্ডিংয়ে এসেছিলাম। সেপ্টেম্বরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মহারাজ বীরবিক্রম ইউরোপ ভ্রমণ শেষে রুজভেল্টের আমন্ত্রণে আমেরিকায় গিয়ে লন্ডনে ফিরে এসে সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে দেশে ফিরতে পারলেন না। তিনি আবার আমেরিকায় গিয়ে অস্ট্রেলিয়া হয়ে থাইল্যান্ড ইত্যাদি ঘুরে বার্মা দিয়ে দেশে ফিরে এলেন। রাজ্যব্যাপী সেদিন উদ্বিগ্ন মহারাজার জন্য। ইওরোপ মহাদেশে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে কী হবে, তার তাপ আসতে শুরু করল ভারতেও। চারদিকে ঔৎসুক্য, চাঞ্চল্য, কী হয়, কী হয় ভাব।

প্রভাত রায় (গোবিন্দমাণিক্যর ছোটোভাই নক্ষত্ররায়ের বংশধর) এবং আমাদের সুপার বংশী ঠাকুর অমরেন্দ্র দেববর্মা জনমঙ্গল সমিতি করতেন। ইতিমধ্যে মহারাজা ফিরে আসার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। একদিন ভোরে, বোর্ডিং থেকে আমাদের সুপার বংশী ঠাকুরকে পুলিশ এসে নিয়ে গেল। আমরা তখনো কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি কেন এবং কীসের জন্য এই গ্রেপ্তার। তারপর হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করল, পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলো দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, আমেরিকা মিত্রশক্তি অন্যদিকে জার্মানি, ইটালি, জাপান অক্ষশক্তি নামে পরিচিতি লাভ করল। ১৯৪০ সালে ইওরোপের যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়ে গেল। ব্রিটিশরা ভারতের জনগণের সহযোগিতা কামনা করল। রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতের কমিউনিস্টরা এটাকে জনগণের যুদ্ধ হিসাবে দেখতে লাগল। টেররিস্ট হিসাবে যাঁরা বন্দি ছিলেন, যাঁরা কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী তাদের ইংরেজরা ছেড়ে দিল। কমিউনিস্টরা সেই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ হিসাবে ঘোষণা দিলেন এবং সবাইকে মিত্রশক্তির সঙ্গে সামিল হয়ে অক্ষশক্তিকে পরাজিত করার

জন্য আহ্বান জানালেন।

এ সময়টাতেই বীরেন দত্ত আমাদের মাঝখানে এলেন। বোর্ডিংয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করলেন, আমাদের সুযোগসুবিধা নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন, আমাদের দাবি-দরবার করার বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে আমাদের মন জয় করতে লাগলেন। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকাসহ নানা ধরনের বই-পুস্তক, লিফলেট ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। তার আগেই আমি যোগেশচন্দ্র বাগলের সোভিয়েত রাশিয়া বইটি দুই খণ্ড পড়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি — একদিন বিপ্লব এনে ত্রিপুরায় মূঢ় ম্লান মূক মুখে হাসি ফোটাব। প্রাক্ বিপ্লব যুগে রাশিয়ার অবস্থাও ছিল আমাদের দেশের মতোই। অশিক্ষা দারিদ্র্য অভাব অনটনে তারা ভুগতো। সেখানে তারা দেশে প্রাচুর্য এনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে।

বীরেন দত্ত জনমত গড়ে তোলার জন্য পত্রিকা বের করলেন। পাহাড়ে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন।

এদিকে যুদ্ধের তাপে এবং মজুতদারদের দৌলতে জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল। চালের দাম মনপ্রতি আড়াই টাকা থেকে একলাফে দশ টাকা হয়ে গেল। আমরা বোর্ডিংয়ের ছাত্ররা বাজারের সবচাইতে বড়ো মাছ কিনে খেতাম। এরপর আমরা ভাত আর সিদলের গোদক ছাড়া কিছু খেতে পাচ্ছিলাম না। ভেতরে ভেতরে অসন্তোষ নিয়ে স্টাইপেন্ড বাড়াবার জন্য আমরা সরকারের কাছে দরবার করতে লাগলাম। যার যার বাড়িঘর থেকে যে যা পারে টাকাপয়সা এনে আমরা চলতে লাগলাম। মুঠোমুঠো নোট ছাপিয়ে ইংরেজরা টাকার মূল্য কমিয়ে দিচ্ছিল। আধা পয়সার জায়গায় নয়া পয়সা এল, তামা আর রূপোর মুদ্রার বদলে নিকেল। স্টাইপেন্ড বাড়াল সাড়ে তিনটাকা থেকে পাঁচ টাকা, পাঁচ টাকা থেকে কুড়ি টাকা। তাতেও আমাদের কুলোচ্ছিল না।

চারদিকে অভাব, অসন্তুষ্টি, যুদ্ধের দামামা, ভয়, আতঙ্ক। এখানে সেখানে ইংরেজি S আকৃতির খোঁড়া ট্রেঞ্চ। রাত পোহালেই আনন্দবাজার, যুগান্তর পত্রিকার পাতায় পাতায় ম্যাপে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির বিবরণ — হিটলার বাহিনী কীভাবে এগোচ্ছে, রাশিয়া কীভাবে বাধা দিচ্ছে, বৃটেন কীভাবে জার্মানি বোমায় বিধ্বস্ত হচ্ছে। যুদ্ধের দৌলতে ইওরোপ এশিয়ার ম্যাপ আমাদের মুখস্থ হয়ে গেল। পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানিরা এগিয়ে আসছিল। একদিন আমরা বোর্ডিংয়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম জাপানি বোমারু বিমান সিঙ্গারবিলে দিনেরবেলায় বোমা ফেলে চলে গেল। জাপানি বোমারু বিমান ফিরে যাবার পর সাইরেন বাজল। সাইরেন বাজলে আত্মরক্ষার জন্য ট্রেঞ্চে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে এই নির্দেশনামা আর তখন আমাদের মনেই ছিল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিমান কয়টি ছিল

তাই নিয়ে তর্ক করতে লাগলাম। একদিকে ক্রমবর্ধমান অভাব অনটন অন্যদিকে গ্রাম-পাহাড়ের মানুষ কুসংস্কার, অজ্ঞতায় অশিক্ষায় নিমজ্জিত। বঞ্চনার তো আর শেষ নেই। রাজার ঘর-চুক্তি খাজনা দিতে গেলে বেশি টাকা দিয়ে কম টাকার রসিদ নিয়ে আসেন আমাদের বাবা দাদারা। বেশি টাকা দিয়ে কম টাকার রসিদ পাওয়াই নিয়ম, এভাবেই তারা এ ব্যাপারটা মেনে এসেছেন। অল্পে তুষ্ট, ধর্মভীরু সরল পাহাড়িরা ভবিষ্যতের জন্য কোনো চিন্তাও করেন না। তবে পরজন্মের জন্য তারা খুব ভীত এবং সতর্ক। কাউকে ঠকিয়ে মিথ্যা কথা বলে নরকে যেতে তারা রাজি নন। আজকে যা হাতে আছে কিম্বা যদি হাতে না থাকে তবে মহাজনের কাছে ধার করে কাজ চালিয়ে যাওয়া আর অবসর সময়ে নিজেদের তৈরি মদ, ঘরে পোষা হাঁস, মুরগি, ছাগল ও শুয়োর খেয়ে আনন্দে হাসিখুশিতে দিন কাটিয়ে দেয়া — এই হল জীবনযাত্রা।

এই স্বর্গ, মর্ত্য নরক পাপপুণ্য সম্বন্ধে ভীষণভাবে সচেতন পাহাড়িদের ভেতরে ততদিনে কুলপুরোহিত কুলগুরুরা নানা নিয়মকানুন নিয়ে পরিত্রাতার ভূমিকায় জাঁকিয়ে বসেছেন। জন্ম হল অশৌচ, এক মাসে সূর্যদর্শন, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, যৌবনে পৈতা ধারণ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে, বিয়েসাদীতে সামাজিক আমোদ ফূর্তি ভোজন চালু হয়েছে বহুদিন। বিয়েতে পুরোহিতের মন্ত্র, নাপিতের প্রয়োজনীয়তা এবং মৃত্যুর পর হবিষ্য পালন, নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ, শ্রাদ্ধশান্তি পারলৌকিক ক্রিয়া, সামাজিক ভোজন, গবাদি দান-দাক্ষিণ্য পুরোহিত বিদায়, পৌষ সংক্রান্তির দিনে শত শত পুণ্য লোভাতুর পাহাড়িদের কুলপুরোহিতের হাত ধরে ট্রেন বোঝাই হয়ে কলকাতা গিয়ে গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন এবং গয়াতে গিয়ে পিতৃমাতৃ তর্পণ, পূর্বপুরুষকে পিণ্ডদান — এসবই হয়ে উঠেছিল তাদের সামাজিকভাবে গৃহীত দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ।

এরা কুলগুরুর দেয়া কান-মন্ত্র নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করতেন এবং দক্ষিণাসহ পায়ে পড়ে ভক্তি প্রদর্শন করে পরজন্মের মুক্তি ভিক্ষা করতেন। বছরের পর বছর কুলগুরুরা আসতেন, চেয়ারে বসতেন জলচৌকির উপর দুটো পা রাখতেন। গৃহস্বামী এসে নিজের হাতে দুটো পা ধুয়ে প্রণাম করতেন তারপর একটাকা দু-টাকা প্রণামী, চাল যে যা পারতেন সবাই এসে সার বেঁধে পদপ্রান্তে দিয়ে যেতেন। টুকরি ভর্তি চাল বস্তাভর্তি ধান মুনিষ একবারে নিয়ে যেতে পারতেন না, বারেবারে এসে নিয়ে যেতে হত। যে যত বেশি এবং যত ভালো জিনিস দিতে পারত সে তত বেশি কৃতার্থ হত। গাঁয়ের মানুষ উজাড় করে ভক্তি প্রদর্শন করতেন এবং পরজন্মের মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাতেন। তৈল চিক্কণ নাদুসনুদুস শরীর নিয়ে ধোপদুরস্ত পরিধান গায়ে জড়িয়ে কুলগুরু প্রতিটি পরিবারে যেতেন এবং দান দ্রব্যাদি গ্রহণ করে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করতেন।

এর মধ্যে খোয়াইয়ের রামকুমার ঠাকুরের ১৯২৬ (১৩৩৬ ত্রিং) সালে প্রতিষ্ঠিত

পুরাতন ত্রিপুরা বোর্ডিং থেকে অনেক পাহাড়ি ছেলে পড়াশোনা করে বেরিয়ে গেছে। সকলের আগে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে আমতলির সুরেশ দেববর্মা বেকার বসেছিল। প্রখ্যাত গোপাল ঠাকুরের মেয়েকে বিয়ে করে তিনি তহসিল কাছারিতে শিক্ষানবিশী করতে শুরু করেছিলেন। পড়াশোনা করে চাকুরি করতে হবে এ-ধারণা তখন অবশ্য কারো মনে আসেনি। এরপর ম্যাট্রিক পাশ করলেন সুধন্বা দেববর্মা, দশরথ দেব। দ্বারিক দেববর্মাও এদের সঙ্গে ছিলেন, পাশ করেছিলেন কি না আমার জানা নেই।

এর মধ্যে পেকুয়ারজলার ওয়াখীরায় ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত, পরে যার নাম হয়েছিল নূতন ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস — সেখান থেকে তাঁরই নাতি খগেন্দ্র দেববর্মা ম্যাট্রিক পাশ করেন।

হেরমার সুরেন্দ্র দেববর্মাও ম্যাট্রিক পাশ করেন। সেটা বোধহয় ১৯৪৩ সালে। তখন পরীক্ষা নেয়া হতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

প্রতি বছরই দেখতাম দু-একজন বাদে ক্লাশ সিক্স সেভেনে উঠে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা চলে যেত। গানবাজনা সিনেমা ইত্যাদি নিয়ে মাতামাতি করত। পরীক্ষায় আর পাশ করতে পারত না। শেষ পর্যন্ত এরা বাড়ি ফিরে যেত। দু-বার একই ক্লাশে ফেল করলে তারা আর স্টাইপেন্ড পেত না। কাজেই পড়ার খরচ চালাতে না পেরে এদের ফিরে যেতে হত। ভাষার সমস্যার জন্য অনেকেরই অনাগ্রহ সৃষ্টি হত, এরই সঙ্গে ঘরের অভাব অনটন। সামনে একটা বড়ো আদর্শপূর্ণ জীবনের স্বপ্নের প্রতিকূলতা, পেছনে প্রতিযোগিতাহীন, সমালোচনাহীন, কোনও রকমে দু-মুঠো ভাতের স্বস্তিপূর্ণ আপাত শান্তির জীবন তাদের এগোতে দিত না।

কিন্তু তখন তারা — অবশ্য এখনো তাই, না ঘরকা না ঘাটকা। আগের মত জুম কৃষিকাজে মন লাগাতে পারত না আবার চাকরিবাকরিও পেত না। ফলে একদম অকর্মণ্য বেকারের দলে পরিণত হত।

এরই মধ্যে পুরাতন ত্রিপুরা বোর্ডিংয়ের সুপার আনন্দ দাসের সঙ্গে গন্ডগোল হওয়াতে দশরথদা ও দ্বারিক আগরতলা ছেড়ে খোয়াই চলে যান। ওখান থেকেই দশরথদা ম্যাট্রিক পাশ করে হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজে গৃহশিক্ষকতা করে পড়াশোনা করলেন আর সুধন্বদা আগরতলা বোর্ডিং থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে শ্রীকাইল কলেজে বি.এ. পড়তে এলেন।

ততদিনে পুরাতন ও নূতন ত্রিপুরা বোর্ডিং এক হয়ে গেছে। সুপার হয়ে এসেছেন নির্মল চক্রবর্তী। তখন বোর্ডিংয়ে অঘোর দেববর্মা আমিই সিনিয়র ছিলাম। দুজনেই লেখাপড়ায় উৎসাহী, পালা করে ক্লাশে প্রথম ও দ্বিতীয় হতাম। অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন হরিনাথ, অখিল, হরিচরণ, শশাঙ্ক, রমেশ, বগলা, জগবন্ধু, তারামোহন, চিত্ত,

সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র প্রমুখ। জুনিয়ারদের মধ্যে ছিলেন শশীকুমার, গদাধর, ধর্মরায় প্রমুখ।

বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় এবং সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে আমরা বোর্ডিংয়ের সিনিয়র ছাত্ররা মিলে ঠিক করলাম অভাব অনটন, নানা বঞ্চনা শোষণ অপমানের জন্য গ্রামে পাহাড়ে গঞ্জে লেখাপড়ার বন্যা বইয়ে দিতে হবে। নূতন প্রজন্মকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে কোনোদিন আমাদের জাতি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে না। উন্নতি তো দূরের কথা। তেরশো বছরের উপর রাজত্ব করেছেন ত্রিপুরার রাজারা কিন্তু প্রজাদের শিক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেননি। কাজেই আমাদেরই উদ্যোগী হয়ে চেষ্টা নিতে হবে শিক্ষার প্রসারের জন্য। তা না হলে এ জাতির ভবিষ্যত নেই। সেজন্য বোর্ডিয়ে আমরা কজন মিলে ঠিক করলাম একটা আন্দোলন গড়ে তুলে শিক্ষার জন্য সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। তার জন্য একটা মিটিং সর্বাগ্রে করা দরকার বলে স্থির করা হল। গ্রামে পাহাড়ে স্কুল গড়ে তুলতে না পারলে শুধু দু-একজন বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশোনা করে সমস্ত জাতিকে কোনোদিনই শিক্ষিত করে তুলতে পারবে না। আর শিক্ষিত না হলে কোনো জাতিই উন্নতি করতে পারে না।

প্রথমে আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে দুর্গা চৌধুরী পাড়ার হেমন্ত দেববর্মাকে ধরলাম। তিনি তখন আমাদের বোর্ডিংয়ের পশ্চিমদিকে অবস্থিত কৃষি অফিসে চাকরি করতেন। প্রস্তাব শুনে তিনি খুব উৎসাহিত হলেন। পরের দিন আবার তাঁর সঙ্গে আলাপের পর তিনি তাঁর বাড়িতে মিটিংয়ের বন্দোবস্ত করতে রাজি হলেন। ঠিক হল মিটিংয়ে যে লোক জমা হবে তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তার জন্য কোনো টাকা পয়সার প্রশ্ন উঠবে না।

ইতিমধ্যে শহরে অনেক রাজনৈতিক সংগঠনের উন্মেষ হচ্ছিল। জনমঙ্গল সমিতি, অনুশীলন সমিতি, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ইত্যাদি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বিকাশের রূপ নিচ্ছিল এবং এরা রাজরোষের শিকারও হচ্ছিলেন। আমরা ঠিক করলাম আমাদের সমিতি হবে একটি অরাজনৈতিক সংস্থা। রাজার বিরুদ্ধে তথা সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠন গড়ে আমাদের কোনো ফায়দা হবে না। আমরা বরং তাদের কাছে বিনম্রভাবে যাব আবেদনের ডালি নিয়ে। তখন কোনো কোনো জায়গায় পাঠশালা এবং নিম্ন বাংলা বিদ্যালয় চালু ছিল। আমরা স্থির করলাম যেখানে যেখানে সেসব নেই সেখানে এই ধরনের স্কুল চালু করাই হবে আমাদের উদ্দেশ্য। আর এই পরিকল্পনা, আমাদের এই উদ্দেশ্যকে বিনা আয়াসে রূপায়িত করতে গেলে সরকার বা রাজানুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়।

আমরা ঠিক করলাম আজ পর্যন্ত বোর্ডিং থেকে যাঁরা পড়াশোনা করে গেছেন তাঁদের সবাইকে এ উদ্দেশ্যে সামিল করতে হবে। সবাইকে একত্র করে, শিক্ষা প্রসারের

আন্দোলনের সূত্রপাত করবো। ভাবলাম বিভিন্ন জায়গায় স্কুল পাঠশালা খুললে শিক্ষারও প্রসার হবে আবার অল্প শিক্ষিত বেকার যুবকদেরও সেসব স্কুলে, পাঠশালায় শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করে নিতে পারলে তাদেরও একটা সুরাহা হবে। আরো ঠিক হলো আমাদের জাতির সর্বোচ্চ শিক্ষিত দশরথদা ও সুধন্বাদাকে অবশ্য এই কার্যসূচীতে আনতে হবে। যেমন সিদ্ধান্ত তেমনি কাজ শুরু হল। দশরথদার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আমি ও অঘোর দেববর্মা হবিগঞ্জ গেলাম। তিনি কলেজের একটি আসন্ন পরীক্ষা দিয়ে শীতকালে আসবেন কথা দিলেন। তাঁর কথামতোই ১১ই পৌষ ১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দ, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ সালে মিটিংয়ের দিন ঠিক হলো। যাবার সময় গিয়েছিলাম আখাউড়া হয়ে ট্রেন, দিয়ে ফিরলাম ভাল্লা স্টেশন দিয়ে খোয়াই হয়ে। সেখানে সবাইকে নিমন্ত্রণ সেরে সুধন্বাদাকে পেলাম বোর্ডিংয়েই। তিনি শ্রীকাইল কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং উমাকান্ত একাডেমিতে সাবস্টিটিউট্ টিচার হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনিও মিটিং যোগদান করতে রাজি হলেন।

সদর দক্ষিণে সুরেশ, ব্রজলাল, যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, বিন্দু, জ্ঞানচন্দ্র, বিনোদ ও দেবেন্দ্রদের খবর দেয়া হয়েছিল। তাদের অনেকেই এসেছিলেন — অনেকেই আসেননি। পূর্ব নির্ধারিত তারিখে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় হেমন্ত দেববর্মার বাড়িতে মিটিং হল। পাঁঠা কেটে রান্নাবান্না করে হেমন্ত দেববর্মা সবাইকে খাওয়ালেন। প্রকৃতপক্ষে হেমন্ত দেববর্মার দাদা যাকে বড়দা বলে সবাই জানে তারা সকলে এবং পাড়ার আরো গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেদিন সে-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এককথায় বলা চলে আমাদের সাধের এবং স্বপ্নের সেই কনফারেন্স সর্বার্থেই বিরাটভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

কাগজপত্র সবই কালের কপোলতলে হারিয়ে গেছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সমিতির নাম রাখা হল 'জনশিক্ষা সমিতি'। জনমঙ্গল সমিতির অনুকরণেই আমরা আমাদের সমিতির নামকরণ করলাম। অঘোরের মতে সেই সভায় যোগেন্দ্র দেববর্মাই নাকি এই নাম প্রস্তাব করেছিলেন। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত সঠিক মনে করতে পারছি না। জনমঙ্গল সমিতি একটি রাজনৈতির প্রতিষ্ঠান — যার কর্ণধার ছিলেন যেমন প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর এরা সকলেই যুদ্ধের সময় কারাগারে বন্দি ছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক শাসনের স্বৈরাচার শেষ করে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, জনগণের প্রতিষ্ঠা এদের লক্ষ্য ছিল। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে বারেবারে পরিষ্কার করে বলা হলো জনশিক্ষা সমিতি একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এ সমিতেতে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে রাখা হবে না। রাজার বিরুদ্ধে বা সামন্তবাদের বিরুদ্ধে অথবা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আমরা কোন শ্লোগান তুলবো না বা নালিশ জানাবো না।

সকলের সিনিয়ার সুধন্বা দেববর্মাকে সভাপতি, দশরথ দেবকে সহ-সভাপতি,

হেমন্ত দেববর্মাকে সম্পাদক এবং অঘোর দেববর্মাকে কার্যকরী সম্পাদক করে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হল। হরিনাথ, শশাঙ্ক, হরিচরণ, যোগেন্দ্র, রমেশ এবং আরো অনেককে সদস্য করে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হল। আমিও কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে রইলাম।

ঠিক হলো আপাতত দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় সমিতির অফিস থাকবে তবে বোর্ডিংয়ে থেকেই অঘোর ও অন্যান্যরা সমিতির কাজ চালিয়ে যাবে। আমি ও অঘোর তখন ক্লাশ নাইনের পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের জন্য অপেক্ষমান ছিলাম।

সে-সময়টাতেই বীরেন দত্ত প্রায় প্রতিদিন বোর্ডিংয়ে এসে আমাদের সঙ্গে মার্কস এঙ্গেলস-এর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। গ্রাম পাহাড়ের এবং সমতলের খেটে খাওয়া মানুষদের এককাট্টা করে বিপ্লবের বীজ বোনার প্রচেষ্টা চলতে লাগলো। জনযুদ্ধ পত্রিকা আর কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের লেখা নানা প্রবন্ধ, বুকলেট, লিফলেট পড়তে শুরু করলাম।

তখনি বীরেনদা আমাকে সম্পাদক ত্রিপুরেন্দ্র গাঙ্গুলিকে কোষাধ্যক্ষ এবং অপূর্ব রায়কে মেম্বার করে গোপনে একটি ছাত্র ফেডারেশন সেল তৈরি করলেন। ছাত্র কংগ্রেসের সহ-সভাপতি কালা মিঞাকে অনেক বুঝিয়ে, বলা চলে পটিয়ে ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি পদে বৃত করা হয়। এই কাজের জন্য বীরেনদা আমাকে দায়-দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রিয়দাস চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তখন আমাদের ছাত্র কংগ্রেসে নেয়ার জন্য টানাটানি চলছিল।

যখন ক্লাশ টেনে পড়ি তখন একবার কুমিল্লায় গিয়ে আমারা সারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি সি যোশীর সঙ্গে দেখা করে আলাপ পরিচয় করে এলাম। কুমিল্লা জেলার সম্পাদক অপূর্বকাঞ্চন দত্ত রায় এবং ভানু ঘোষদের সঙ্গেও তখন পরিচয় হলো। সেসময় গোপাল হালদার আগরতলায় এসেছিলেন। 'ত্রিপুরায় সংস্কৃতির রূপান্তর' বলে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি খুব প্রশংসা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে আমরা জনশিক্ষা সমিতির সদস্যরা এক একটি এলাকা ভাগ করে নিয়ে গ্রামে গিয়ে মিটিং করে ক্রমশ গাঁয়ে-গঞ্জে স্কুলঘর তৈরি করে মাস্টার নিযুক্ত করে রাজার দরবারে হাজির হতাম। এ বিষয়ে নিয়ম ঠিক হয়েছিল স্থানীয় জনসাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষক নিযুক্ত করে শিক্ষা বিভাগে প্রার্থনা করলে মহারাজ সেই স্কুলকে সরকারী স্বীকৃতি দেবেন। এভাবেই স্কুলগুলি স্বীকৃতি পাচ্ছিল। তখন শিক্ষকদের বেতন ১০/১৫ টাকার মত ছিল। এসব স্কুলে স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ডি. এ. ডব্লিউ ব্রাউন সাহেবের উপস্থিতি খুব সহায়ক হয়েছিল। এই ব্রাউন সাহেব ছিলেন ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলসের কম্যান্ডেন্ট। যুদ্ধ শেষে তিনি রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমান দুই নম্বর এম এল এ হোস্টেল তারই নির্দেশনয়া তৈরি হয়, সেখানেই তিনি বাস

করতেন। এটির নির্মাণে স্থাপত্য সৌন্দর্যের নিদর্শন তার রুচির পরিচয় রাখে। বিকেলের দিকে উমাকান্ত মাঠে এসে তিনি প্রায় দিনই আমাদের সঙ্গে খেলতেন। তখন এই সাহেবের উপস্থিতি স্কুলের মঞ্জুরির ব্যাপারে খুব সহায়ক হয়েছিল। ইওরোপ ঘুরে এসে তখন মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য খুব উদারমনা হয়ে গিয়েছিলেন। সে-সময়টায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন খুবই লক্ষ্যণীয় ছিল। যখনই আমরা স্কুলের লিস্ট নিয়ে মঞ্জুরির জন্য রাজদরবারে গেছি তখনই তিনি উদার হস্তে সেগুলির মঞ্জুরি দিয়েছেন। আমরা মহারাজের কাছ থেকে তিনশ পঞ্চাশটিরও বেশি স্কুলের মঞ্জুরী আদায় করেছিলাম। এই স্কুলগুলি ছিল পাঠশালা। ত্রিপুরা রাজ্যের সদর খোয়াই, সোনামুড়া, উদয়পুর, বিলোনিয়া, সাব্রুম ইত্যাদি অঞ্চলে এসব স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি হিন্দু। অবশ্য বোর্ডিং থেকে যারা সেভেন এইট পর্যন্ত পড়ে ফিরে গিয়েছিলেন তাদের সবারই এসব স্কুলে চাকরি হয়ে গিয়েছিল।

মনে পড়ে টাকারজলায় দুই গ্রামের বিবাদকে কেন্দ্র করে স্কুলের জায়গা ঠিক হচ্ছিল না। বিজয় নদীর দক্ষিণদিকের গ্রামের লোকসংখ্যা এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল কম। সুধন্বাদা আমাকে ও অঘোরকে এ বিবাদ মিটমাট করার জন্য পাঠালেন। লোকসংখ্যা বিচার করে আমরা নদীর উত্তরপারে স্কুল স্থাপন যুক্তিযুক্ত মনে করলাম এবং সেই মত রায় দিলাম। কিন্তু যেহেতু আমার বোনের শ্বশুরবাড়ি নদীর উত্তর পারে এবং আমরা সেখানে রাত্রিতে ছিলাম অতিথি হয়ে, সেজন্য অভিযোগ উঠেছিল আমাদের বিচার নিরপেক্ষ ছিল না। সেটা নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছিল।

স্কুল স্থাপনা এবং শিক্ষার জন্য আন্দোলনের পাশাপাশি অন্যান্য সংস্কার এবং সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের জন্যও আন্দোলন দেখা দিতে শুরু করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ জাতি চাল থেকে বিশেষ করে বিন্নি চাল থেকে সোমরস তৈরি করে উৎসেব ব্যসনে ব্যবহার করে এক প্রকার নেশাসক্ত জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। প্রথমে আমরা নিজেরা মদ খাব না ঠিক করলাম এবং উৎসবে ব্যসনে মদের প্রচলন বন্ধ করার জন্য জোর দিয়ে প্রচার করতে লাগলাম। সর্বত্র ঘুরে বোঝাতে লাগলাম মত তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে চালের অপচয় হয় এবং মদ খেয়ে শরীর নষ্ট হয়ে যায় এবং সময়ের অপচয় হয়। কাজকর্মেরও প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। নেশাগ্রস্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে এবং এর ফলে পরিবারের মধ্যে নানারকম অশান্তি দেখা দেয়। এভাবে মদ খাওয়া ও মদের ব্যবহার অনেক কমে গিয়েছিল।

তারপর কুলগুরুদের শোষণের বিরুদ্ধেও আমরা প্রতিবাদী হয়ে উঠলাম। কুলপুরোহিতের অত্যধিক লোভ সম্বন্ধেও আমরা সবাইকে সচেতন করে তুললাম। কুলগুরুদের আগম ন এবং বার্ষিক তোল্লা আদায় বন্ধ হয়ে গেল এবং পুরোহিতদের চাহিদাও

আস্তে আস্তে আমরা কমাতে পেরেছিলাম। এইসব ব্যাপারে অবশ্য গ্রাম পাহাড়ের লোকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতাও বেশ কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে মহাজনদের অমানবিক ও নির্লজ্জ শোষণের ধারাও কিছুটা কমে গিয়েছিল।

যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ঘরজামাই প্রথাকে আমরা একেবারে বিলুপ্ত করতে চাইনি, তবে ছয়মাস বা একবছর ধরে একটা ছেলেকে ঘরজামাই হওয়ার জন্য বেগার খেটে যেতে হবে এর বিরুদ্ধে আমরা ছিলাম। তাই প্রচার শুরু হলো ঘরজামাইকে এতদিন ধরে বেগার খাটানো চলবে না। বিয়ের দিন এসে বিয়ে করে ছেলে ঘরজামাই হয়ে থাকবে। এটা সমাজে প্রচলন হয়ে গিয়েছে এবং এখনো এর চল আছে। কন্যাপণ প্রথাও ছিল এবং কোনো কোনো জায়গায় এটা এখনো আছে। এখন অবশ্য বাঙালিদের মতো ছেলেকে পণ দিয়ে, দাবিদাওয়া দিয়ে মেয়ে বিয়ে দেয়ার প্রথা চালু হয়ে গিয়েছে ত্রিপুরী সমাজেও।

আমরা সেদিন সোচ্চারে বলেছিলাম জনশিক্ষা সমিতি একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনীতিতে যারা জড়িত তাদের আমরা দূরে সরিয়ে রাখতাম। বীরেন দত্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তদের আমাদের সমিতিতে নিইনি। প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুরকেও না, কারণ তাঁরা রাজনীতি করেন। শচীন্দ্রলাল সিংহ ও সুখময় সেনগুপ্তদের কাছেও আমরা বেশি ঘেঁষিনি। কিন্তু তা হলে কী হবে আমরা না চাইলেও বীরেন দত্তরা আমাদের সঙ্গে ছায়ার মতন লেগে থাকতেন। আমরা বোর্ডিংয়ে থাকলে বোর্ডিংয়ে, রাস্তায় থাকলে রাস্তায় এবং স্কুল ছুটিতে বাড়িতে গেলে তারাও আমাদের বাড়ি যেতেন।

কাজে কাজেই রাজার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আমাদের উপর কড়া নজর রাখতে শুরু করেছিল। তখন প্রজামণ্ডল, কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টি শহরে শিকড় গাড়তে শুরু করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ আমাদের মনেও দোলা দিতে শুরু করল।

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি আমি রংপুরে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে গেলাম। মনে হয় আমার সঙ্গে আতিকুল ইসলামও গিয়েছিলেন। তখন গীতা মুখার্জি ছিলেন প্রেসিডেন্ট, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। সেই সম্মেলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদকের (নাম মনে নেই) সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ফিরে এসে তাকে একটি চিঠি লিখি। লিখেছিলাম, আমরাও ত্রিপুরাতে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করে বিপ্লব এনে কৃষক শ্রমিকের রাজ কায়েম করে আমাদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করে তুলবো। জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিক্ষাদীক্ষায় স্বাস্থ্য খেলাধূলায় পৃথিবীর উন্নতদেশগুলির সমকক্ষ হবো — এই স্বপ্ন দেখি।

এই চিঠিটা রাজার পুলিশ ইন্টারসেপ্ট করে এবং রাজার নজরে নেয়। এটা দেখে না কি মহারাজ ক্ষেপে যান এবং সুধন্বাদা ও অন্য একজনকে ডেকে পাঠান। চিঠি দেখিয়ে মহারাজ নাকি তর্জন গর্জন করে বলেন — তোমরা বলেছিলে তোমাদের সমিতি

অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সেটা বিশ্বাস করে আমি তোমাদের অনেক সাহায্য করেছি। সুধন্বাদা না কি বলেন যে এটা তার অজ্ঞাতে হয়েছে এবং আমাকে তারা সমিতি থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। কাজেই মহারাজ যেন এটা ক্ষমা করে দেন।

এ ব্যাপরাটায় সমিতির যে সাবলীল জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তাতে কিছুটা বাধা পড়েছিল। এখনকার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের জায়গায় ট্রাইবেলদের রেস্ট হাউস তৈরির জন্য জায়গা দেবেন বলে মহারাজ কথা দিয়েছিলেন। অঘোর দেববর্মা বলেন যে আমার এ চিঠির জন্য মহারাজ সেটা বাতিল করে দেন।

জনশিক্ষা সমিতি যে ভবিষ্যত রাজনীতির ভূমি তৈরি করছিল এটা রাজার সরকার বুঝতে পারছিল, তাদের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে কোনো চিঠিপত্র বাইরে যেতে পারত না এটাই তার প্রমাণ। পরবর্তীকালে এই সমিতির কর্মকর্তারাই সেবক থেকে জনপ্রতিনিধি হয়ে শাসকে পরিণত হয়েছিলেন — এটা সকলের জানা। দশরথ, সুধন্বা, অঘোর দেববর্মাদের সকলেই এম. এল. এ. হয়ে মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছেন। আমাকে অর্থাৎ নীলমণি দেববর্মাকে সেদিন বলা হয়েছিল — তুমি গোপনে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট ছাত্রশাখার ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক, কাজেই সরে থাকতে হবে। শুধু তাই নয় বাইরের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সঙ্গে তোমার পত্রযোগে যোগাযোগও প্রমাণিত, কাজেই কয়েকদিন তুমি চুপচাপই থাকো। আমি বললাম — ঠিক আছে, সমিতি যা বলে আমি তা মানতে বাধ্য। আমি তাই করবো।

ততদিনে আমাদের অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অনেক সামাজিক সংস্কারও সাধিত হয়েছে। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্টও বেরিয়ে গেল। বোর্ডিংয়ের সুপার এবং শিক্ষা বিভাগের বড়বাবু নির্মল চক্রবর্তী — বললেন তুমি ডাক্তারী পড়তে যাও, আমি তোমাকে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এভাবে তাঁরই প্রচেষ্টায় আমি চিটাগাং মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হই। সেখানে মহারাজার ডোনেশান ছিল সেজন্য ত্রিপুরার দুটি সিট রিজার্ভ থাকতো। তারই একটি আমি এবং অন্যটিতে সোনামুড়ার আনোয়ার হুসেন বলে একটি ছেলে ত্রিপুরার নমিনি হিসাবে ভর্তি হয়েছিলাম।

এই সময়ই দশরথদা বি. এ. পাশ করে এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি এন্ড কালচার নিয়ে এম. এ. এবং সঙ্গে ল' পড়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন দেশে স্বাধীনতা এসে গেছে। কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন। ত্রিপুরাও ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত। কমিউনিস্টরা ভুল করে শ্লোগান তুলেছিল 'এই আজাদী ঝুটা হ্যায়' — নেতাজী কুইসলিং এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুর্জোয়াদের কবি। কমিউনিস্ট পার্টি পরে এই ভুল সংশোধন করে নেয়।

এরপর কমিউনিস্টদের ধর-পাকড় শুরু হলো। বীরেন দত্ত ও অঘোর দেববর্মা

আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেছেন। দশরথদা যদিও তখনো কোন পার্টিতে যোগদান করেননি তবু পুলিশ তার পিছনে লাগল। গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি ১৯৪৮ সালের মে মাসে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন এবং আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যান।

ততদিনে মহারাজ বীরবিক্রম প্রয়াত, কাঞ্চনপ্রভা দেবীর রিজেন্সিও শেষ এবং এডভাইজারি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। পুলিশদের তাড়নায় এবং নব্য শাসকদের জনসাধারণের উপর অত্যাচারে দশরথদা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করলেন। এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের অত্যাচার রুখতে শান্তিবাহিনী তৈরি করে রাজ্যের অভ্যন্তরে রুখে দাঁড়ালেন। তার অনেক আগেই অবশ্য সমিতির সকলে বুঝেছিলেন যে, দেশের উন্নতি এবং জনসাধারণের উপকার করতে হলে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা — দুটোরই দরকার। এটা অনেকের বিশ্বাস পুলিশ তেমনভাবে দশরথদাদের পিছনে তাড়না না করলে হয়ত বা তাদের রাজনৈতিক জীবন অন্যরকমও হতে পারতো।

অভাব অনটন এবং সরকারের অত্যাচারে পাহাড়ি জনতা তখন দশরথদাকে নেতৃত্বে পেয়ে বাঁচার সংগ্রাম শুরু করলো। বাঁচার জন্য এবং গণতন্ত্র ও অধিকার রক্ষার জন্য দশরথ, সুধন্বা, হেমন্ত এবং অঘোররা জনসাধারণের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। সেই সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস অনেকে লিখেছেন। বাইরের পত্র পত্রিকায় লেখা হয়েছিল দশরথদা না কি ত্রিপুরার নকল রাজা। জনশিক্ষা সমিতির কার্যকারিতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যে গণমুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টির কাজ শুরু হয়। গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ও কৃষক সভার সূচনাও হয় তখন থেকেই। আজ কৃষকসভা বাদে কমিউনিস্ট পার্টি, গণমুক্তি পরিষদ ভাগ হয়ে গেছে দু-ভাগে। অবশ্য সব সংস্থাই কমবেশি কাজ করে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

তবু এককথায় বলতে গেলে বলতে হবে এবং স্বীকার করে নিতে হবে যে, সেদিনের জনশিক্ষা সমিতিতে যে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়েছিল তা থেকেই গণসচেতনতা, অধিকারবোধ, রাজনৈতিক স্পৃহা সব কিছুই ত্রিপুরায় বিকশিত হয়ে উঠেছে বনস্পতির আকারে।

গণমুক্তি পরিষদ ঃ সেকাল ও একাল

একদিন স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য ছিল সুখসুপ্ত। যুগবাহিত সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কালের ধারাবাহিকতায় নানা ঝড় ঝাপটার মধ্য দিয়ে বয়ে এসে বৃটিশ শাসনের বিভিন্ন বোঝাপড়ায় নিজেদের তথাকথিত স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছিল। নানা কর দিয়ে বৃটিশ রাজ্যের নিয়মনীতি মেনে ত্রিপুরার মহারাজারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন। পার্বত্য প্রজারা তাদের নিজস্ব সরল নিয়মনীতি সঙ্গীতময় জীবন নিয়ে বনের আড়ালেই ছিল। এরই মধ্যে অভাব অনটন দুঃখ দুর্দশার অভাব ছিল না। রাজকার্যে বাধ্যতামূলক সাহায্য প্রথা, সরকারী কর্মচারীদের জিনিসপত্র বিনা মজুরিতে এ-গ্রাম থেকে ওই গ্রামে বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথা, তাঁইতুনও ছিল জোরদারভাবে।

অথচ এই প্রজাকুলের জন্য কোন সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। তাদের সামাজিক আর্থিক উন্নতির জন্য শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য রাজনীতির চর্চা নিয়ে দাবিমুখী হতে পারেনি তখনও।

অবশ্য বহির্ত্রিপুরায় এবং বৃহত্তর ভারতে বৃটিশ শাসনপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টা এবং দাবি দানা বাঁধছিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এরই গোপন ঢেউ এসে লাগছিল ত্রিপুরার নানা প্রান্তে। বিভিন্নভাবে অনুশীলন চর্চা, ব্যায়ামের আখড়া স্থাপিত হচ্ছিল ত্রিপুরায়। এগুলোর সঙ্গে বিপ্লবীদের গোপন যোগাযোগ ছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের শক্তিশালী গোপন নির্দেশ ছিল যেন এ-রাজ্যে এসে শক্ত ঘাঁটি না গড়তে পারে। কাজেই তাদের যথাযোগ্য শাস্তি তাড়না করে তাড়িয়ে দিতে হবে এবং তাই করা হয়েছিল তখন।

এই জাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে যোগ হয়েছিল বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভৎস ফলশ্রুতি। দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, গণমৃত্যু। মধ্যবিত্তের সুস্থিতি ছিন্নভিন্ন করে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন করে দিল ভারতবাসীকে, সে-সঙ্গে ত্রিপুরাবাসীকেও।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর আমরা দেখলাম সমগ্র দুনিয়ার অর্থনীতি এবং মূল্যবোধকে তছনছ করে পৃথিবী এক বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন। যুদ্ধের আগে এক মন চালের দাম যেখানে ছিল দু'টাকা, তিন টাকা — যুদ্ধের সময় এবং তার পরবর্তীকালে সেটা হয়ে গেছে কুড়ি টাকা থেকে তিরিশ টাকা। এই পরিবর্তনের ঢেউ আমাদের অশিক্ষা
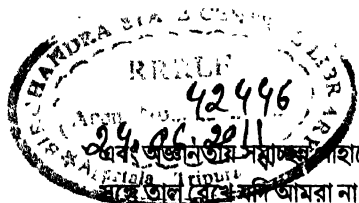
এবং অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন পাহাড়ের আনাচেকানাচেও এসে লেগেছিল। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে যদি আমরা না এগোতে পারি তবে আমাদের কোন ভবিষ্যতই নেই। এ ব্যাপারে শিক্ষাই আমাদের জীবনে একমাত্র দিকনির্দেশকারী উন্নতির কারণ। এই মানসিকতা নিয়ে আমরা জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলাম। সেটা ছিল ১৯৪৫ সাল।

এর মধ্যে দ্রুত রাজনৈতির পট পরিবর্তন হতে থাকল আমাদের রাজ্যে। ১৭ই মে ১৯৪৭ সালে মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর প্রয়াত হলেন। ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। রিজেন্ট কাঞ্চনপ্রভা দেবির ৯ই অক্টোবর Agreement of Merger সই করেন। ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর পুরোপুরিভাবে ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতা ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গেল।

দিল্লীর মসনদে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার স্বাভাবিকভাবেই অধিষ্ঠিত হলেন। ত্রিপুরায় এলো কংগ্রেস সরকারের প্রতিনিধি হয়ে এ বি চ্যাটার্জির দেওয়ানি সরকার।

১৯৪৮ সালে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সশস্ত্র লড়াই করে ক্ষমতা দখল করার জন্য নতুন নীতি গৃহীত হলো। পি সি যোশীর বদলে বি টি রণদিভে সাধারণ সম্পাদক হলেন। তেলেঙ্গানার লড়াই নূতন মোড় নিল, শুরু হলো কাকদ্বীপে কৃষক অভ্যুত্থান। স্বভাবতই নেহরু সরকার সতর্ক হলেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং মাদ্রাজে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলো। ত্রিপুরায় তখন ট্রাইবেলদের মধ্যে অঘোর দেববর্মা — একজনই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছেন। অন্যেরা কেউ পার্টিতে যোগদান করেননি। কিন্তু সরকারী প্রশাসন এবং পুলিশ কমিউনিস্ট জুজুর ভয়ে কেঁপে উঠল। পার্টিকে বেআইনি ঘোষণার সাথে সাথে যাঁরা কমিউনিস্ট নন সেই বংশী ঠাকুর, প্রভাত রায়, দশরথ-সুধন্বা-হেমন্তদের নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করে দিল দেওয়নি সরকার। কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট সকলে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন — দেবপ্রসাদ সেন, কানু সেন, প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর। শেষোক্ত দু'জন জনমঙ্গল সমিতি করতেন। বাকিরা বীরেন দত্ত, দশরথ দেব, সুধন্বা দেববর্মা, অঘোর ও হেমন্ত দেববর্মারা পাহাড়ে আত্মগোপনে চলে গেলেন। শুরু হলো মিলিটারি জুলুম এবং অভিযান। পুলিশ-মিলিটারির জুলুম আরো বেড়ে গেল — অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত পাহাড় ফুঁসে উঠল ক্রোধে। আত্মগোপনে থাকতেই এর প্রতিবিধানের চিন্তা মাথায় নিয়ে দশরথ দেবরা লেফুঙ্গায় (সদর উত্তর) বসে আলোচনা করলেন ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে। সেখানে ভৈরব, অঘোর, হেমন্ত ও বগলা দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। বীরেন দত্তও ছিলেন। সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো।

মুক্তি পরিষদের দাবী সনদ হলো — ১. রাজবন্দিদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে; ২. রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বাতিল করতে হবে; ৩. দায়িত্বশীল সরকার

চাই; ৪. প্রজার ভোটে মন্ত্রী চাই।

অরাজনৈতিক সংগঠন জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্বের মুখ থেকে এবার রাজনৈতিক স্লোগান পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এলো। তাঁরা অনুভব করলেন রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া রাজ্য এবং রাজ্যের জনসাধারণের উন্নতি সম্ভব না।

মুক্তি পরিষদের অধিকাংশ নেতৃত্ব তখনও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেননি। কিন্তু সরকারের এমন কমিউনিস্ট আতংক যে সবাইকে কমিউনিস্ট বলে জঙ্গলে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। তাদের ধরে দেওয়ার জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করলো। গ্রাম কি গ্রাম প্রথমে লুটপাট করে পরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে, কোন কোন জায়গায় হাতি দিয়ে মাড়িয়ে ঘর দরজা ভেঙে পরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হলো। শত শত নিরীহ মানুষকে ধরে এনে অমানুষিকভাবে মারধর করেছে সরকার। তাদের বলা হয়েছিল কমিউনিস্টদের ধরিয়ে না দিলে কারো নিস্তার নেই। অথচ তখন কমিউনিস্ট হননি দশরথ-সুধন্বা-হেমন্তরা। এই অকথ্য বর্বর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, ভাবা হয়েছিল — একমাত্র উপায় সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এ-জন্য দরকার পাল্টা মার দেয়া। সত্যি এমন পাল্টা মার দেওয়া হয়েছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ-মিলিটারি শেষের দিকে হঠাৎ করে পাহাড় কন্দরে প্রবেশ করতে পারেনি, প্রবেশ করতে সাহস করেনি।

যখনই পুলিশ-মিলিটারিরা গ্রামের দিকে আসার খবর এসেছে তৎক্ষণাৎ সব বয়স্ক জোয়ান পুরুষেরা জঙ্গলে লুকিয়ে পড়তেন। শুধু মেয়েরা ঘর পাহারায় থাকতেন। তেমনিভাবে একবার খোয়াই-এর পদ্মবিল গ্রামে মিলিটারিরা এসে যখন ছোট ছোট ছেলেদের তাইতুন দেওয়ার জন্য জোর জবরদস্তি করছিল তখন মেয়েরা বাধা দিতে গিয়েছিল। তখন মিলিটারিরা গুলি করে কুমারী মধুতি রূপশ্রীকে মেরে ফেলে।

১৯৪৯-এর মার্চ থেকে সমগ্র খোয়াই মহকুমায় সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল। তাই মিলিটারিদের যে-কোন সময় যে-কোন পরিস্থিতিতে গুলি করার অধিকার দেয়া ছিল। সমসাময়িক কালের এমনই আরেকটি ঘটনা ১৯৪৮-এর ৯ই অক্টোবর বিশালগড়ের গোলাঘাঁটি বিজয় নদীর ভক্তঠাকুর পাড়ার ঘাটে। এলাকায় তখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব চলছিল। তখন হরি সাহা এলাকার ধান চাল নৌকো করে রাজ্যের বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে গ্রামবাসীরা বাধা দেয় এবং দাবি করে যে ধান চাল ন্যায্য দামে তাদের কাছে বিক্রি করতে হবে। তখন মহাজন পুলিশ নিয়ে এসে জনতার উপর গুলি চালায়। দারগা মিহির চৌধুরীর নেতৃত্বে পুলিশ গুলি চালিয়ে নয়জনকে খুন করে।

সামরিক আইনের ক্ষমতা বলে পদ্মবিলে সরকার দেখিয়ে দিতে চাইল তারা কত ক্ষমতাবান, বীর। গোলাঘাঁটি পুলিশ গুলি করে ৯ জন নিরীহ গরিব মানুষকে হত্যা করে পাহাড়কে আগেই উত্তপ্ত করে রেখেছিল, পদ্মবিলের মধুতি রূপশ্রী ও কুমারীকে গুলি

করে হত্যার পর স্তম্ভিত হয়ে গেল সমগ্র পাহাড় — এ সরকার প্রজার রক্ষাকর্তা নয়, হন্তারক। সরকার প্রজাদের হত্যা করে দাবিয়ে রাখতে চায়। এ কোন মতেই সহ্য করা যায় না।

রাজ্যের পাহাড়ে যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল। আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের গরম লাভা বেরোতে লাগল। সমগ্র পাহাড় রাগে ফুঁসে উঠল। মুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব যখন ডাকল শান্তিসেনা গঠনের জন্য, তখন সবাইকে বাধা দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সবাই চায় সেনা দলে যোগ দিতে। ঠিক হলো যাদের বয়স কম, একা, যাদের বন্দুক আছে এবং যাঁরা ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলসের অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন সেনানী তারাই শুধু সুযোগ পাবে। এভাবে একটি ডিসিপ্লিন্ড্ ফৌজ গঠিত হয়ে গেল। নাম হলো 'শান্তিসেনা'।

তাদের কড়া নির্দেশ দেয়া হলো — জনসাধারণের সেনা, জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধ — তাদের স্বার্থ সর্বাগ্রে দেখতে হবে। কোন গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে কারো বিনা অনুমতিতে কোন জিনিসে হাত দেয়া যাবে না। একটি লংকা কিংবা জুমিয়াদের চিভ্রাতে মালিকের অনুমতি ছাড়া হাত দেয়া যাবে না। প্রতিটি পরিবার এক সের করে চাল দিয়ে সাহায্য করবে। চীনের গণমুক্তি ফৌজের অনুকরণে এই ফৌজ গড়ে উঠেছিল। জনসাধারণের সন্তান তারা, জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য তাদের প্রাণ উৎসর্গীকৃত। জনসাধারণও মায়া মমতা দিয়ে প্রাণের বিনিময়ে তাদের বুকে করে নিলো।

সম্মুখ সমরে না গিয়ে অ্যাম্বুশ করে পুলিশ-মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধে নেমে গেল এই সেনাবাহিনী। দলছুট কোন পুলিশ বা মিলিটারির সদস্য কর্তাব্যক্তি বা গুপ্তচর কোনদিনই ফিরে যেতে পারেনি। চারদিকে কড়া নজর। গাছে গাছে উঠে নজরদারি করা হতো এবং মুহূর্তে সংকেত দিয়ে বা মুখে মুখে পুলিশ-মিলিটারির আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়ত। শেষের দিকে কোন কমান্ডার কোন সরকারী বাহিনী নিয়ে জঙ্গল পরিবেষ্টিত এলাকায় ঢুকতে সাহস করেনি। খাজনা দেয়া বন্ধ হয়ে গেল, বিচার আচার নিজেরাই করতে লাগল। জমি হস্তান্তরিত হচ্ছিল কোন রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই। প্রজারা সরকারের কাছেও যাবে না, সরকারকেও আসতে দেবে না। এই ছিল তখনকার গৃহীত নীতি। আগরতলা শহর ও কয়েকটি মহকুমা শহর বাদে সমগ্র পাহাড় সরকারের নাগালের বাইরে চলে গেল। তখন সরকার ছিল কার্যত দিশেহারা।

১৯৫০ সালে মুক্তি পরিষদ গণমুক্তি পরিষদে পরিণত হলো। তখন নৃপেন চক্রবর্তী ছিলেন কোষাধ্যক্ষ, প্রাক্তন সেনা মোহন চৌধুরী সেনাধ্যক্ষ। বিচার, কোর্ট মার্শাল করে যে — কোন শাস্তি দেবার ক্ষমতা চালু হলো। কিছু কিছু ইনফরমার নিখোঁজ হয়ে গেল। তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। রাজ্যে নিরঙ্কুশ সমান্তরাল শাসন কায়েম হয়ে গেল। বাইরে প্রচার হলো নতুন রাজা দশরথ নিজের শাসন কায়েম করেছেন। দশরথ এবং

তাঁদের গণমুক্তি পরিষদের এত জনপ্রিয়তা এবং পাহাড়ের এমন নিঃশর্ত আনুগত্য কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? এ কোন জবরদস্তি ভয়ভীতির মাধ্যমে নয়, ১৯৪৫ সালের জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন-এর ঐক্য সাফল্য জনপ্রিয়তা, ১৯৪৯-এর মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বকে জনগণের শ্রদ্ধা ভালবাসা এবং অন্ধ সমর্থন পেতে সাহায্য করেছিল। জনশিক্ষা সমিতির ঐতিহ্য তাঁদের যদি না থাকত, শিক্ষাঙ্গনে তাদের এমন সশ্রদ্ধ ভূমিকা যদি না থাকতো, তবে জনগণের এমন অন্ধ আনুগত্য তাঁরা পেতেন কি না সন্দেহ। কাজেই বীজ বপন করা ছিল, ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বরে। তাই পরবর্তীকালে ফুলে ফলে তা মহীরুহ ধারণ করেছিল। শিক্ষার জন্য আন্দোলন সে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন, কেউ কেউ বলেন পৃথিবীতে এমন আন্দোলন আর কোথাও হয়নি। সেই আন্দোলনের সার্থকতা আসতেই সেটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বীজ বপন করে দেয়। তাকে ধরেই মুক্তি বা গণমুক্তি পরিষদের উত্থান।

গণমুক্তি পরিষদের এই গণ-আন্দোলন চলাকালীন অবস্থাতেই দশরথ-সুধন্বা-হেমন্তরা আরো বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিকতার পথে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তখনও গণমুক্তি পরিষদ বেআইনি। এর মধ্যে এল, ১৯৫৩ সালের সাধারণ নির্বাচন। সংবিধানে আমাদের নানাবিধ সংরক্ষণ দিয়ে কিছু কিছু অধিকার দিয়েছে। বাস্তবে যদিও আমরা প্রয়োজনীয় খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাইনি। দুর্ভিক্ষে, রোগে, শোকে মানুষ মরে। তবু ভোট দেবার অধিকার আমরা পেলাম। সেটা আমাদের ইপ্সিত গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন করে শাসন ক্ষমতা দখলে চেষ্টা নিতে পারি। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতাই শেষ কথা। ব্যক্তিগতভাবে কেউ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে নির্বাচিত হলে তিনি কীভাবে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন? কাজেই পার্টি করতে হবে, যে-পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের শাসন ক্ষমতায় বসার অধিকার হয়। কিন্তু সেখানেও অঙ্কের গরমিলের ফলে অসংখ্যাগরিষ্ঠরাই কোন কোন সময় শাসন ক্ষমতায় বসেন। জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যাদের ভোট দিল তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়। যেমন পার্টি পেল ৪০ শতাংশ, 'খ' পেল কুড়ি শতাংশ, 'গ' পেল কুড়ি শতাংশ, 'ঘ' পেল কুড়ি শতাংশ, পরের তিনটি পার্টি মিলে পেল ৬০ শতাংশ। কিন্তু ক্ষমতায় গেল কারা? যারা ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছে তারা। তারা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। তারপরও সমাজের একশ'র মধ্যে একশ শতাংশই কোনদিন ভোট দেন না। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য তাদের ভোট দিতে অনুপ্রাণিত করে না।

সে যাই হোক আমরা গণতান্ত্রিক পরিবেশে আমাদের অভাব অভিযোগ জানিয়ে কথা বলা, লেখা, বক্তৃতার অধিকার পেলাম। আত্মগোপন অবস্থাতেই দশরথ দেব নির্বাচনে দাঁড়িয়ে লোকসভার সদস্য হয়ে গেলেন। তারপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা উঠে গেল। মুক্তি

পরিষদ অস্ত্র ত্যাগ করে আইনী হয়ে আন্ডার গ্রাউন্ড থেকে প্রকাশ্যে উঠে এল।

এই পরিবেশকে অবলম্বন করে আমরা এখন স্বাবলম্বনের জন্য, স্বাধিকারের জন্য নিজের এবং দেশের উন্নয়নের জন্য সভা সমিতি মিটিং মিছিল করতে পারি। গণমুক্তি পরিষদ ১৯৬৪ সালে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদে রূপান্তরিত হয়েছে। উপজাতির নাম নিয়েছে সত্যি কিন্তু প্রথম থেকেই এই সংস্থা ছিল জাতি-উপজাতির ঐক্যবদ্ধ সংস্থা। এর চরিত্র এখনো পাল্টায়নি। আগে যেমন নৃপেন চক্রবর্তী, মোহন চৌধুরীর সঙ্গে কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসাবে এখনো সেভাবে না থাকলেও বাঙালি বন্ধুরা তেমনিভাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। এখন এর দাবি সময়োপযোগী করা হয়েছে। প্রজার ভোটে মন্ত্রী চাই এর প্রাসঙ্গিকতা আর নেই। এখন স্লোগান উঠেছে পাহাড়ি-বাঙালি মৈত্রী চাই, রাজ্যের উন্নতির জন্য শান্তি-সম্প্রীতি চাই।

কারণ, জাতীয় পার্টি কংগ্রেস যারা বিগত তিরিশ বছর রাজত্ব করেছে তারা পাহাড়িদের কাছ থেকে বাঙালিদের আলাদা করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নিয়েছে। উপজাতিদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের খুশি করে তাদের ভোট পাওয়ার জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে রেখেছে। কিন্তু উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সহযোগিতায় বামফ্রন্ট সরকার এই দুই সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে রেখে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার চেষ্টা নিয়েছে। কারণ রাজ্যের শান্তি আর উন্নয়ন কোন সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে হবার নয়। দুই সম্প্রদায়কে মিলেমিশে ত্রিপুরাতেই থাকতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে যারা আলাদা হয়ে স্বাধীন রাজ্য চাইছে হাতে অস্ত্র নিয়েছে, হত্যা, অপহরণ, লুণ্ঠন, পণবন্দী করে আর মুক্তিপণ নিয়ে রাজ্যে একটা অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধেও গণমুক্তি পরিষদ সংগ্রাম করে চলেছে। তারা নিরীহ গরিব উপজাতি ভাইকে হত্যা করে, ভীতি প্রদর্শন করে ট্যাক্স আদায় করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গিয়ে ক্যাম্প করে জমি জায়গা কিনে চাষবাস করে, ট্রান্সপোর্ট বিজনেস করে, ভাল ভাল হোটেলে থেকে দেশে বিদেশে বেড়িয়ে, ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়ে, নেতৃত্ব দিয়ে দেশ কীভাবে স্বাধীন হতে পারে?

নিজের ভাইকে হত্যা করে, ভাই-এর পরিবারকে অত্যাচার করে, ভাই-এর ছেলেকে অপহরণ করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ভাইয়ের ধনসম্পত্তি লুটপাট করে ভাইয়ের জন্য স্বাধীনতা আনতে চাইছেন। এ হবে শ্মশানের স্বাধীনতা, যদিও এটা একটি অলীক ও অবাস্তব দিবাস্বপ্ন। এটা কোনদিনই বাস্তবায়িত হতে পারে না। আমাদের চারপাশের রাজ্যে এর জ্বলন্ত উদাহরণ রয়েছে।

পুলিশ-মিলিটারি অত্যাচার শেষে মুক্তির জন্য মুক্তি পরিষদ এক সময় হাতে অস্ত্র নিয়েছিল। মুক্তি পরিষদ সংগ্রাম করেছে জনসাধারণের হয়ে জনসাধারণকে নিয়ে।

জনসাধারণের কোন ক্ষতি তাঁরা করেননি। একটি লংকাও এরা নিজের জন্য নেয়নি জনসাধারণও তাঁদের বুকে আগলে রাখতেন। তাঁরা জয়ী হয়েছেন তারপর অস্ত্র পরিত্যাগ করে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। সেই সংগ্রাম এখনো থেমে নেই।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপটে ককবরকের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ঢাকায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের জারি করা ১৪৪ ধারা অমান্য করে হাজার হাজার মানুষ বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উদ্ধত ক্ষমতায় মদমত্ত খান সেনারা এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য রাজপথে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। তাতে সালাম, জব্বার, রফিক বরকত-রা শহিদ হন। সেই অসামান্য আত্মবলিদানের ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণে রাখার জন্য এরপর প্রতি বছর বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিতে মহাসমারোহে শহিদ দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে।

বাংলা ভাষা দিবস শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। এখন পৃথিবীর ১৮৯টি দেশে এই দিনটিকে মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরায়ও আমরা এদিনটিকে মাতৃভাষা দিবস হিসাবে প্রতি বছর পালন করি।

এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯ জানুয়ারির (১৯৭৯) কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভায় একটি বিল পাশ করে ককবরকে — রাজ্যের দ্বিতীয় রাজ্যভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ২৭ ডিসেম্বরকে যেমন আমরা জনশিক্ষা দিবস হিসাবে প্রতি বছর পালন করি, ১৯ জানুয়ারীকেও আমরা তেমনি ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ককবরককে স্বীকৃতি দানের দিবস হিসাবে পালন করি, কারণ এটা একটা ঐতিহাসিক যুগান্তকারী ঘটনা। এই স্বীকৃতি দান সত্যি এক অসামান্য ঘটনা। কারণ ককবরক কোন নতুন ভাষা নয় — তিবেতো-বার্মিজ ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা এই ককবরক শত শত বছর ধরে এ-রাজ্যে মুখে মুখে চালু রয়েছে। এর লিপি নেই — তাই লিখিত রূপও একশ বছর আগেও ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের বৃহত্তম আটটি গোষ্ঠী বা দফা যথা ত্রিপুরী, রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রুপিনী, কলই, উচুই, মুড়াসিংরা ককবরকে কথা বলেন, তাদের গান গল্প-গাথা, মন্ত্রতন্ত্র মুখে মুখেই চলে এসেছে। ত্রিপুরায় অনুমান করা হয় প্রায় আট লক্ষ লোক এ ভাষায় কথা বলেন। ত্রিপুরার বাইরে কুমিল্লা, চাঁদপুর এবং চট্টগ্রাম জিলায় আরো দেড় লক্ষ থেকে দু'লক্ষ লোক এই

ভাষায় কথা বলেন। বর্তমানে প্রচুর লিখিত বই ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার বাইরে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ত্রিপুরায় ১৮৪ জন রাজা যাদের মাতৃভাষা ককবরক (রাজানি কক) ছিল — রাজত্ব করে গেলেও তাঁরা এটাকে রাজ্যের রাজ্য ভাষা হিসাবে বা সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেননি। সরকারী কাজকর্মে, কোর্ট কাছারিতে এটাকে অচল করে রেখে গেছেন। অথচ পাশের রাজ্যে মণিপুরে মণিপুরি বা মৈতৈই প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে স্বীকৃত ভাষা হিসাবে চালু হয়ে আসছে।

যাদের মাতৃভাষা সরকারী কাজকর্মে অচল তাঁদের তো বোবাই বলতে হয়। যাঁদের মাতৃভাষা অস্বীকৃত এবং সরকারী কাজে অপ্রচলিত — তাঁদের মতে হীনম্মন্যতা জন্মাতে বাধ্য এবং ত্রিপুরায় তাই হয়েছে। তাঁরা নিজের ভাষায় কথা বলতে পারতেন না। সেজন্য রাজ্যের বিচারালয়ে তাঁরা নিজেদের আত্মসমর্থনে হাকিম বা বিচারকের কাছে সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে পারতেন না। অবশ্য এখনো তারা নিজের ভাষায় কোর্ট কাছারিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিস্তারিতভাবে ঘটনাকে তুলে ধরতে পারছেন না। কারণ মাতৃভাষা ছাড়া তাঁরা অন্য ভাষা জানেন না — তাই তাঁদের বিচারের নামে বা নামমাত্র বিচারে জেলে যেতে হয়। সেজন্য প্রবাদ বাক্য রয়েছে ঃ

— হাকিম কক বরক মানয়া,
নীবঙও কক গীনজীয় মানয়া,
দিন দিনদছয় নাঙগীয় ফায়ফুরু
তীমা জবান ন রমনাই।

অর্থাৎ হাকিম ককবরক জানেন না, তুমিও বাঙাল ভাষা জানো না, প্রয়োজনীয় বিপদ আপদের দিনে তোমার দশা কী হবে?

উল্লিখিত প্রচলিত কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে — কমরেড বিমল সিংহ ত্রিপুরার বিধানসভায় বলেছিলেন — সেই কারণে জেলে বিচারাধীন বন্দি বা শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের দু'তৃতীয়াংশই হচ্ছেন উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। কারণ তাঁরা বাংলায় কথা বলে তাঁদের বক্তব্য বোঝাতে পারতেন না।

বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় এসেই ককবরককে দ্বিতীয় সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিধানসভায় একটি বিল আনেন, এর আগে কংগ্রেসের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের আমলে — ১৯৬৪ সালে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তখনই ককবরককেও সম-মর্যাদা দেওয়ার জন্য আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসী সরকার নানা অজুহাতে সেই ন্যায্য দাবি নাকচ করে দেন।

সরকারে এসে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালের ১৭ই জানুয়ারি — The Tripura

Official Language (Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 1 of 1979) রাজ্য বিধানসভায় পেশ করেন। বিলটি আনেন তখনকার শিক্ষামন্ত্রী স্বনামধন্য দশরথ দেব। নিয়ম অনুযায়ী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী বিলটি সভায় পেশ করেন। ১৭, ১৮ এবং ১৯ জানুয়ারি আলোচনা হয় এবং ১৯শে জানুয়ারি বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়। পরে যথারীতি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য, কেউ এই বিলের বিরোধিতা করেননি। যাঁরা যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন — দশরথ দেব, অভিরাম দেববর্মা, বিমল সিংহ, বীরেন দত্ত এবং বিরোধী টি ইউ জে এস'র চারজন বিধায়কের মধ্যে নগেন্দ্র জমাতিয়া এবং হরিনাথ দেববর্মা। দশরথ দেব আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং পর্যালোচনার শেষ বক্তৃতাও তিনিই দেন। ৬০ জন বিধায়কের মধ্যে ৫৮ জনই পক্ষে ভোট দেন, শুধু নৃপেন চক্রবর্তী সেসময় বাইরে ছিলেন — তাই ভোট দিতে পারেননি। আর সভার অধ্যক্ষ সুধন্বা দেববর্মাকে ভোট দিতে হয়নি।

সে-সময় ককবরকের জন্য একটি উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটির সদস্যরা ছিলেন ১. রামচরণ দেববর্মা, ২. তারামোহন দেববর্মা, ৩. নকুল দেববর্মা, ৪. যোগেন্দ্র দেববর্মা, ৫. শ্যামলাল দেববর্মা, ৬. অশ্বত্থমা দেববর্মা, ৭. নিরঞ্জন দেববর্মা। এই উন্নয়ন কমিটি ছিল — উপদেষ্ট কমিটি — তাঁরা ককবরকের উন্নতির জন্য অনেকগুলো সুপারিশ দাখিল করেছিলেন। সেগুলো এখন কোথায় রয়েছে কারো জানা নেই। ককবরকের ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে দেখা যায় যে, ১৯০০-১৯১০ সালে রাধামোহন ঠাকুর ককবরকের ব্যাকরণ 'কক বরকমা' অভিধান 'ভাষা বিধান' এবং ত্রিপুরা কথামালা রচনা করেন, সেই একই সময়ে দৌলত আহমেদও 'কগবরমা' এবং অন্যান্য আরো বই ককবরকে রচনা করেন।

তাঁরা উভয়েই তাঁদের বই তদানীন্তন মহারাজাদের পাদপদ্মে উৎসর্গ করেন — কিন্তু রাজাদের দিক থেকে কোন আনুকূল্য বা উৎসাহ পাননি বলে মনে হয়। রাজারা ছিলেন ককবরকের জন্য নিতান্তই নিস্পৃহ।

এরপর সাধু রতনমণির শিষ্য সাধু খুশিকৃষ্ণ ৩৩টি ধর্মীয় সঙ্গীত ককবরকে লিখেন এবং 'ত্রিপুরা খা-কীচাংমা খুমবার বই' নামে ১৯৪২/৪৩ সালে একটি বই বের করেন। ১৯৬৪ সালে 'গোমতী' প্রকাশিত হয় তড়িৎমোহন দাশগুপ্তর লেখা থেকে এটা জানা যায়।

জনশিক্ষা সমিতি এবং তৎপরবর্তী সময়ে 'কীতালকথমা'র যুগ চলে আসে ১৯৪৫ সালের পর। ককবরকের এই কীতাল কথমা ম্যাগাজিনে লোক সংগীত, গল্প, গাথা,

কবিতা এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এ-ধারা অব্যাহত থাকে প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, অজিতবন্ধু দেববর্মা, মহেন্দ্র দেববর্মা, যোগেন্দ্র দেববর্মাদের লেখাতে। ধ্বনিপ্রধান ককবরকের জন্য দশরথ দেব বাংলা বর্ণমালায় কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহার করেন এবং বর্তমান সময়ে এটা প্রচলিত হয়ে চলেছে। তার আগে রাধামোহন ঠাকুর, দৌলত আহমেদ, অলীন্দ্রসাধন ত্রিপুরা প্রমুখ মনীষীরা ককবরকের জন্য স্ব-স্ব বর্ণমালার সুপারিশ করে গেছেন, তাঁদের পরে ভাষাবিদ সুভাষ চ্যাটার্জি এবং ভাষা গবেষক কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীরাও সেই চেষ্টা নিয়েছেন। এখন কোন নির্দিষ্ট বর্ণমালাই সার্বিকভাবে লেখকদের কাছে গৃহীত হয়নি। বিতর্ক এখানো চলেছে।

সে যাই হোক ১৯৭৯ সালের পর আজ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ'র উপর স্কুলে ককবরকে শিক্ষা চালু করা হয়েছে এবং দু'হাজারের মত ককবরক শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তকের অভাবে এবং শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের অভাবে সব স্কুলে ককবরক শিক্ষাক্রম চালু সম্ভব হয়নি।

তবু ককবরকে শিক্ষা এগিয়ে চলেছে। প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে কয়েকটি হাই স্কুল স্তরে ভাষা শিক্ষা হিসাবে ককবরক স্থান করে নিয়েছে। এ-বছর একটি হাইস্কুল থেকে ককবরকে মাধ্যমিক পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। কোন কোন বেসরকারী সংস্থা ককবরকে শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। রাজ্য কর্মচারী, উঁচু স্তরের আমলারা — ককবরক শেখার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সরকারী উদ্যোগে তাঁরা ককবরকে পঠন-পাঠন নিচ্ছেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর অনুপজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য ১৯৯৩ সাল থেকে ককবরক ভাষায় ছয় মাসের সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছেন। বর্তমানে ককবরকে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় চিন্তাভাবনা করছে। এ-প্রসঙ্গে ককবরকের প্রচার এবং প্রসারে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এ-ভাষার চর্চায় এবং উন্নয়নে অভাবনীয় সহায়কের ভূমিকা নিয়েছে। ১৯৭৪ সাল থেকে আকাশবাণী গৌহাটি ককবরকে সংবাদ প্রচার শুরু করে। বর্তমানে আকাশবাণী আগরতলা এবং দূরদর্শন আগরতলা ককবরক ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

সরকারী এবং বেসরকারীভাবে বহু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক পত্র-পত্রিকা ককবরকে প্রকাশিত হচ্ছে। বহু কবিতা এবং গল্পের বইও প্রতি বছর বের হচ্ছে এবং সরকারী পর্যায়ে তাতে নানাভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ-ভাষা আরো উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

ককবরকের জন্য বাংলা বর্ণমালার বিধান

একুশ শতকে পা দিলো পৃথিবী। কিন্তু এখনো পৃথিবীতে অসংখ্য জনগোষ্ঠী আছে যাদের মাতৃভাষা শুধু মুখের ভাষারূপেই রয়ে গেছে। এইসব ভাষার কোন বর্ণমালা নেই — কোন লিখিতরূপ নেই।

ত্রিপুরার ককবরকেরও একশ বছর আগেও কোন লিখিতরূপ ছিল না। অথচ ইতিহাস বলে এখানে একশ চুরাশিজন রাজা রাজত্ব করে গেছেন সাড়ে তেরশত বছর ধরে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আট দফা (অনেকেরই মতে দশ দফা) যেমন ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, রিয়াং, কলই, রুপিনী, উচই, মুড়াসিং —ককবরক বলেন। বাকি এগার দফা অন্যান্য ভাষায় কথা বলেন। ১৯৯১ সালের জনগণনায় রাজ্যের লোকসংখ্যা দেখানো হয়েছে ২৭,৫৭,২০৫ জন। তার মধ্যে উপজাতিদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ৮,৫৯,৩৪৫ জন। বেশিরভাগ লোকেরই অনুমান এর মধ্যে প্রায় সাত লক্ষ আদিবাসীই ককবরকে কথা বলেন।

এই ককবরক শত শত বছর ধরে শুধু মৌখিক ভাষা হিসাবে চলে এসেছে। বিগত একশ' বছর আগে রাধামোহন ঠাকুর ককবরকের লিখিতরূপ দিলেন। ১৩১০ ত্রিপুরাব্দে (১৯০০ ইং) তিনি তিনটি বই লিখলেন — ককবরকমা (ব্যাকরণ), ত্রৈপুর কথামালা (পাঠ্য পুস্তক) এবং ত্রৈপুর ভাষাবিধান (একটি ত্রিভাষীয় — ককবরক, বাংলা এবং ইংরেজী ভাষার অভিধান।)

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে ভাষাবিদ ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিরূপে উত্তরণ।'

১৯৭৭ সালে মহীশূরের 'সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ' প্রতিষ্ঠানের শ্রীমতী পুষ্প পাই-এর ককবরক গ্রামার নামে একটি বই বের হয়। ১৯৭৭ সালেই ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব লিখিত 'কগবরক ছৈরৈং' (ককবরক শিক্ষা) প্রকাশ করেন। ১৯৮৩ সালে ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি ও তপশিলি জাতি কল্যাণ বিভাগের গবেষণা অধিকার অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধরের 'ককবরক সৗরীঙমা' (এ গ্রামার অব স্পোকেন ককবরক) বইখানি প্রকাশ করেন।

ইদানীং আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সূত্রে দৌলত আহম্মদ ও মহম্মদ উম্মর

কর্তৃক লিখিত বই 'ককবরমা অং ত্রিপুরা ব্যাকরণ' - এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। এই বই ১৩০৭ ত্রিপুরাব্দের পৌষ মাসে কুমিল্লার অমর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। সমালোচনার জন্য দৌলত আহম্মদ বইটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদান করেন। এখন সেটা প্রায় দুষ্প্রাপ্য কপি বলা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (কলকাতা) লাইব্রেরি থেকে সেই বইয়ের কিছু অংশ (একশ পৃষ্ঠার বই-এর মাত্র তের পৃষ্ঠা) ফটোস্ট্যাট করে আনতে পারা গেছে। সমস্ত বইটির ফটোস্ট্যাট করে আনার অনুমতি পাওয়া যায়নি। কারণ লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের মতে, শতবর্ষের এই বইটির পাতাগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ বইটির ছবি তুলে নেয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেটা সময় এবং সুযোগের অভাবে সম্ভবপর হয়নি। কিছু অংশ ফটোস্ট্যাট করে আনার অনুমতি দিয়ে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

উপরোক্ত লেখকগণ যাঁরা ককবরকে লিখিতরূপ দান করেছেন, দেখা যাচ্ছে তারা সকলেই বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করেছেন তবে ধ্বনি প্রধান উচ্চারণের জন্য তাঁরা নিজ নিজ যুক্তিমত বাংলা বর্ণমালাকে কাটছাট করেছেন এবং বর্ণমালার উপর নানারকম চিহ্ন ব্যবহার করে ককবরকের জন্য বর্ণমালার প্রস্তাব রেখেছেন। এ-বিষয়ে দেখা যাচ্ছে, এক একজন এক একভাবে বর্ণমালার বিধান দিয়েছেন। বর্ণমালার সংখ্যা নিয়েও তাঁরা একমত হননি। নিম্নলিখিত তুলনামূলক সারণী থেকে এই উক্তির সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। প্রথমে স্বরবর্ণ নিয়ে কে কী বিধান দিয়েছেন আলোচনা করা যেতে পারে।

সারণি - ১ ঃ স্বরবর্ণ

দৌলত অহম্মদ ও মহাম্মদ উম্মর	রাধামোহন	সুহাস	পুষ্প পাই	দশরথ	প্রভাসচন্দ্র
এ ই ও অ আ উ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ	অ আ ই উ ঊ এ	অ আ ই উ ঊ (w) এ ঊ (d)	অ আ ই উ এ অৗ উা (d)	অ আ ই ঈ উ ঊ ঊৗ ঋ ও ঔৗ

এই সারণি থেকে দেখা যায় স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে দৌলত আহম্মদ রেখেছেন ছয়টি স্বরবর্ণ, রাধামোহন ঠাকুর বারটি, ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় রেখেছেন ছয়টি, পুষ্প পাই রেখেছেন সাতটি, দশরথ দেব সাতটি এবং ড. প্রভাসচন্দ্র রেখেছেন বারটি।

দৌলত আহম্মদ ও মহাম্মদ উম্মরের 'ককবরমা অং ত্রিপুরা ব্যাকরণ' বই-এর দুই পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বর্ণগুলি পাই। এখানে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ মিশ্রভাবে আছে।

এ বা চ্চি দি ই
ফি গ হা জ কি
লা মে নি ও প
রি ছ টা ঠি ত
খু অ ডু ঢ ঝি
থ ঘ আ উ শ
তু থি ক্লু তাল খ্ল
লং শ্রীচা শ্রীনুই শ্রীথাম্ শ্রীরা

লেখকদ্বয় শিরোনাম দিয়েছেন 'খর ছাগ্ ফিল্ বমাং'; এই বই-এর একশ পৃষ্ঠার মাত্র তের পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোস্ট্যাট করে আনা গেছে। সমস্ত বইটি পাওয়া গেলে আশা করি ভাষা বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই এর উপর অর্থবহ আলোকপাত করবেন।

নীচের দুই নং সারণীতে অন্যান্যদের লেখা ব্যঞ্জনবর্ণের নমুনা এবং সংখ্যা দেয়া গেল।

সারণি - ২ ঃ ব্যঞ্জনবর্ণ

রাধামোহন	সুহাস	পুষ্প পাই	দশরথ	প্রভাসচন্দ্র
ক খ গ ঘ ঙ	ক খ গ	ক খ গ	ক খ গ	ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ	চ ছ জ	চ ছ জ	চ ছ জ	চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ	ত থ দ	ত থ দ	ত থ দ	ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন	প ফ ব	প ফ ব	প ফ ব	ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম	ভ ন ম্	ঙ ন ম	ঙ ন ম	প ফ ব ভ ম
য ব ল স হ্	ড য় d	য় d স	ং ঃ য়	য র ল ব শ
ং ঃ ঁ	র ল হ্	র ল হ্	র ল হ্	ষ স হ ড় ঢ়
				য় ঙ ৎ ঃ ঁ
(৩৩টি বর্ণ)	(২১টি বর্ণ)	(২১টি বর্ণ)	(২১টি বর্ণ)	(৪০টি বর্ণ)

এই সারণি থেকে দেখা যায়, ককবরক বর্ণমালা তৈরিতে ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায় এবং দশরথ দেব উভয়েই বাংলা বর্ণমালার স, শ, ষ বাদ দিয়েছেন। শ্রীমতী পুষ্প পাই বাদ দিয়েছেন শ এবং ষ। তিনি অবশ্য স রেখেছেন। দৌলত আহাম্মদ ও মহাম্মদ উম্মর শ রেখেছেন শুধু। রাধামোহন ও ড. প্রভাসচন্দ্র ধর বাংলা বর্ণমালার সব কয়টিই রেখেছেন। স, শ, ষ কোনটিই তিনি বাদ দেননি।

যারা বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত তাদের পক্ষে কোন্ বর্ণমালা বাদ দিতে হবে,

কোন্ বর্ণমালা রাখতে হবে এ মনে রাখা খুবই কষ্টকর। তাছাড়া ত্রিপুরায় বাংলা যখন রাজ্যভাষা (স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ) তখন ককবরকভাষীই হোক বা অন্য ভাষাভাষীই হোক সবাইকেই ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর পরীক্ষা দিতে হলে বাংলা শিখতে হবে এবং বাংলা বর্ণমালাও শিখতে হবে। যারা ককবরক জানেন এবং যারা বাংলা বর্ণমালা জানেন তারা স্বরের ওঠানামার (টোন) ওপর অর্থবাহী শব্দ লিখতে যে-কোন বর্ণমালা ব্যবহার করলে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশি হবে বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

এছাড়া শুধু ছ ব্যবহার করে সব শব্দ লিখতে গেলে এমন কিছু অবাস্তব পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, শুধু 'ছ' দিয়ে লেখা শব্দগুলো মেনে লিখলে সুভাষ বসুকে লিখতে হয় ছুবাছবছু। তেমনি সালকামা হবে ছালকামা, সত্যেন সাহা হবে ছত্যেন ছাহা। অনেকদিন বাংলা শব্দের সঙ্গে সুপরিচিত হলে এসব মন মানতে চায় না।

ককবরকে যেহেতু বাংলা বর্ণমালার স, শ, ষ নেই তাই ককবরকে লিখতে গেলে দছরথ, ছছিকলা, রমেছ বা ছিছির ছেন ছর্মা বা দাছ লিখতে হবে — বলতে হবে। এর ফলে শব্দগুলোর বানান শুধু যে অশুদ্ধ হবে তাই নয় বাংলা উচ্চারণের সঙ্গে যাদের পরিচয় রয়েছে তাদের বেশ অস্বস্তি লাগবে। আসামে গেলে দেখতে পাই, বাসের মাথায় টাউন বাচ লেখা রয়েছে। ওঁরা কি বাচ (Bus) বলেই উচ্চারণ করেন?

আমাদের ভাষাবিদ্‌রা বলেছেন, বর্ণমালা কিছুই নয়, শুধু প্রতীকী চিহ্ন মাত্র। আপনার ভাষায় আপনি ছিছিরকে শিশির উচ্চারণ করে পড়ুন তাতে কোন দোষ হবে না।

অনেকে বলেন, আপনারা স, শ এবং ষ উচ্চারণ করতে পারেন না, কাজেই আপনাদের ককবরকে সেগুলোর দরকার নেই। কথা হচ্ছে, এসব বর্ণেরও উচ্চারণ কঠিন ঠিকই কিন্তু তা রাখলে এবং সেগুলোর উচ্চারণের চেষ্টার সুযোগ দিলে ক্ষতি কী? বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সবাই কি এসব বর্ণের সঠিক উচ্চারণে পারদর্শী? তা বলে বাংলা বর্ণমালা থেকে তা উঠিয়ে দেয়া কি ঠিক হবে?

পরিশেষে দেবনাগরী বর্ণ d বাংলা বর্ণমালার মধ্যে আনা হয়েছে 'ও' 'অ' টোনের জন্য। এই বর্ণমালার সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই সামান্য। বাংলা বর্ণমালার মধ্যে দেবনাগরী বর্ণমালার দৃষ্টিকটু ঠেকে। তাই দশরথ দেব 'উ' এর পরে 'া' (আকার) বসিয়ে উা (বাঁশ) উাক (শূকর) লেখার বিধান দিয়েছেন এবং দেখা যায় এটা অতি সহজে সকলে গ্রহণ করেছেন। এখন অবধি উা বা উাক লেখার জন্য কেউ দেবনাগরী d ব্যবহার করেছেন বলে দেখা যায় না।

লিখিত ভাষার বাহন বর্ণমালা। ভাষার উন্নয়নের জন্য যেমন প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের প্রয়োজন তেমনি বিতর্কিত বর্ণমালার সমস্যার সমাধানও জরুরি। সব সমস্যারই সমাধান নিশ্চয়ই একদিন হবে — তবে তা কবে হবে ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

ত্রিপুরী সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার

পৃথিবীর নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার আছে। আদিম যুগে মানুষ নানাভাবে বিপদ আপদের সম্মুখীন হতো এবং তার কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার অভাবে ভীত সন্ত্রস্ত কিছু ভুল ধারণা ও মনগড়া বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকত। শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তারে ধীরে ধীরে এসব সংস্কার ও বিশ্বাস বিলুপ্ত হতে চলেছে। যত বেশি লোককে যত দ্রুত শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হবে, তত শীঘ্র এসব ভ্রান্ত ধারণা এবং বিশ্বাস সমাজ থেকে চলে যাবে। মানুষ নিজের আত্মরক্ষার তাগিদে মনগড়া দেবতা এবং অপদেবতার কল্পনা করে এসব বিশ্বাস এবং সংস্কার মেনে চলেছে।

অন্যান্য সমাজের মতো আমাদের ত্রিপুরী সমাজও নানা বিশ্বাস ও সংস্কারে আবদ্ধ। সেগুলোর কোনটি ভাল কোনটি খারাপ সেটা বিতর্কের বিষয়। আমাদের বিশ্বাস গ্রাম পাহাড়ের চারিদিকেই নানা ভূতপ্রেত দেবতা অপদেবতায় ভর্তি। যে-কোন কাজে আমাদের পূজা দিতে হয়। মোরগ, হাঁস, ডিম, পাঁঠা, কাছিম প্রভৃতি প্রাণী বলি দিয়ে আমরা দেবতাদের সন্তুষ্টির চেষ্টা করে থাকি। লাম্প্রা উৎসব দিয়ে আমাদের শুরু, নবান্নের আগে আমাদের এগুলোর পূজা দিতে হয়। নকসু মৗতাই মোরগ বলি দিয়ে ঘরের কোণে বিছানার মাথার দিকে যে-দেবতা থাকেন, তাকে আমরা এভাবে পূজা দিই। যাতে আমাদের ঘরে সুখ-শান্তি থাকে, যাতে আমরা অসুখবিসুখ থেকে মুক্ত থাকি। তিনি আমাদের ঘর পাহারা দিয়ে রাখেন। পুরানো চাল ঢেলে রেখে নূতন চাল ভর্তি করে দুটো মাটির পাত্র সরা দিয়ে ঢেকে তাতে একটু কার্পাস দিয়ে আমরা রন্ধক পূজা দিই। এই পাত্র দুটো সারা বছর রেখে দেওয়া হয়, যতদিন না আবার আরেক নবান্ন আসে। আবার নূতন বছরের চাল ভর্তি না হয়। এতে না কি লক্ষ্মী আমাদের ঘরে বিরাজ থাকেন।

কারো কোন অসুখ হলে জ্বর-জারি পেট ব্যথা হলে আমরা জলপড়া খাওয়াই, ঝাড়ফুঁক করি, মন্ত্র দিই। তাতে অনেকসময় ভাল হয় অনেক সময় হয় না। দীর্ঘদিন অসুস্থ হলে ওঝা ডেকে 'ঠিকানা' দেখি। মন্ত্র পড়ে 'ঠিকানা' দেখে ওঝা বলে দেন, কোন দেবতা ভর করেছে এবং এও বলে দেন, কী জিনিস বা প্রাণী দিয়ে কীভাবে কোথায় পূজা দিতে হবে। অনেকসময় — পরিবার বা রোগী মানত করেন, পাঁঠা বা একাধিক পাঁঠা বা মহিষ বলি দিয়ে উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরীর পূজা দেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজের

চিকিৎসাও চলে। এখন দেখার বিষয় মন্ত্রপূত জল, না ডাক্তার বদ্যির ঔষধে বা বনজ কবিরাজী ওষুধে, না মা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন।

পেটে টিউমার হলে সন্দেহ হয় — সাঁকাল নাঙখা হীনাঁই। অর্থাৎ ডাইন-এর দৃষ্টিতে হয়েছে। সেটাও ওঝাই 'ঠিকানা' দেখে বলে দেন। ডাইন-এর দৃষ্টি হলে তাকে গভীর রাতে, যখন সব গ্রাম ঘুমিয়ে থাকে, তখন পুকুরপাড়ে মাচা বেঁধে কাছিম কেটে রান্না করে তার পূজা দিতে হয়, পরদিন সে-রান্না করা কাছিমের মাংস কিছুটা ফেলে দিয়ে বাকিটুকু খাওয়া হয়। অন্যান্য হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মত আমরাও উত্তর দিকে মাথা রেখে ঘুমাই না। মানুষ মারা গেলে মৃতের মাথা উত্তরদিকে রেখে শোয়াই। কোন ছোট শিশু বা বাচ্চাদের কোনভাবেই উত্তরদিকে বালিশ দিয়ে ঘুম পাড়াই না। কারণ উত্তর দিক নাকি মৃতদের দিক। তেমনি পূর্ব দিকে পিঠ দিয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে দেবদেবীদের আমরা পূজা দিই। পশ্চিম দিক নাকি মুসলমানদের মক্কা মদিনার দিক।

মৃতদেহকে ধূপধুনা দিয়ে তুলসীপাতা দিয়ে চান করিয়ে নূতন বস্ত্র পরিয়ে খাটে বা বাঁশের তৈরি মাচায় করে, পা দু'টি সামনের দিক দিয়ে বহন করে আমরা শ্মশানের দিকে যাই। মৃত্যুর পর ফলা বা আত্মা নাকি মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, দেবতা হলে কী হবে, তিনি নাকি জলের ধারা বা খাল, ছড়া পার হতে পারেন না। অদৃশ্য হলেও দু'জন লোক সূতা ধরে বা সূতার সেতু তৈরি করে আত্মাকে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। বুড়িমা নদীর পারে শবদেহ দাহ করা হয়। বড় সন্তান মুখে আগুন দেন, ছেলেরাই শ্রাদ্ধ-শান্তি করেন, বারদিন নিরামিষ হবিষ্য করে, বিবাহিত মেয়েরা নিরামিষ হবিষ্য করলেও তিনদিনের বেশি তা করতে হয় না। তারাও ছোটোখাটোভাবে শ্রাদ্ধ করেন। মৃতদের পুত্র সন্তানরা নিয়মকানুন মেনে শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে বারদিন পর তেরদিনের দিন ব্রাহ্মণ ডেকে সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে মা-বাবার শ্রাদ্ধ করে। স্বর্গে যেতে বৈতরণী নদী পার করার জন্য মেয়ে বাছুরও ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। মৃত মা বা কষ্ট পাবেন — এই ভয়ে জামাকাপড় বিছানাপত্র ছাতা লাঠি লেপ-তোষক সবই দিতে হয়। এসব বিশ্বাস বা সংস্কার চলে আসছে, এটা হচ্ছে চিরাচরিত বিশ্বাস। এ-নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেন না। এটা হিন্দুদের প্রথা। মাটিতে ঘুমিয়ে হবিষ্য করে ধড়া গলায় নেয়, স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ থাকে। বারদিন ধরে আমরা মৃতদের শ্রদ্ধা জানাই। মাথার চুল কামিয়ে, আরো নানা নিয়মকানুন মেনে শ্রাদ্ধ করে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

ঘরের কেউ মারা গেলে সমগ্র পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন অশৌচ হয়ে যান। শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এ-অশৌচ কাটে না। কোন শুভকাজ, যেমন বিয়েসাদি এ-সময়টায় হতে পারবে না। কেউ কেউ বাবা মা মারা যাওয়ার এক বছরের মধ্যে বিয়েসাদি দেন না। বাবা মারা গেলে ছেলেরা এক বছর পর্যন্ত ছাতা মাথায় দেন না, মা মারা গেলে আঠার

মাস পর্যন্ত ছাতা মাথায় দেওয়া যাবে না।

যেদিন কোন গ্রামে মানুষ মারা যান সেদিন গ্রামের প্রতিটি পরিবারের সদর উঠোনের সদর দরজায় সন্ধ্যার সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়, এ আগুন সারারাত জ্বলে। এটাতে না কি মৃতের খারাপ আত্মা কারো বাড়িতে ঢুকে কারো অমঙ্গল করতে পারে না।

সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তান এবং মাকে ঘরের এক কোণে রেখে ঘরের ভেতর দিনরাত আগুন রেখে, আড়ি বেঁধে রাখার মানে বোঝা যায়, যাতে পোকামাকড় বা ব্যাকটেরিয়া মা ও শিশু সন্তানকে আক্রমণ করতে না পারে। এটাও বৃহৎভাবে আর অশৌচ করে রাখা হয় এক মাস যাতে শিশুকে কোলে নিয়ে নোংরা হাতে অপরিষ্কার কাপড়ে শিশুকে সংক্রমিতনা করে তার জন্য। মাও নানা কাজের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নিজের শরীরকে সারিয়ে তোলার সুযোগ পান। শুধু শিশুর যত্নই তখন মার একমাত্র কাজ। এতে শিশু এবং প্রসূতি দু'য়েরই মঙ্গল। তেমনি মেয়েরা ঋতুমতী হলে তাদের অশৌচ করে রাখা হয়, তারা তখন কলসী করে জল আনতে পারে না। রান্নাবান্না করতে দেওয়া হয় না। গোলাঘরে বা গোয়ালঘরে পর্যন্ত তাদের ঢুকতে নিষেধ। হয়ত ভারি পরিশ্রমের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এসব নিয়ম কানুন। স্বামীর সঙ্গে শোওয়া তাদের তখন মানা।

পাহাড়ি সমাজে ভূত-প্রেতের ভয়ে মেয়েদের খোলাচুলে সন্ধ্যের অন্ধকারে ঘরের বাইরে বেরোতে দেওয়া হয় না। চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মাকে ঘরের ভেতরে এলোচুলে দু'পা ছড়িয়ে বসে থাকতে হয়। আমাদের অবেলায় চুল ছাঁটা, নখ কাটা নিষেধ। মঙ্গলবারে বা বৃহস্পতিবারে চুল ছাঁটা নিষেধ। চোখের পাতা নাচলে ভাল, মেয়েদের বাঁ চোখের পাতা নাচলে ভাল।

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে নাকের অবস্থান খুবই বিশেষ জায়গায় রয়েছে। হাঁচি দিলে শুধু নিজের যাত্রাভঙ্গই হয়, তা নয়, অন্যের যাত্রাভঙ্গের প্রবাদও আছে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের কথা কে না জানে! যাত্রার সময় দোরগোড়ায় হোঁচট খেলে বা দরজায় ঠোক্কর খেলে যাত্রায় বাধা পড়ে বলে মনে করা হয়। তেমনি বা গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার সময় যদি মোরগ ডাকে বা গাই বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে দেখা যায়, তবে শুভ লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়। যাত্রার সময় মা আমাদের বাঁ হাতের অনামিকা কামড়ে এঁটো করে দেন যাতে দেবতা বা অপদেবতা আমাদের এঁটো দেখে ছেড়ে দেন। তেমনিভাবে অনেক পরিবারে ছেলেদের কান ফুটো করে খুঁত দিয়ে রাখা হয়। খুঁত থাকলে দেবতার ভোগে লাগে না। তাই তখনকার দিনে রাজার ছেলেধরারা বলি দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে যাবে না। চলার সময় পথে সাপ যদি রাস্তার ডানদিক থেকে বাঁদিকে অতিক্রম করে যায় এবং শেয়াল যদি বাঁদিক থেকে ডানদিকে যায়, তবে নাকি শুভলক্ষণ।

এখনো পাহাড়িরা তন্ত্রমন্ত্রে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। কিছুটা সুযোগ সুবিধার অভাব, বেশিরভাগটাই শিক্ষার অভাবে এটা চলছে। এই সেদিনও আমার এক নিকট আত্মীয়ের পেটে ব্যথা এবং দাস্তবমি হয়েছিল। ওষুধপত্র দিয়ে ভাল করা হয়েছিল, কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর উদয়পুরে মাতাবাড়ি গিয়ে পাঁঠা বলি দিয়ে এল। বললো, মার দয়াতেই না কি সে সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

তবে এটাও ঠিক, আজকাল অন্ধবিশ্বাস অনেক কমে এসেছে এবং আরো কমবে ভবিষ্যতে। এজন্য শিক্ষার বিস্তার এবং সচেতনতা সৃষ্টির কার্যসূচী প্রয়োজন।

অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব দশরথ দেব

ত্রিপুরার মুকুটহীন 'রাজা দশরথ' গত ১৪ই অক্টোবর ১৯৯৮ চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯৪০ সালে আগরতলা ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসে। তখন তিনি ক্লাস সেভেনের ছাত্র। বোর্ডিং-এ থেকে স্টাইপেন্ড নিয়ে উমাকান্ত একাডেমিতে পড়তেন। আমি তখন ক্লাস থ্রিতে এসে বোর্ডিং-এ এবং উমাকান্ততে ভর্তি হয়েছি। চল্লিশ এবং একচল্লিশ এই দু'বছর তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। এটা মনে আছে, তর্কে তাঁকে কেউ হারাতে পারত না। তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল আকর্ষণীয়। কথা বলার ভঙ্গি, চাহনি, এদিক ওদিক তাকানো, হাসি, হাত নাড়া, সবই অন্যকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করত। এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ সহজসরল অথচ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ চলাফেরা ভোলা যায় না।

গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলোতে ঘরের চাল এনে নিজের খরচে বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশোনা করতে চেয়েছিলেন কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র। কারণ সামনেই অনেকের বাৎসরিক বা ফাইনাল পরীক্ষা। বোর্ডিং-এর সুপার আনন্দমোহন দাস রাজি হলেন না। তেমন কোন জোরালো যুক্তিও তিনি দেখাতে পারেননি। দশরথদা অনেক তর্ক করলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হলেন এবং সেজন্য বোর্ডিং থেকে বহিষ্কৃত হলেন। ১৯৪১ সাল। রামকুমার ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় তিনি খোয়াই বোর্ডিং-এ ভর্তি হলেন। ভর্তি হলেন খোয়াই হাইস্কুলে। খোয়াই হাইস্কুল থেকেই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন ১৯৪৩ সালে এবং ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেন। তারপর সময়ের প্রবাহে কতদিন কেটে গেল। কতভাবে কতখানে তাঁর কাছাকাছি এসেছি, তাঁর স্নেহের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছি সে আলাদা কথা। তবু তাঁর ব্যক্তিগত অনেক কথাই জানি না — তাই মনে হল এ-বিষয়ে কিছু সংগ্রহ করে রাখি। তাই ১৯৯৪ সালের ২৮ শে জুন বিকেল চারটায় মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অনেক বিষয় তাঁর মুখ থেকে জেনে নিয়ে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। যেমন তিনি পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন ১৯৩৫ সাল এবং ফার্স্ট হয়ে মাসিক দু'টাকা হারে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত বৃত্তি পান।

তখনই তিনি বলেছিলেন — পনের বছর বয়সে নাকি তিনি বাল্যশিক্ষা অ আ ক খ শেখেন।

১৯৩৭ সালে তিনি নিম্ন বাংলা ছাত্রবৃত্তি ক্লাশ ফোর পরীক্ষা দেন এবং মাসিক চার

টাকা হারে বৃত্তি পান। ১৯৩৯ সালে আবার মাইনর ও ক্লাশে সিক্স ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং এবারও তিনি মাসিক পাঁচ টাকা হারে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত বৃত্তি লাভ করেন। সে বৎসরই তিনি আগরতলায় ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসে এসে ভর্তি হন।

খোয়াই হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে তিনি হবিগঞ্জে বৃন্দাবন কলেজে ভর্তি হন। বিষয় ছিল হিস্ট্রি, সিভিকস্, সংস্কৃত, ইংলিশ, বাংলা। যখন তিনি হবিগঞ্জে পড়ছিলেন তখনই আমি ও অঘোর দেববর্মা গিয়ে একটা সমিতি গড়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আসেন এবং দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় আমরা তাঁকে সহসভাপতি করে জনশিক্ষা সমিতি গড়ি।

এরপর হবিগঞ্জ থেকে বি.এ. পাশ করে তিনি কলকাতায় চলে যান ১৯৪৭ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রি এবং কালচার নিয়ে তিনি এম. এ এবং তার সঙ্গে 'ল' পড়তে শুরু করেন। যদিও ছাত্রাবস্থায় তিনি কোন রাজনৈতিক দলে জড়িত ছিলেন না তবুও সন্দেহ বশে পুলিশ তাঁর পিছনে লাগায় তিনি ১৯৪৮ সালের মে মাসে গ্রেপ্তার এড়াতে ত্রিপুরায় ফিরে অসেন এবং আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যান। তখন গণমুক্তি পরিষদ গঠন করে তিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জনশিক্ষা সমিতি মহারাজার কাছ থেকে চারশ থেকে সাড়ে চারশ পাঠশালার স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছিল। এই জনশিক্ষা সমিতি পাহাড়ে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। অন্ধকার পাহাড়ের বুকে শিক্ষার মশাল জ্বালিয়ে প্রায় যাযাবর জুমিয়া উপজাতি সম্প্রদায়কে এক নূতন জগতের সন্ধান দিতে পেরেছিল। তখনই দশরথ, সুধন্বা, হেমন্ত এবং অঘোরের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনে আমরা অনেকেই সামিল ছিলাম। বিশেষ করে আমি, অঘোর, সুধন্বা ও হেমন্তই মহারাজা বীরবিক্রমের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে দেখা করে প্রথমে পাঠশালার জন্য আবেদন জানাই। তখন দশরথদা আবার হবিগঞ্জে ফিরে গেছেন, কাজেই তিনি সেই রাজ দরবারে ছিলেন না। মহারাজা বীরবিক্রম ততদিনে তিন তিনবার ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এসে লেখাপড়ার প্রতি উদার মনোভাবে অনুপ্রাণিত। কাজেই আমাদের পাঠশালা স্থাপনের দাবির প্রতি সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডি এ ডব্লিউ ব্রাউন সাহেবকে আদেশ দেন — আমাদের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলোর যেন স্বীকৃতি দেওয়া হয়। জনশিক্ষা সাফল্যের এক বিরাট সোপান। শিক্ষার জন্য ক্ষুধিত নিদ্রিত পাহাড় জেগে ওঠে সেই আন্দোলনের ঢেউয়ে। লোক জমানোর জন্য মিটিং এবং বক্তৃতা হতো পাড়ায় পাড়ায়। নিজেরা স্কুল স্থাপনের জন্য জায়গা নির্বাচন করে নিজেদের শ্রম দিয়ে বনজঙ্গল থেকে আনা অফুরন্ত গাছ বাঁশ ছন কেটে এনে পাঠশালা তৈরি হতো। শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি হতো কাছাকাছির অল্পশিক্ষিত বেকার যুবকেরা। তারপর সরকারের কাছে

স্কুল এবং শিক্ষকের স্বীকৃতি মিলত। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সমাজের কুসংস্কার, কু-অভ্যাস, কুরীতির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। মহাজনী-শোষণ এবং সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধেও এই আন্দোলন মুখর হয়েছিল। এইভাবে প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানে মদের অত্যধিক প্রচলন এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘর জামাই, রাজকর্মচারীদের জন্য বেগার খাটা তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল বহু শতাব্দীর ঘুমন্ত ত্রিপুরী সমাজ। জনশিক্ষা আন্দোলনে দশরথদা কাজ করেছিলেন বিশেষভাবে উত্তর ত্রিপুরায় কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা শুধু উত্তর ত্রিপুরায় সীমাবদ্ধ রইল না। সমস্ত ত্রিপুরায় তাঁর নাম সকলের নামের আগে ছড়িয়ে পড়ল। অন্যকে, আমজনতাকে এবং নিজের কাছের সহকর্মীদের, বন্ধুবান্ধবদের প্রভাবিত উদ্বুদ্ধ করার অসীম ক্ষমতা ছিল দশরথদার। এ ব্যাপারে তিনি অনন্য।

১৯৪৭-৪৮ সাল নাগাদ দশরথদা এম. এ. পড়তে কলকাতায় চলে যান। আমি তাঁর এবং সমিতির অন্যান্য সহকর্মীদের পরামর্শে চিটাগাং মেডিকেল স্কুলে পড়তে চলে যাই।

তখন শুরু হল নূতন অধ্যায়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। পাঞ্জাব ও বাংলা দু'ভাগে বিভক্ত। রাজমাতা হিসাবে কাঞ্চনপ্রভা তখন রিজেন্ট ত্রিপুরায়। কারণ মহারাজা বীরবিক্রম মারা গেছেন ১৯৪৭-এর মে মাসে। চারদিকে চলছে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। প্রজামণ্ডল, কংগ্রেস এবং ক্ষুদ্র ইউনিট নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি রাজ্যে কাজ করছে। নানা প্রভাবশালী মহল রাজমাতাকে নানাভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন — ত্রিপুরা ভারত না পাকিস্তানে যোগদান করবে এ বিষয়ে। অবশেষে ১৫ই অক্টোবর ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরার ভারতচুক্তির সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হলো। ত্রিপুরা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করল।

কেন্দ্রে নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বে কংগ্রেসের শাসন, ত্রিপুরায় তাদেরই নিযুক্ত দেওয়ানী শাসন। জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তখন প্রজামণ্ডল করবেন, না সর্বভারতীয় কংগ্রেসে যোগদান করবেন, এই দোদুল্যমান অবস্থায় পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার উদ্যোগ নেয় স্থানীয় দেওয়ানী শাসন। চারদিকে পুলিশ মিলিটারি লেলিয়ে দেওয়া হয়। প্রচুর মানুষ খুন হয়, গ্রেপ্তার হয়, হাজার হাজার মানুষ এবং অসংখ্য ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

বিবর্তনমূলক আইনের আওতায় দশরথ, সুধন্বা, হেমন্ত, অঘোর, বীরেন দত্ত, প্রভাত রায় এবং বংশী ঠাকুরের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হয়। গ্রেপ্তার এড়াতে দশরথদা ১৯৪৮-এর মে মাসে কলকাতা থেকে ত্রিপুরায় আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে আসেন। তাঁর নামে হুলিয়া বের হয়। জীবন্ত কিংবা মৃত দশরথকে ধরে এনে দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্ব তখন তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল নিরপেক্ষ, একদল কংগ্রেসের পক্ষে এবং আরেকদলের প্রজামণ্ডলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে বিতর্ক হচ্ছিল। দু'একজন যাঁরা অন্যের অজান্তে কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন — তাঁরাই জোরালো দাবি তুলল — কোনপক্ষেই আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা একত্রই থাকব এবং তার জন্য অন্য একটি নূতন দল গঠন করা হোক। তখন ঠিক হলো — দশরথদাকে সভাপতি করে অঘোরকে সম্পাদক করে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হবে এবং ১৯৪৮ সালের কোন এক সময়ে সেটি গঠিত হয়েছিল।

এরপর কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার আরো বেড়ে গিয়েছিল — কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে গণমুক্তি পরিষদকে শৈশবেই পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে ভেঙে চুরমার করার চেষ্টা নিয়েছিল। তখন দশরথদার নেতৃত্বে ঠিক হলো, এভাবে পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কোন মানে হয় না। তার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে। সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত শান্তিসেনা তৈরি হলো। একটি সুশৃঙ্খল পরিশীলিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী গড়ে তুলে পুলিশ ও মিলিটারির মোকাবেলা করা হল। ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলসের ডিমব্যান্ডেড সৈনিকরা এসে গণমুক্তি পরিষদের শান্তিসেনাকে আরো মজবুত করে তোলেন। বিদ্রোহ করতে পারে এই ভয়ে সরকার ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলসকে ডিমব্যান্ডেড করে দেয়।

১৯৫০ সালের ১৩ই এপ্রিল যুগান্তর পত্রিকায় 'ত্রিপুরায় নকল মহারাজার আবির্ভাব' শিরোনামে একটা সংবাদ বেরিয়েছিল। এখানে তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "ভারতের পূর্ব সীমান্তস্থিত ত্রিপুরা প্রকৃত মহারাজদের শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিলেও রাজ্যের একটি ডিভিশনে কিছুদিন যাবৎ একজন নকল মহারাজা দেখা দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর বস্তুতান্ত্রিক জগতের নাগরিকবৃন্দ এই সংবাদে আরও কৌতুক বোধ করিবেন যে, ত্রিপুরার এই নব মহারাজা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম সদস্য এবং বর্তমানে তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরারী, যদিও পাহাড়ীয়াদের নিকটে সহজেই দর্শনদান করিয়া থাকেন। মাত্র আঠাশ বৎসর বয়সে এই যুবক দশরথ দেববর্মার কৃতিত্বে আজ ত্রিপুরা মুখর। সরকারী দপ্তর অঞ্চল ও রাজ পরিবারের কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি ভবিষ্যতের কল্পনায় মশগুল।

শ্রীমান দেববর্মার এই বৈপ্লবিক পরিণতির পশ্চাতে ইতিহাস বিয়োগান্ত। সে ত্রিপুরার পাহাড়ীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র গ্র্যাজুয়েট। কলিকাতায় থাকিবার সময় দশরথ কম্যুনিজমের বিষ পান করে এবং পরীক্ষা না দিয়াই ত্রিপুরায় আসিয়া প্রায় এক বৎসর আগে খোয়াই ডিভিশনের পাহাড়ীয়াদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কম্যুনিস্ট পার্টি গড়িয়া তোলে।" (১৩ই এপ্রিল স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত) এবিষয়ে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

তারপর, ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ত্রিপুরায় সব নেতারা

জেলে, দশরথদা ফেরারী। কলকাতা থেকে ডাঃ বি কে বসু এলেন ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য। দশরথদা সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী। আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকেই তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হলেন। তারপর, ত্রিপুরা এবং ভারতের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি নাটকীয়ভাবে দিল্লিতে সংসদ ভবনে সংসদের অধ্যক্ষের সামনে হাজির হলেন। তারপরের ইতিহাস সবারই জানা। সংসদে তিনি নানাভাবে নিজের প্রতিভা এবং মেধার স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি হাউসের পাবলিক একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবেও কাজ করেছেন এবং তার সুবাদে নানা প্রদেশ ঘুরে কাজ করে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

এরপর ত্রিপুরায় ১৯৭৭ সালের রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য হন। শিক্ষা এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে তিনি কাজ করেন। তাঁর মন্ত্রিত্বকালে পাহাড়িয়া জনমাটির 'ককবরক' ভাষা সরকারী স্বীকৃতি পায়। ককবরক দ্বিতীয় স্টেট ল্যাংগুয়েজ হিসাবে পাহাড়ি ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষার বাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শত শত বছরের অস্বীকৃত এবং সরকারী কাজে অব্যবহৃত এই ককবরক আজ রাজ্যে চর্চায় এসেছে, অনেক কবিতা, গল্প, নাটক এমনকি উপন্যাসও এই ভাষায় শেখা হচ্ছে। দশরথ দেব না থাকলে এই ভাষা কোনদিন স্বীকৃতি পেত কি না সন্দেহ।

তিনি মন্ত্রী হয়েই সংবিধানে স্বীকৃতি একশো পয়েন্ট রোস্টার মেনে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব প্রার্থীদের চাকুরীতে নিযুক্তির প্রথা চালু করতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সংরক্ষিত চাকুরীর শূন্যপদ পূরণের ব্যাপারে কড়াকড়ি করে পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের, প্রার্থীদের পরিত্রাতা হিসাবে দেখা দেন। ককবরক ভাষায় শিক্ষণও চালু করে।

উপজাতি অঞ্চলের নিম্নবুনিয়াদি স্কুলগুলোর জন্য ককবরক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে বহু সংখ্যক উপজাতি শিক্ষিত বেকার যুবকদের চাকুরীর ব্যবস্থা করে পাহাড়ি জনজাতির এক প্রজন্মের জীবন-জীবিকার সংস্থান দিয়ে বঞ্চিত অবহেলিত মানুষদের বাঁচার উপায় করে দেন। এভাবে চাকুরী পেয়ে এই শিক্ষিত উপজাতি যুবকরা আজকে অনাহার অর্ধাহার থেকে মুক্তি পেয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখছেন।

দশরথ দেবের এসব অবদানের জন্য উপজাতিরা তাঁকে আপনজন হিসাবে কাছের মানুষ মনে করে শ্রদ্ধা করে, সমীহ করে।

অন্যদিকে, দশরথ দেব বাঙালিদের জন্যও ঐতিহাসিক কতকগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যার জন্য বাঙালি হিন্দুরা তাঁর কাছে ঋণী। ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পরে ১৯৫৪ সালে গঠিত ভারত সরকারের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ত্রিপুরাকে আসামের একটি

জেলা হিসাবে আসাম রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছিলেন। তদানীন্তন চীফ কমিশনার নাগরী মোহন পট্টনায়েকও আসামের অন্তর্ভুক্তির জন্যই সুপারিশ করেছিলেন এই বলে যে, ত্রিপুরার আদিবাসীদের জন্য সেটাই হবে মঙ্গল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ না করে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি দশরথ দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরাকে আসামের থেকে আলাদা রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই মতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। সেই আন্দোলনের চাপে ত্রিপুরা স্বতন্ত্র থেকে যায়।

দশরথদা জাতি-উপজাতির মিলিত প্রয়াসে বিশ্বাসী ছিলেন। উপজাতিরা যখন সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন তখন তাঁদের রক্ষাকবচ হিসাবে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠনের জন্য জাতি-উপজাতির মিলিত প্রয়াস নেন। দশরথদার নেতৃত্বে তাঁর অলঙঘনীয় প্রভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুপজাতির সক্রিয় সহযোগিতায় সকলের মিলিত জোরালো আন্দোলনের ফলে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। দশরথদার অবদান এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

জাতি-উপজাতির ঐক্যবদ্ধ মিলিত চেষ্টায় সব সমস্যারই সমাধান সম্ভব — এই দৃঢ় বিশ্বাস দশরথদার ছিল এবং এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সব সমস্যার সমাধান এখনো অনেক বাকি — তবে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করে তাঁর প্রদর্শিত পথেই আমাদের এগোতে হবে এবং সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

ত্রিপুরার প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্ত

স্বাধীনতার পর আমরা অনেক পথ পার হয়ে এসেছি। উন্নতির দিক থেকে না হোক, সময়ের দিক থেকে তো বটেই। স্বাধীনতার পর আমাদের বিভিন্ন দিকের কর্মকাণ্ডের সঠিকভাবে এবং সবদিক রক্ষা করে একটা সত্যি ইতিহাস আমরা এখনো লিখে উঠতে পারিনি।

এটা যেমন সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদি সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে স্থানীয় জীবনযাত্রার কথা হতে পারে তেমনি হতে পারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপার নিয়ে।

আজকাল দেখি অনেকেই অনেক কথা লিখছেন। তাদের অনেকগুলিই সত্য এবং সুলিখিত। আবার অনেক ব্যাপারেই দেখা যায় প্রকৃত তথ্য ও সত্য ঘটনাকে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি অথবা ঘটনাকে এদিক-ওদিক করে লেখা হয়েছে যার সংশোধন হওয়া উচিত। আসলে অনেক ব্যাপারেই অতীত ইতিহাসের লিখিত বা প্রমাণযোগ্য নিদর্শন নেই তাই এ -স্থলে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিবৃতি নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। সেইসব বিবৃতিও আবার কারো দ্বারা সঠিকভাবে সমর্থিত হলে তবেই তা ইতিহাসের মর্যাদা পেতে পারে, কারণ অনেকসময়েই বিবৃত ঘটনার আবেগানুভূতি এসে তাতে বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে, কাজেই যত্ন আন্তরিকতা সততা এবং সবচেয়ে বড়ো কথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমস্ত ইতিহাসকে ক্রমশ তুলে ধরতে হবে।

শ্রদ্ধেয় বীরেন দত্ত মারা যান ১৯৯২ সালে ১৮ ডিসেম্বর। এ সময়টাতে আমি আমার স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যাপারে মাদ্রাজ ছিলাম। সেখানেই খবরের কাগজে (ত্রিপুরা দর্পণে) সংবাদটা পড়েছি। তাঁর চলে যাওয়ার খবর পেয়ে ব্যথায় মনটা মোহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। কারণ তাঁর সঙ্গে আমাদের সাবালক হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে ওঠার একটা বিশেষ যোগ রয়ে গেছে।

তখন সেটা ১৯৪৪-৪৫ সাল। ত্রিপুরা বোর্ডিং-এ থেকে উমাকান্ত একাডেমিতে নাইনে পড়ি। ইতিমধ্যে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করেছে। ভারতে জনযুদ্ধের শুরু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা বিপ্লবী-সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী তাঁদের অনেকেই জেল খাটছিলেন। এঁরা জেলে বসেই পড়াশোনা করে কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। একসময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ফ্যাসী বিরোধী জনমত গড়ে তুলে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবাইকে সামিল

করার জন্য তাদের জেল থেকে ছেড়ে দিলেন। এই সময়েই বীরেনদা আমাদের কাছে আসেন। তাদের মনে তখন একটা আদর্শ এবং উদ্দেশ্য কাজ করছিল। আপামর জনসাধারণকে, বিশেষত শিক্ষিত ছাত্রযুবকদের নিয়ে শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবের পথে পা না বাড়ালে শুধু সন্ত্রাসবাদ দিয়ে দেশে স্বাধীনতা আনা যাবে না এ বিশ্বাস তাদের মনে কাজ করছিল। বীরেনদা ছিলেন এই মাটিরই মানুষ। এই জায়গার ছেলে পৈত্রিক সূত্রে স্থানীয় বাসিন্দা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ত্রিপুরায় গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে ত্রিপুরায় তখনকার বৃহত্তর জনসংখ্যার অধিবাসী ট্রাইবেলদের আন্দোলনে সামিল না করলে আন্দোলন সফল হবে না। তখন সাড়ে ছয়লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই ছিল আদিবাসী বা ট্রাইবেল।

এই সমসাময়িক কালেই ত্রিপুরায় স্থানীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব প্রভাত রায় (দেববর্মা) এবং বংশী ঠাকুর (দেববর্মা) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত হলেন। বীরেনদার সঙ্গে সহযোগিতার পথে তাঁরা জনমঙ্গল সমিতি গড়ে তোলেন। তখন এখানে প্রফেশনাল পলিটিশিয়ান বলতে ছিলেন প্রভাত রায় এবং বোর্ডিং সুপার থাকার সুবাদে বংশী ঠাকুর আমাদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁকে আমরা জানতাম। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই তাঁরা দুজনে P.D. Act-এ অন্তরীণ হয়ে পড়লেন।

বস্তুত তখনই আমরা প্রথম প্রফেশনাল রাজনীতিবিদ হিসাবে বীরেনদাকে পেলাম। ইতিমধ্যে ক্লাশ এইটে থাকতে বীরচন্দ্র লাইব্রেরি থেকে এনে যোগেশচন্দ্র বাগলের 'সোভিয়েত রাশিয়া' দুই খণ্ড বই পড়া হয়ে গেছে। আমাদের বেশ কয়েকজনেরই ছিলো ভীষণ পড়ার নেশা, নানা বিষয়ে জানার অফুরন্ত আগ্রহ। চোখে স্বপ্নের ছোঁয়া। মনে হতো প্রাক্‌বিপ্লবের রাশিয়ায় জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের খুব মিল সেই অশিক্ষা, দারিদ্র, কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং প্রজাসাধারণ বিশেষত ট্রাইবেলরা অবিশ্বাস্য শোষণের শিকার। আমরা ভাবতে শুরু করলাম স্বপ্ন দেখতে লাগলাম যদি বিপ্লব হয় তবে আমাদেরও রাশিয়ার মত আমূল পরিবর্তন হবে না কেন? কিন্তু কীভাবে এই বিপ্লব সম্ভব, ভাবতে লাগলাম। আমাদের ছেলেমেয়েরাও সুন্দর সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরে ক্রেশে, স্কুলে কলেজে পড়াশোনা করবে, আমরাও অশিক্ষা দারিদ্র্যকে তাড়িয়ে সামন্ততন্ত্রকে নির্মূল করে কো-অপারেটিভের মারফত খেত-খামার করে নূতন নূতন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উৎপাদনের প্রাচুর্য এনে সমাজতন্ত্র কায়েম করবো।

এভাবে ভিতরে ভিতরে যখন আমরা দেশের জন্য একটা কিছু করার মনন-ছটফট করছি তখনই বীরেনদা আমাদের মাঝখানে কমিউনিজমের মূলমন্ত্র নিয়ে এলেন। পরমবন্ধুর মত খুব কাছাকাছি এসে নানা বইপত্র, প্রচারপত্র, পত্রিকা পড়তে দিলেন।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেলিন পড়তে লাগলাম। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে তর্ক আন্দোলন শুরু হলো। বীরেনদা আমাদের যে-কোন সমস্যার ব্যাখ্যা দিতেন তার জন্য আমরা অপেক্ষায় বসে থাকতাম। তার এমন সুন্দর বাচনভঙ্গি ছিল, এমন সহজ ব্যাখ্যার ক্ষমতা ছিল মনে হতো এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান তাঁর জানা ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা বোর্ডিং-এর মাঝখানের মধ্যে বসে আলাপ আলোচনা করতাম। কোনো কোনোদিন আমরা ঘরের সিঁড়িতে বসতাম। কংগ্রেসের দাদারও আমাদের ডাকাডাকি করতেন। আমরাও যেতাম শচীনদা সুখময়দার কাছে। তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সহজ সরল এবং ভালো জানাশোনা। কিন্তু শেষের দিকে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকলাম না। হয়তবা তাঁরা বিপ্লবে তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই। বিপ্লব যদি না হয় তবে দেশের এবং সমাজের আমুল পরিবর্তন কী করে সম্ভব। আনন্দবাজার, যুগান্তর পত্রিকা ছাড়াও জনযুদ্ধ পত্রিকা আসতে লাগল এবং আমরা পড়তে লাগলাম। কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো, মুজাফ্ফর আহমেদ, পি সি যোশীদের লেখা নানা বুকলেট, লিফলেট আসতে লাগল। আমরা গোগ্রাসে পড়তে লাগলাম। এগুলো আমরা পয়সা দিয়ে কিনেছি। পার্টিতে চাঁদা দিতে লাগলাম। আমরা পার্টির সমর্থক হয়ে গেলাম।

বীরেন দত্ত এসে বোর্ডিং এ কোন কোনদিন সারাদিন আমাদের সঙ্গে কাটাতেন। অনেকসময় আমাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতেন। রোগা পাতলা শরীর। তাঁর কোন আলস্য ও ক্লান্তি ছিল না। যা দেওয়া হতো তাই খেতেন। কোন উন্নাসিকতা ছিল না। কোন ছুৎমার্গ ছিল না। কথাও বলতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

লেখাপড়া শিখে, বইপত্র পড়ে, দুনিয়ার হালচাল দেখে একটা উদ্দীপনামূলক সখ এবং আদর্শ কাছে পেয়ে আমরা এ-সময়টাতে দেশের জন্য বাস্তবে কিছু একটা করার জন্য ছটফট করতে শুরু করলাম। আমাদের মানিসকতার উদ্দেশ্য তখন গড়ে উঠেছিল। আমরা দেখলাম এই পৃথিবীতে লেখাপড়া জানা না থাকলে মানুষ চোখ থেকেও অন্ধের মত। আমার নিজের বাবাকে দেখেছি তহশিল কাছারিতে পাঁচ টাকা খাজনা জমা দিয়ে দেড় টাকার রসিদ নিয়ে ফিরেছেন। লেখাপড়া জানলেও এত খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করেননি। এইসব বঞ্চনার ঘটনা অনেকের দৈনন্দিন জীবনেই এভাবে ঘটে চলেছে তাই আমরা বোর্ডিং-এর কয়েকজন মিলে ঠিক করলাম সবাইকে নিয়ে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে গ্রামে স্কুল খুলতে হবে। তখন আমরা বোর্ডিং-এর ক'জন, আমি, অঘোর দেববর্মা, হরিচরণ, গদাধর দেববর্মা প্রমুখ মিলে একটা সমিতি গঠন করার চিন্তা করলাম। তখন আমি এ-বিষয়ে লেখাপড়ার কাজগুলি অধিকাংশ করতাম। ঠিক হলো আমাদের যারা পূর্বসূরী কৃতী যোগ্য ছাত্র তাঁদের নিয়েই এই সমিতি গঠন করা হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি ও অঘোর দেববর্মা হবিগঞ্জ গিয়ে দশরথদার সঙ্গে দেখা করলাম।

তিনি তখন বৃন্দাবন কলেজে পড়তেন। আবার শ্রীকাইল কলেজে পাঠরত সুধন্বা দেববর্মার সঙ্গেও দেখা করলাম। তাঁরা উভয়েই রাজি হলেন। হেমন্ত দেববর্মা তখন রাজ আমলের এগ্রিকালচারেল ফার্মে কাজ করতেন, তাঁর সঙ্গেও কথা হলো। হেমন্তদা তাঁর বাড়ি দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় সভা করার জন্য রাজি হলেন। নানা জায়গায় ঘুরে আরো অনেক পুরানো ছাত্রদের ডাকা হলো।

এভাবে ১১ই পৌষ ১৩৫২ ইং (১৯৪৫ ইং) তারিখে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় হেমন্তদার বাড়িতে মিটিং করে জনশিক্ষা সমিতি গড়া হলো। জনমঙ্গল সমিতি নামে আগেই একটি রাজনৈতিক সংস্থা বর্তমান ছিল। তাই হয়ত আমরা এক অরাজনৈতিক সংস্থা জনশিক্ষা সমিতি গঠন করলাম। সমিতির সভাপতি হলেন সুধন্বা দেববর্মা, সহসভাপতি দশরথদা, হেমন্তদা সেক্রেটারি, অঘোর দেববর্মা অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। আমরা বাকিরা কার্যকরী সদস্য। মোট এগারজনকে নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হলো। এই উদ্যোগ এবং কর্মকাণ্ডের পিছনে বীরেনদা'র উৎসাহ পরামর্শ আমাদের ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার সময়ে এবং পরবর্তী দু'তিন বছর আমরা ঠিক করেছিলাম যেহেতু সরকার এবং মহারাজার আনুকূল্য নিয়ে স্কুলগুলি স্থাপিত হচ্ছে তাই আমরা কেউই সরাসরি রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সমিতির স্বার্থে যুক্ত হবো না। এভাবে প্রায় দু'বছরে আমরা সাড়ে তিনশোর বেশি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেছিলাম।

ত্রিপুরা রাজ্যকে উত্তরে দক্ষিণে দু'ভাগে ভাগ করে স্কুলগুলি দেখাশোনা পরিচালনার দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়েছিল।

উত্তরাঞ্চলের ভার নেন দশরথদা, দ্বারিক, হেমন্ত দেববর্মা এবং কর্মীগণ এবং দক্ষিণাঞ্চলের স্কুলগুলির ভার নেন অঘোর দেববর্মা, সুধন্বা, নীলমণি দেববর্মা প্রভৃতি কর্মীগণ। সেসময়ে স্কুলঘর তৈরি করে মাস্টার নিযুক্ত করে ছাত্রদের উপস্থিতি দেখাতে পারলে তবেই সরকারের স্বীকৃতি পাওয়া যেতো। তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ডি এ ডব্লু ব্রাউন সাহেব। আমরা দাবি দাওয়া এবং দরবারের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে অনেক প্রাথমিক স্কুলের স্বীকৃতি আদায় করেছিলাম। আমরা মহারাজা বীরবিক্রমের সঙ্গে বারকয়েক দেখা করে তাঁর কাছ থেকেও যথেষ্ট সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়েছিলাম। তাই তিনি সদ্য ইউরোপ থেকে ফিরে এসে খুব খুশি ও উদারমনা ছিলেন। বীরেনদা এই সমিতি করার জন্য আমাদের প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়ে ছিলেন। তখন তিনি ক্রমশ ছাত্র সংগঠন এবং বৃহত্তর জনসংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রথম পদক্ষেপেই সমস্ত আম জনতাকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য করা যায় না তবে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার এবং প্রসারের জন্য উপযুক্ত গণফ্রন্ট দরকার। তারই জন্য ছাত্র

ফেডারেশন, জনমঙ্গল সমিতি, প্রজামণ্ডল সমিতি বা গণমুক্তি পরিষদ বা কৃষক সমিতি বা গণতান্ত্রিক নারী সমিতি গড়তে হয়। এইসব ফ্রন্টের মাধ্যমেই কমিউনিস্টরা কাজ করেন। এভাবেই প্রথম ছাত্র ফেডারেশন গড়া হলো বীরেন দত্তের উদ্যোগে। এই সালের প্রথম সম্পাদক হলাম আমি। সভাপতি হলেন রফিকুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ ত্রিপুরেন্দ্র গাঙ্গুলি এবং সদস্য ছিলেন কালা মিঞা। পরবর্তী কালে দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য, অপূর্ব রায়, গৌরাঙ্গ দেববর্মা প্রমুখ যোগদান করেছিলেন।

নেত্রাকোণায়, কৃষক সম্মেলনের পর রংপুরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে আমরা ক'জন গেলাম। সেখানে গীতা মুখার্জি, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পি সি যোশীর সঙ্গে পরিচিত হলাম। তারপর কুমিল্লাতেও পি সি যোশী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হতে আমরা অনেকেই গেলাম। এসবের পিছনেও ছিলেন বীরেনদা। সেখান থেকে পি সি যোশী-সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আগরতলাতেও এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন - গোপাল হালদার। তিনি সেবার আমার লেখা 'ত্রিপুরার সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রবন্ধটির খুব প্রশংসা করলেন।

ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক হিসেবে গোপন তকমা নিয়ে আমি, বীরেনদা, প্রভাত রায়ের সঙ্গে একবার সোনামুড়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ি মোরগ মুসল্লম খেয়েছিলাম। উদয়পুরেও একবার গিয়েছিলাম সেখানে ফরিদ মিঞার বাড়িতে খেয়েছি। এগুলো সবই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের প্রস্তুতি, বলা চলে শুভেচ্ছা সফর। সেই সময়তেই কোন সংগঠন করার জন্য যাইনি। এসব-কিছুরই পিছনে ছিলেন বীরেনদা। এ অনেকটা কানু ছাড়া গীত নাই-এর মত বীরেনদা ছাড়া কোন প্রকৃত গণসংগঠন ঠিক কি না।

ইতিমধ্যে রটে গেল আমি নাকি কট্টর কমিউনিস্ট। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক যার সঙ্গে রংপুরে আমার পরিচয় হয়েছিল তার কাছে লেখা আমার একটি চিঠি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। কাজেই এখন যদি আমাকে প্রাধান্য দেয়া হয় তবে জনশিক্ষার ক্ষতি হবে। কারণ তখন পর্যন্ত জনশিক্ষা সমিতির রাজানুকূল্য পেয়ে বাড়-বাড়ন্তের পথে চলেছে।

এদিকে আমারও ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল। পরীক্ষা ভাল করতে পারিনি। হাই সেকেন্ড ডিভিশান নিয়ে পাশ করে গেলাম। তখনকার বোর্ডিং-এর সুপার নির্মল চক্রবর্তী আমার অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন।

পরবর্তীকালে তিনি ত্রিপুরার শিক্ষাবিভাগ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হয়ে কলকাতা চলে যান। তিনি আমাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে চিটাগাং মেডিকেল স্কুলে এল এম এফ পড়তে পাঠান। আমাদের পরিবারের তখন খুবই দুর্দিন। বড়দা এবং

মা দু'চারদিনের ব্যবধানে দুজনে কলেরায় মারা যান। পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কথা জেনে তিনি সবরকম স্টাইপেন্ড, বুকগ্রান্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে শেষ পর্যন্ত আমাকে পাঠালেন।

তিনি বললেন ডাক্তার হয়ে তুমি মানুষ বা দেশের যে-উপকার করতে পারবে, তাও কোন অংশেই কম হবে না। আমিও ভাবলাম আমাদের সম্প্রদায়ে ডাক্তার নেই। তার দরকার আছে। দশরথদা, সুধন্বদা, হেমন্তদা এবং অঘোরের শুভেচ্ছা নিয়ে আমি ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে চিটাগাং পাড়ি দিলাম। দশরথদা কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে এম.এ. ল. পড়তে গেলেন। ত্রিপুরেন্দ্র গাঙ্গুলি শ্রীরামপুরে টেক্সটাইল টেকনোলজি পড়তে গেলেন।

১৯৪৮, '৪৯, '৫০, '৫১ সালগুলো ছিল ত্রিপুরার বিশেষ করে পাহাড়ের মানুষের দুর্দিনের দিন। পুলিশ ও মিলিটারির অমানুষিক নির্যাতন দিনের পর দিন চলছিল। বহু মানুষের মৃত্যু হয়। শত শত গ্রাম বাড়ি পাহাড় জ্বালিয়ে শ্মশান করে দেয়া হয়েছিল।

এর মধ্যে দশরথদা যিনি গ্রেপ্তার এড়াতে কলকাতা থেকে আত্মগোপন করে ফিরে এসেছিলেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে তাঁরই নেতৃত্বে পাহাড়ে জঙ্গলে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠেছিল। শান্তিসেনার যেসব দিনগুলো মানুষকে এককাট্টা করেছে যেমন তেমনি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল জনসাধারণ। পুলিশ-মিলিটারির অত্যাচারও কমাতে বাধ্য হয়েছিল।

সেসব দিনগুলোতে আমি পড়তে পড়তে যখনই আগরতলায় এসেছি তখনই পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে গোপনে দশরথদা, অঘোর, সুধন্বাদাদের সঙ্গে দেখা করেছি। একবার সুধন্বদা আমার ঘড়ি নেই দেখে নিজের হাতের ঘড়িটা খুলে আমাকে দিয়েছিলেন।

এরপর এল ১৯৫৬ সালের সাধারণ নির্বাচন। বীরেনদা এবং দশরথদা যথাক্রমে পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভার প্রার্থী পদে দাঁড়ালেন। তখন দশরথদা সুধন্বাদারা আত্মগোপন করে আছেন। বীরেনদা এবং অঘোর ছাড়া আরও অনেকে ছিল। নির্বাচন পরিচালনার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে এলেন — ডা. বি কে বাসু। তিনি চিনে প্রেরিত মেডিকেল মিশনের সদস্য ও ডা. কোটনিশের সহকর্মী ছিলেন। আমাদের থাকার জায়গা ও অফিস ছিল বর্তমান জনশিক্ষা কো-অপারেটিভ প্রেসের বিপরীত দিকের দোতালা দালানে। পেছন দিকে ছিল সিঁড়ি। সকাল থেকে সন্ধ্যা আমাদের খাটাখাটুনি, পোস্টারিং, লিফলেট বিলি, নির্বাচনী ইসতেহার বিলি-বণ্টন, নানাহ কাজে আমরা ব্যস্ত। যথেষ্ট পয়সা আমাদের হাতে দিতেন ডা. বাসু। খাওয়াদাওয়ার জন্য পাশেই হোটেল। সেখানেই খাওয়া। অফিসে সতরঞ্চিতে রাত্রে ঘুম।

বীরচন্দ্র লাইব্রেরিতে বীরেনদার পোলিং এজেন্ট হয়ে কাজ করলাম। আমরা

সবাই পরিচিত। কোন পার্টিবাজী ও ভুয়োভোট ছিল না। কেউ চিন্তাও করত না মনে হয়। সবাই লাইন করে দাঁড়িয়ে একে একে সুন্দর করে ভোট দিয়ে গেলেন। বীরেনদা জিতলেন, দশরথদাও বিশাল ভোট পেয়ে জিতলেন।

আগেই বলেছি বীরেনদার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সবার কাছে নিজেকে গ্রহণীয় করে তোলা অতি সহজেই এটা হয়ে যেতো। খুব অল্প সময়ে বালক বৃদ্ধ সবাইকে তিনি আপন করে নিতে পারতেন। অন্যান্য দাদাদেরও দেখেছি, কাছাকাছি গেছি। তবু কিছুটা দূরত্ব থেকেই যেত। কিন্তু বীরেনদার মিশে যাবার ক্ষমতা ছিল সত্যি অতুলনীয়। এই কথাটা ক্ষমতা দিয়ে তিনি যেখানে গেছেন সেখানেই সবার ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। দেখেছি বোর্ডিং-এর প্রতিটি ছাত্রকে কীভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন।

আমাদের গ্রামের বাড়িতেও যখন তিনি গেছেন তখন গ্রামের প্রতিটি লোকের সঙ্গে তিনি খুব অনায়াসে এবং স্বচ্ছন্দে কথা বলতেন, মিশতেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দাদারা যেমন শচীনদা, সুখময়দা এবং দেবুদাও আমাদের ঘরে/গ্রামে গেছেন তবে কীভাবে লোকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া যায় সেটা বীরেনদার মত কেউ পারতেন না। আসলে তিনি জন্মগতভাবে খেটে খাওয়া সহজ সরল মানুষের নেতা, আপনজন ছিলেন। কাজেই আমাদের ব্যক্তিগত পরিবারগত সমস্যাদি নিয়ে নিঃসংকোচে তার কাছে গিয়েছি তিনিও আমাদের কাছে কিছু লুকোতেন না। নেতা হিসাবে তিনি বড় ছিলেন এটাই শেষ কথা নয় তিনি ছিলেন বহুমুখী গুণসম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মী। আমরা দেখেছি, জেনেছি যখন প্রথম প্রথম অনুশীলন সমিতি হয়েছিল তখনও বীরেনদা না কি ছিলেন। প্রভাত রায় এবং বংশী ঠাকুর যখন জনমঙ্গল সমিতি করেছিলেন তখনও বীরেনদা সঙ্গে ছিলেন। আমরা যখন জনশিক্ষা সমিতি গঠন করলাম তখনও বীরেনদা আমাদের পেছনে উৎসাহ এবং পরামর্শের ডালি হাতে, তারপর দেখলাম যখন প্রজামণ্ডল সমিতি হলো যোগেশ ঠাকুরের বাড়িতে একটি মিটিং-এ বীরেনদাও উপস্থিত। অঘোর দেববর্মাকে নিয়ে দশরথদা ও সুধন্বাদাকে সামনে এনে যখন গণমুক্তি পরিষদ গঠন করা হলো তখনও বীরেনদা ও অঘোর দেববর্মাই আসল স্থপতি। তেমনিভাবে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি গঠনের ব্যাপারেও তাদের দান অনস্বীকার্য। তেমনি ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন বীরেন দত্ত ও অঘোর দেববর্মা।

এর আগে কালচারেল ফ্রন্ট আই পি টি এ গঠন করার জন্যও তিনিই চেষ্টা নিয়েছিলেন। বিভিন্ন আর্টিস্টদের একত্র করে, ফান্ড জোগাড় করে নেত্রকোণায় কৃষক সম্মেলনে এবং পরবর্তী কালে হাসনাবাদ কৃষক সম্মেলনে তাদের নিয়ে গিয়েছিলেন বীরেনদা। এসব সাংগঠনিক কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা তার ছিল। আজকার যারা ট্রাইবেলদের ভাষা ককবরক এবং তাদের শিল্প সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিয়ে লেখালেখি

করেন একটা উৎসাহ উদ্দীপনার জোগাড় এনেছেন, তারা হচ্ছেন জনশিক্ষা সমিতির গড়া স্কুলের তৈরি ছাত্রছাত্রী। তাই জনশিক্ষা সমিতিকে এবং তার অবদানকে বাদ দিয়ে যেমন ত্রিপুরার ইতিহাস লেখা যাবে না। বস্তুত পক্ষে বীরেনদা হলেন ত্রিপুরার রাজনৈতিক আকাশে প্রথম সারি নেতাদের মধ্যে অন্যতম তো বটেই যদিনা প্রথম বা প্রধান হন। শেষ দেখা হয়েছিলো যখন, তখন বীরেনদা মন্ত্রী আমি সরকারী চাকুরে। মাঝেমধ্যে টি. বি. অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি হিসাবে বা সরকারি কাজকে উপলক্ষ করে, মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হতো, কিন্তু বীরেনদার সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হতো। একবার প্রাইভেট সেক্রেটারি খবর দিলেন রাজস্বমন্ত্রী দেখা করতে বলেছেন। অফিসে গেলাম খুব আদরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যক্তিগত, পারিবারিক কুশলাদির খবর নিলেন। তারপর বললেন — ভাই নীলমণি একটা অনুরোধ রয়েছে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না, তিনি ব্যাপারটা বললেন, — ইউ. জি. সি.-র কর্তারা এসেছিলেন। তোমাদের টি বি অ্যাসোসিয়েশনের আফটার কেয়ার কলোনির জন্য সূর্যমণিনগরে যে জায়গাটা অ্যালট করা আছে, সেটা তাদের খুব পছন্দ হয়েছে। সেখানে ইউনিভার্সিটি কমপ্লেক্স হবে। সেই অ্যালটেড় জায়গায়া গভর্নমেন্টকে ফেরত দিতে হবে।

আমি বললাম ফেরত নিয়ে নিন। কারণ টি বি রোগীদের এখন আর আফটার কেয়ার কলোনির দরকার নেই। সাধারণ রোগের মত টি বি রোগীর ঘরেই চিকিৎসা সম্ভব। ভাল জল ওষুধ বেরিয়ে যাওয়ায় আর কারো চিরপঙ্গু হয়ে আগের মত থাকতে হয় না। শুধু নিয়মমতো ওষুধ সামান্য সাধারণ খাবার সঙ্গে খেলেই হয়। তবে আমাদের একটা হাসপাতাল করার কথা হচ্ছিল। যা হোক গভর্নমেন্ট জায়গাটা নিয়ে কোন বৃহত্তর মহত্তর কাজে লাগালে আমাদের কোন আপত্তি থাকতেই পারে না। এমনি নোটিফিকেশন দিয়ে নিয়ে নিলেই পারতেন। তিনি বললেন, জায়গার ব্যাপারে তোমাদের দিক থেকে যদি কেউ কোর্ট-কাছারী-টাকা করে সেজন্য বলছিলাম। আমি বললাম সেরকম কিছু হবে না গভর্নমেন্ট নিয়ে নিক। এবং সেভাবেই জায়গাটা হস্তান্তরিত হয়েছিল। আজ সেখানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

পরিশেষে বীরেনদার সাংগঠনিক প্রতিভা শুধু রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটা উল্লেখ না করে পারছি না যে তাঁর পরিবারের ক্ষেত্রেও তিনি সুন্দর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে বিয়ে-সাদি সবই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে গেছেন। সম্পত্তির বিলি-বাটোয়ারা স্ত্রীর জন্য করে যাওয়া সবই একজন দায়িত্বশীল পিতা-পতির মতোই প্রশংসনীয়ভাবে করে গেছেন।

তবে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার আগে এখানে সরযূ বৌদির কথা না বললে এই স্মৃতিচারণা, এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সদাহাস্যময়ী বিনয়ী যেকোন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার অসীম শক্তিশালিনী মাধুর্যময়ী যে-মেয়েটিকে বীরেনদা জীবনে গ্রহণ করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি প্রকৃতপক্ষেই অর্ধাঙ্গিনী। অভাব, অনটন, দুঃখ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে একের পর এক শিশু-সন্তানদের নিয়ে তিনি পাহড়-পর্বতে বন-বন্দরে বিনা অভিযোগে মুখ বুজে এবং হাসিমুখে স্বামীর পাশাপাশি সংগ্রাম করে গেছেন। এটাই শেষ কথা নয়। মেয়েদের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনায় সাংগঠনিক কর্ম তিনি চালিয়ে গেছেন। মেয়েদের মিছিল, মিটিং আন্দোলনে পুরোধা হিসাবে তিনি ছিলেন। তাকে সবসময় আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে সংগ্রাম আন্দোলনে স্বামীর পাশাপাশি দেখেছি। প্রতিটি সফল পুরুষের পিছনেই একজন মমতাময়ী শক্তিময়ী, প্রেরণাদায়ী মা, স্ত্রী বা বোন থাকেন। সফল পুরুষটির বিচারের কালে তাঁর অবদানের হিসাব যদি আমরা না করি তবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অপূর্ণ থাকে।

পরিশেষে বলতে হচ্ছে যে, এই প্রাবন্ধিক আমি বক্তব্য লেখার আগে, সুধন্বাদা, সরযূবৌদি, কানু সেন, বেণু সেন, রবীন সেন, কালা মিঞা, অপূর্ব রায় প্রমুখের সঙ্গে দেখা করে টুকরো টুকরো তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমার স্মৃতির সঙ্গে মেলানো জন্য দশরথ দেবের লেখা মুক্তি পরিষদের ইতিকথা এবং অঘোর দেববর্মরা ত্রিপুরা কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর বই দুটিও আমার স্মৃতিকে জাগ্রত করতে সাহায্য করেছে। তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তবু আমার এই স্মৃতিকথায় যদি ভুলভ্রান্তি থাকে এবং কেউ ধরে দেন তবে খুশিই হবো।

ত্রিপুরার এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অঘোর দেববর্মা

অঘোর দেববর্মা চলে গেলেন। ১৩ জুন ২০০৪ ইং। একটু অপ্রত্যাশিতই বলা যায়। কারণ শরীর-স্বাস্থ্য ভালই ছিলো। কোন হাইপারটেনশন ছিলো না, ডায়াবেটিস হয়নি, দৃষ্টিশক্তি ভালো, দাঁতের কোন অসুবিধে ছিল না। চুলেও তেমন পাক ধরেনি, মুখেও তেমন বয়সের ছাপ পড়েনি — এ বয়সে যা হবার কথা। বয়স তাঁর ৮৩ বৎসর হয়েছিলো। তবে ছিলো পুরোনো প্লুরিসি ও ফুসফুসের সেরে যাওয়া অসুখ, যার চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঠাকুরপুপুর ক্যান্সার হাসপাতাল এবং রাশিয়ায় যেতে হয়েছিলো। হিপ জয়েন্ট টি বি — সেটা কলকাতার পি জি হাসপাতালের চিকিৎসায় সেরে যায়। শেষে ফুসফুসের অসুখের শ্বাসকষ্টে তিনি মারা গেলেন।

তাঁর মৃত্যুতে খুব খারাপ লেগেছে। কারণ অঘোর দেববর্মা আমার সহপাঠী ছিলেন। সেই ১৯৩৯ ইং থেকে পরবর্তী ৬৫ বৎসর ধরে আমরা পরস্পরকে চিনতাম এবং কখনো খুব কাছ থেকে এবং কখনোবা বেশ দূর থেকে তাঁকে দেখেছি। পরে বৈবাহিক সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা হয়। প্রজামণ্ডল সমিতির সভাপতি যোগেশচন্দ্র দেববর্মনের জ্যেষ্ঠ কন্যা করবীর সঙ্গে আমার বিয়ের ঘটক ছিলেন অঘোর দেববর্মন। তাঁর চলে যাওয়ার ফলে এক বৈচিত্র্যময় যুগের অবসান হলো বলা যায়। সেই দশরথ, সুধন্বা, হেমন্ত আর অঘোর — যাঁদের নাম ত্রিপুরার লোকমুখে একসঙ্গে উচ্চারিত হতো — তাঁদের আর কেউ রইলেন না।

আমি ওয়াখরায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নতুন ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসে এসে উমাকান্ত একাডেমিতে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হই। তখন ১৯৩৯ সাল। বংশী ঠাকুর ছিলেন তখন নতুন ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসের সুপার। সরকারি স্টাইপেন্ড মাসে সাড়ে তিন টাকা তখনো পাইনি। বাড়ি থেকে চাল এনে কিছু টাকা দিয়ে বোর্ডিং-এ খাওয়াদাওয়া চালাচ্ছি। তিনমাস পরে পরীক্ষার ফল বেরোলে তবে স্টাইপেন্ড পাই। একটা স্টাইপেন্ডের জন্য বেশ কয়েকজন আমরা প্রতিযোগিতা ছিলাম। যার ফল সবচাইতে ভালো হতো, সে-ই স্টাইপেন্ড পেতো।

তখন সস্তা দামের সুতির জামা আর কালো কাপড়ের হাফ প্যান্ট ছিলো আমাদের পোশাক। পায়ে কোন জুতো ছিলো না। মনে পড়ে হাফ প্যান্ট, হাফ শার্ট পরা একজন গাট্রাগোট্রা ছেলে একদিন আমাদের বোর্ডিং-এ এসে কথা বলছিলো। উদ্দেশ্য, বোর্ডিং-এ

সিট চাই। এখন সে তার দুর সম্পর্কের দাদা হৃদয়রঞ্জন ঠাকুরের বাসায় থেকে পড়াশোনা করছে। আমাদের থেকে বয়সে কিছুটা বড় এবং কয়েকবছর ধরে শহরে থেকে কথাবার্তায় বেশ মাতব্বরি ভাব।

শেষ পর্যন্ত অঘোর ক্লাস সিক্সে এসে রামকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসে সিট পেলেন। পুরাতন বোর্ডিং হাউসের স্টাইপেন্ডের হার ছিলো মাত্র পাঁচ টাকা।

বলাবাহুল্য, দুই বোর্ডিং হাউসের ছাত্রদের মধ্যে নানা বিষয়ে সুস্থ প্রতিযোগিতার ভাব ছিলো। প্রতিযোগিতা ছিলো বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক সভায় এবং পরীক্ষার ফলাফলে। পুরাতন বোর্ডিং-এর সুপার ছিলেন আনন্দমোহন দাস। সেখানকার খাওয়াদাওয়া ছিলো সবসময় ভালো, কারণ, তাদের স্টাইপেন্ডের টাকা ছিলো বেশি। যুদ্ধের পর দুটো বোর্ডিং এক হয়ে যায় এবং স্টাইপেন্ডের হারও এক হয়ে যায়। নির্মল চক্রবর্তী তখন সুপার হয়ে আসেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। জার্মানির হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে নিলো। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে সে-দেশ নাকি জার্মানির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। উন্মত্ত জার্মানিকে রোখার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি স্ট্যালিন হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু জামানিকে রোখা গেলো না। সে পোল্যান্ড আক্রমণ করলো। বাধা দেওয়ার চেষ্টা হলো। একদিকে ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া পরপর দখল করে নিলো জার্মানি। ১৯৪০ সালের জুন মাসে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করলো। ব্রিটিশ, আমেরিকা এবং রাশিয়া মিত্রশক্তি হিসেবে জার্মানির বিরুদ্ধে যুগপৎ যুদ্ধ করলো।

এদিকে নতুন বোর্ডিং-এর সুপার বংশী ঠাকুর জনমঙ্গল করতেন। তিনি ও প্রভাত রায় গ্রেপ্তার হয়ে যান। দশরথদা, দ্বারিক, রবীন্দ্র দেববর্মারা বোর্ডিং সুপার আনন্দমোহন দাসের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে বোর্ডিং ছেড়ে খোয়াই চলে যান। ১৯৪৪ সালের মে মাসে জার্মানির পতন হয়। ততদিনে দুটো বোর্ডিং এক হয়ে গেছে। দশরথদা চলে যাওয়ার ফলে তখন আমরাই সিনিয়ার মোস্ট ছাত্র। আমি ও অঘোর দুজনেই ক্লাস টেনে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা তখন খুবই কাহিল। আমেরিকাকে ধরে কোনমতে নাকটা বের করে ডুবন্ত অবস্থা থেকে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। এদিকে 'কুইট ইন্ডিয়া' এবং 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' স্লোগান নিয়ে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতকে টালমাটাল করে রেখেছেন। চারদিকে একটা বিরাট পরিবর্তনের হাওয়া। একটা অনিশ্চয়তার অবস্থা বিরাজ করছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এক বিতর্ক সভায় আমরা কজন মিলে ঠিক করলাম, যদি

পিছিয়ে পড়া নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাহাড়ি সমাজের লোকদের বাঁচাতে হয়, তবে লেখাপড়া শেখানো ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সেজন্য পাহাড়ের জায়গায় জায়গায়, স্কুল-পাঠশালা খুলতে হবে। শহরে বা মফস্‌সলে যেসব জায়গায় পাঠশালা আছে, সেসব জায়গায় স্কুলে এসে পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখা সম্ভব নয়। পাঠশালা খোলা এবং পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের শিক্ষামুখী করে তোলার জন্য একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য জায়গায় জায়গায় লোক জমায়েত করে, মিটিং বা সভা করে লোকজনকে বোঝাতে হবে। সে-কাজের জন্য একটা সমিতি করা দরকার। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আমরা — আমি ও অঘোর ঠিক করলাম, যাঁরা বোর্ডিং-এ লেখাপড়া করে গেছেন একসময় এবং এখনো যাঁরা বোর্ডিং-এ আছেন, তাঁদের সকলকে নিয়ে প্রথমে একটা মিটিং করতে হবে। তখন দশরথদা অধুনা বাংলাদেশের হবিগঞ্জে বৃন্দাবন কলেজে বি.এ. পড়ছিলেন। সুধন্বাদা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জিলার শ্রীকাইল কলেজে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে এসে উমাকান্ত একাডেমিতে সাবস্টিটিউট টিচার হিসেবে কাজ করেছিলেন। হেমন্ত ছিলেন কৃষি বিভাগে চাকুরিরত। প্রথমে আমি ও অঘোর দুজনে আখাউড়া দিয়ে রেলগাড়ি করে হবিগঞ্জ গিয়ে দশরথদার মত নিলাম। ঠিক হলো, ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর হেমন্তর বাড়ি দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় মিটিং হবে।

নির্দিষ্ট দিনে মিটিং হলো এবং সেদিনই জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হলো। অঘোর দেববর্মা হয়েছিলেন সমিতির কার্যকরী সম্পাদক। দশরথদা হয়েছিলেন সহ-সভাপতি এবং সুধন্বদা হয়েছিলেন সভাপতি। এগুলো হয়েছিলো বয়সের সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে। এরপর মহারাজা বীরবিক্রমের কাছে সুধন্বাদা, অঘোর, হেমন্ত আর আমি স্কুলের জন্য দরবার করতে যাই। সেখানে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ডি এ ডব্লিউ ব্রাউন সাহেবকে মহারাজা স্কুলের মঞ্জুরি দেওয়ার জন্য বলে দেন। সেভাবে তখন পাহাড় অঞ্চলে তিনশরও বেশি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা হলো। এর ফলে সমিতির সদস্যদের অভাবিতভাবে পাহাড়ের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ হয়। জনশিক্ষা সমিতি গঠনে অঘোর দেববর্মার ভূমিকার গুরুত্ব দেখাবার জন্য এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হলো। জনশিক্ষা সমিতি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ত্রিপুরার আদিবাসী ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শেখানোর হাতিয়ার হয়েই শুধু গুরুত্ব পায়নি, পরবর্তীকালে রাজ্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে এই সমিতি বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলো। এ-বিষয়ে জনশিক্ষা আন্দোলন ও পটভূমিকার ভূমিকা বইয়ে সুধন্বাদা তার লেখা 'জাগরণের পটভূমিকা' অংশে মন্তব্য করেছিলেন — 'ইতিমধ্যে প্রয়াত কমরেড বীরেন দত্তের অনুপ্রেরণা বা উৎসাহ ছিলো কি না বলা যায় না। তবে কমরেড অঘোর দেববর্মা, কমরেড নীলমণি দেববর্মনের উদ্যোগ না থাকলে আজ এই জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হতো কি না সন্দেহ।"

এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে কমরেড বীরেন দত্তের কাছ থেকে আমরা কম্যুনিজমের পাঠ পেয়েছি সত্যি, কিন্তু এই সব স্কুল খোলার ব্যাপারে তাঁর কোন নির্দেশ ছিল না।

এই বিষয়টি সম্পূর্ণ আমাদের চিন্তাচেতনাপ্রসূত। এবং প্রাথমিকভাবে আমি ও অঘোরই এ বিষয়ে ভাবি এবং বাস্তবায়নের কাজ উৎসাহ ও নিষ্ঠা নিয়ে শুরু করি। আমরা দশরথদা ও সুধন্বাদাকে তাঁদের শিক্ষা ও কর্মস্থল থেকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি এবং হেমন্তদার কাছে আমাদের উদ্দেশ্য-বিধেয় ব্যক্ত করে, তাঁর সাহায্য চাই। তিনি সর্বোতভাবে আমাদের সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এবং শেষপর্যন্ত তাঁর কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। এরপর আমি দশরথদা ও সুধন্বাদার নির্দেশেই এল. এম. এফ. পড়তে চট্টগ্রাম চলে যাই। মূল কর্মকাণ্ড অঘোরের হাতে থাকে। নির্দেশনা এবং উপদেশ ইত্যাদি দশরথদা, সুধন্বাদার কাছ থেকে সে পেয়ে যেতো। যা হোক, আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে সুধন্বাদার মন্তব্য অবশ্যই আমাদের পক্ষে এক বিশেষ স্বীকৃতি। তবে আমাদের প্রস্তুতি বা শুরুকে বিস্তৃত কর্মকাণ্ডে এগিয়ে নিয়ে গেছেন দশরথদা, সুধন্বাদা - সহ হেমন্তদারা।

কুমারী, মধুতি, রূপশ্রী যখন শহিদ হন, সে-সময় অঘোর দেববর্মা এবং অন্যান নেতারা আত্মগোপনে ছিলেন। আত্মগোপনে থাকাকালীন ১৯৫০ সালে তিনি বিয়ে করেন। পরে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি জেলে যান। ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচনের সময় অঘোর ছিলেন জেলে। জেল থেকেই তিনি ইলেকটরেল কলেজের ৩০ জন সদস্য তখনকার রাজ্যসভার একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠান। নির্বাচিত হয়েছিলেন আরমান আলিমুন্সী, নামকরা উকিল। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের ৩০ সদস্যের আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনেও চড়িলাম কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। ১৯৬৭ সালের ৩০ সদস্যের বিধানসভা নির্বাচনেও চড়িলাম (তঃ উঃ) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে বিধায়ক হন এবং বিধানসভায় বিরোধী নেতা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে অঘোর দেববর্মা পুরোনো পার্টি সি পি আইতে থেকে যান এবং পার্টির সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন। ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি, গণমুক্তি পরিষদে বিভক্ত হয়ে সি পি এম-এ যাঁরা চলে যান, তাঁরা উপজাতি গনমুক্তি পরিষদ গঠন করেন। অঘোর গণমুক্তি পরিষদের সম্পাদক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং আমরণ তাই ছিলেন।

তিনি বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক রচনাসমৃদ্ধ বই রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো — ১. ত্রিপুরার দাঙ্গা একটি পর্যালোচনা। ২. ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর। ৩. বিগত কংগ্রেস আমলে এবং সি পি আই (এম)-এর গত ১০ বছর শাসনে ত্রিপুরার উপজাতিদের অবস্থা। ৪.

জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা। ৫. ইনার লাইনের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও চালু হচ্ছে না কেন? ৬. ত্রিপুরার উপজাতি জনজীবনে রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তন। ৭. উপজাতিদের প্রতি সি পি আই (এম) পার্টির বিশ্বাসঘাতকতার ঐতিহাসিক দলিল প্রভৃতি। ইংরেজিতেও তাঁর কয়েকটি বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে।

একজন ব্যক্তির জীবনের, বিশেষ করে অঘোর দেববর্মার মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জীবনের মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন কাজ। এখানে সে-চেষ্টা করা হয়নি। অঘোর দেববর্মার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সামান্য অংশ তুলে ধরার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে মাত্র।

অঘোর দেববর্মা প্রথমে একজন উপজাতি এবং উপজাতি সমাজের উন্নয়নের জন্য নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এজন্য তিনি উপজাতিদের কাছ থেকে নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা পেয়েছেন এবং পাবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তি, পার্টি বা দলের জীবনে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে অনেক পরিবর্জন, পাঠবর্ধন এবং পরিবর্তন ঘটে। অঘোরের জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথমে তিনি জনশিক্ষা সমিতি, তারপর গণমুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। শেষের দিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দেন। সর্বশেষে তিনি আই এন পি টি-তে যোগদান করেন। বয়সের ভার এবং কিছুটা অসুস্থতার জন্য শেষ দিকে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিরত হয়েছিলেন। অনেকের মতে আই এন পি টি-তে যোগদান অঘোরের মতো একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায়নি, যে আই এন পি টি-র সঙ্গে উগ্রপন্থীদের যোগসাজস রয়েছে বলে অনেকেরই অভিমত।

আগেই বলেছি, রাজনীতি ক্রমপরিবর্তনশীল এবং একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি নিজের অন্তরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে-কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগদান করে দেশসেবার চেষ্টা নিতেই পারেন। কেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি দল বদল করেন, তাঁকে সে -প্রশ্ন অনেকেই করেনে না। এবং সেই ব্যক্তির পক্ষে তাঁর মতামত প্রকাশ করার সুযোগও খুবই সীমিত থাকে। অঘোর কেন দল বদল করেছেন, এ-প্রশ্ন অনেকেই করেছেন, সেজন্যই এই কথাগুলো বলা হলো।

ত্রিপুরার জনসাধারণ, বিশেষ করে উপজাতি জনসমাজের উন্নতির জন্য তাঁর আন্তরিক প্রয়াস, আত্মত্যাগ, আজীবন সংগ্রাম, ভবিষ্যতের বিচারে নিশ্চয়ই প্রশংসিত হবে এবং উপযুক্ত স্বীকৃতি পাবে। প্রথম সারির উপজাতি নেতা দশরথ, সুধন্বা, হেমন্ত দেববর্মার সঙ্গে অঘোর দেববর্মাও চিরস্থায়ী আসন লাভ করে থাকবেন।

পাহাড়ি জীবনের মর্মকথা ঃ জুমচাষের কাহিনি

আমাদের গাঁয়ের নাম ঈশান ঠাকুর পাড়া, আমার মাতামহ্ প্রথমে ঈশান হাজারী ছিলেন। তারপর তিনি রাজদরবার থেকে ঠাকুর উপাধি পান। গ্রামের নাম মোহনপুর, (গোলাঘাঁটি) পো. নবশান্তিগঞ্জ বাজার, পুলিশ স্টেশন টাকারজলা, বিশালগড় মহকুমা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা। আমার বাবা ঈশান ঠাকুরের সবচেয়ে ছোটোমেয়ে, আমার মা রুক্মিণীর স্বামী হিসাবে ঘরজামাই ছিলেন। আমার মাতামহ ঈশান ঠাকুরের ছেলেরা ছিলেন চারজন — হরিনাথ, মেঘচন্দ্র, সোমেন এবং সমরেন্দ্র; মেয়েরা ছিলেন চারজন। আমার মা ছিলেন সবচাইতে ছোট, নাম রুক্মিণী।

ঈশান ঠাকুর ছিলেন জুমিয়া। জুমচাষ এক জায়গায় এক বছরের বেশি করা যায় না, কারণ মাঠের উর্বরতা বা উপরের স্বাভাবিক সার এক বছরের পর বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে নিচের দিকে বসে যায়। ঐ জায়গায় চার/পাঁচ বছর আগে আর কোনও ফসল ভালোভাবে হয় না।

কাজেই দু-তিন বছর পরে পরে নূতন জমিন জুমের জায়গার সন্ধানে সবাইকে নিয়ে পাড়া পরিবর্তন করতে হয়। এভাবে ঈশান ঠাকুর প্রথমে মধুবন কোনাবন হাতিলেটার দিক থেকে কলকলিয়া, কলকলিয়া থেকে সিপাহীজলা এবং সেখান থেকে বর্তমান ঈশান ঠাকুর পাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। সেপ্রায় দুশো আড়াইশো বছর আগেকার কথা। এখনকার বনজঙ্গল অনেক বড় তাই বেশিদিন এখানে থাকা হয়। চারদিকেই বর্তমানে বসতি হয়ে গেছে, তাই জুমের জঙ্গলের সন্ধানে অন্যদিকে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

বর্তমানে মহারাজারা জুমিয়াদের সমতলের জমিতে কৃষিকাজ বা Wet Cultivation শেখাবার জন্য চাকলা রোশনাবাদ থেকে মুসলমান কৃষকদের এনে বিনা মূল্যে ধানী জমি দিয়ে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। এদের জীরাতিয়া প্রজা বলা হয়। সেই মুসলমান চাষিদের কাছ থেকে আমার বাবা মামারা খেতে কীভাবে গোবর সার দিয়ে, জল লাঙ্গল দিয়ে বনে চাষ করা হয়, শিখে নিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁরা মণিপুর বা কাছাড় থেকে পোষমানা অনেক মহিষ কিনে এনেছিলেন। মহিষ আনা হত ট্রেনে করে। তারপর লাঙ্গল জোয়াল, পাঁক কাদা জল দিয়ে মাখামাখি করে চাষাবাদ। বহুদিন ধরে জুমিয়ারা পাঁক কাদা এড়িয়ে চলেছিলেন, কিন্তু আর কোনও উপায় না পেয়ে শেষে খেতে

দু-ফসল ফলাতে শিখে নিয়েছিলেন। একসময় চৈত্রমাসে ধুলো বাইন হত যদি না বৃষ্টি থাকে; আর একটা পেকি বাইন করা হত যদি বৃষ্টি থাকে। এই ধানচাষের সঙ্গে সঙ্গে জুমচাষও করা হতো। এর ফসলকে আমন ধান বলা হত, পরে বর্ষাকালে চারা দিয়ে যে ধান বপন করা হত, তার ফসলকে বলা হয় আমন।

কিছু বাংলা শব্দ যেমন নানা, নানি, হালাম বা সেলাম ইত্যাদি যা এখনো প্রচলিত। মুসলমানদের কাছ থেকে আমরা আরও শিখেছিলাম খেত করতে হলে জল অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বৃষ্টি সবসময় হবে না, কোনও কোনও বছর খরা চলে। তাই জলসেচের জন্য লারমা নদকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে জল খেতে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই আড়াইশো বছর আগেই, এখনো তা বর্তমান আছে। সরকারী জলসেচ এখনো পৌঁছোয়নি। পৌষমাসে শীত পড়তে শুরু করে, তখনই জুম করার জন্য জায়গা বাছাই শুরু হয়। জায়গা মানে জঙ্গল বা বন। যে-কটি পরিবার গাঁয়ে আছে, সবাই জুম করে, কেউ বেশি করে, বড় জায়গা নিয়ে কেউ ছোটো ছোটো জায়গা নিয়ে যাদের জনবল কম থাকে। যে-বন বা জঙ্গলে একটি পরিবার জুম করবে বলে ঠিক করে ঐ জায়গাটা আর কেউ জুম করার জন্য দাবি তোলে না। পৌষের শেষে বা মাঘের প্রথমে পূজা দিয়ে জায়গাটা শুদ্ধ করে নেওয়া হয় যদি কোনও ভূত-প্রেত বা অপদেবতা ঐ জঙ্গলে থাকে, তার প্রতি বিনম্র প্রণাম জানিয়ে তার বর প্রার্থনা করা হয়। ঐ জায়গায় জুম করার জন্য যেন ওঁরা এই পরিবারের প্রতি রুষ্ট না হয়। পরিবারের লোকদের যেন কোনও ক্ষতি না হয়।

ওঝা দিয়ে মন্ত্র পড়ে মোরগ বলি দিয়ে পূজা দেওয়া হয় এবং 'ঠিকানা বা দিশা' দেখা হয়, সব ঠিকঠাক আছে কি না।

পরে দিন ঠিক করে পাড়ার লোকজনকে খবর দিয়ে অনেকজন মিলে জুম কাটতে যাওয়া হয়। ১৪/১৫জন জোয়ান ছেলে টাক্কাল কুড়াল দিয়ে জুম কাটে। বড় এবং মাঝারি সাইজের গাছ বাদ দিয়ে সবকিছুই কেটে ফেলা হয়। এক পরিবারের জুম কাটা হয়ে গেলে তখন আবার অন্য একটি পরিবারের জুম কাটা হয়; এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রায় এক মাসের মধ্যে সকলের জুমই কাটা হয়ে যায়। পরিবারের লোকসংখ্যার উপর জুমের আয়তন নির্ভর করে। এই কাটা জুম ফেলে রাখা হয় দেড় থেকে দু-মাস ধরে, যাতে কাটা গাছগাছড়া শুকিয়ে যায়। তখন বৃষ্টি খুব কম থাকে, গাছগাছালি শুকিয়ে লাকড়ি হয়ে যায়। চৈত্রের শেষে জুমে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। প্রায় একই সাথে অনেক ঘরের জুম পোড়ানো হয়। লেলিহান শিখায় আগুন যেন দুনিয়া গ্রাস করে নেয়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় জুমে অবশিষ্ট সব কিছু। সকালের দিকে আগুন দিলে কোনও কোনও সময় সারাদিন ধরে জ্বলে, এমনকি রাতেও আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এরপর শুরু হয় জুম বাছাই। এটাতে সাধারণত অন্য পরিবারের লোকজন সামিল হতে হয় না। আধপোড়া বড় বড় ডাল বা

গাছ সরিয়ে এক কোনায় জমা করা হয়। তারপর জুমের ফসল বোনা শুরু হয়। বীজধান, তিল ও কার্পাসের বীজ, ভুট্টা বা মটরদানা, বিংড়া, তরমুজ, ফুটি, বাঙ্গি, শসা, ধরমবাই, মিষ্টি কুমড়ো, চালকুমড়ো, বজরা, মালিংগা বা জুমের ইক্ষু, মুই মাইলিং, বাস্তা বা বন্দা পাতা, খুনদুরুপুই — প্রভৃতির বীজ মাটি ও জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয় এবং পরে একই গর্তে এগুলো একসঙ্গে লাগানো হয়। হলুদ, আদা, কাঠ আলু আলাদাভাবে লাগানো হয়। অনেকসময় মেস্তাও লাগানো হয় একইসঙ্গে। ভাবলে অবাক হতে হয়, একটা পুরোনো টাক্কাল দিয়ে একটা মাটির গর্তে এতগুলো বীজ লাগিয়ে ফসল তোলার কায়দা কবে থেকে আমাদের মনে চালু হয়েছিল, কে জানে।

জুম চাষ প্রকৃতিনির্ভর। অনেকসময় বীজ লাগানোর আগেই বৃষ্টি হয়। জুমে বীজ লাগানোর সময় বা পরে বৃষ্টি আসে। এই বৃষ্টির জলেই ফসল ফলে। এখানে জলসেচের কোনও ব্যবস্থা করাও যায় না এবং প্রয়োজনও পড়ে না।

বীজগুলো চারাগাছ হয়ে উঠলে, আগাছা বাছাই করতে হয়। অন্ততপক্ষে দুইবার জুম বাছাই করতে হয়। পরে ধানে শিষ এলে বা পাকার সময় হলে, দিনেরবেলায় পাখির জন্য আর বানরের জন্য এবং রাতের বেলায় বুনো শুয়োরের জন্য পাহারা দিতে হয়। সেজন্য টং-ঘর তৈরি করতে হয় — সেখানে দিনরাত মানুষ থাকতে পারে। বাঁশের তৈরি একরকম যন্ত্র, লম্বা দড়ি দিয়ে বাজিয়ে বনের পাখি আর শুয়োর তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হয়। খালি টিন বাজিয়ে বা হাততালি দিয়ে, মুখ দিয়ে নানা শব্দ করেও পশুপাখি তাড়াতে হয়।

চারাগাছ বড় হয়ে ওঠে। ধানের খেতে বাতাস নেচে যায়। জুমচাষিদের মনে আনন্দ ধরে না। আরো উৎসাহ নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে, শিস দিয়ে দিয়ে তারা আগাছা বাছাই করে। যুবক-যুবতীরা যাদুকলিজা গায়। এভাবেই জুম চাষ হয়। আমাদের সংস্কৃতি এই জুম চাষকে ধরেই বাঁচে। সেজন্য ককবরকে সংস্কৃতিকে বলা হয় হুকুম। হুক থেকে হুকুমু।

জুমের ফসল, ফলফলারি তুলে পেড়ে খাওয়া যায়। কোনও মানা নেই। শুধু ধানের বেলায় একটা নিষেধ আছে। নবান্ন না করে, পরিবারের বা বংশের পূর্বপুরুষদের এই নূতন ফসলের ধান থেকে ভাত ও মদ না দিয়ে এবছরের জুমের ধান খাওয়া যাবে না। তাই যারা গরিব-গুর্বো, তারা তাড়াতাড়ি করে পিতৃপুরুষের প্রতি নম নম করে অন্নজল দিয়ে এ বছরের ধান খেতে শুরু করে। যারা অবস্থাপন্ন, তারা ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করে নবান্নের উৎসব করে। ধান যখন বাতাসে নেচে ওঠে, তারও আগে থেকে শূকর মোরগ পালন করে বড় করা হতে থাকে। তারপর চেখরা দিয়ে কাটা ধান ঘরে এনে পা দিয়ে মাড়াই করে রোদে শুকিয়ে, 'গাইল-চেকাইত' দিয়ে ধান ভাঙা

হয়। এর মধ্যেই নতুন বিন্নি চালের মদ তৈরি করে রাখা হয়। তারপর একটা ভালো দিন দেখে আত্মীয়-স্বজনদের নেমন্তন্ন করে নবান্ন উৎসব করা হয়। মদ-মাংস খাওয়া, গান গাওয়ার পাশাপাশি একটাই বিষাদের সুর থাকে, সেটা হল পিতৃপুরুষের অন্নজল দিয়ে তাঁদের স্মরণ করে ঘরের মেয়েদের বিলাপ করে কান্না। এটা অবশ্যই চিরাচরিত রীতির মধ্যে পড়ে। অনেকেসময় নিয়ম রক্ষার্থে অন্নভোগ নিবেদনের পরেই দ্বিগুণ আনন্দে সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া শুরু হয়।

নবান্নর সময় পূর্বপুরুষ বা পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের খাবার উৎসর্গ করা হয়। উঠোনের মধ্যে জায়গা লেপে পাতা বিছিয়ে প্রথমে তাঁদের জন্য আলাদাভাবে রান্না করে বড় বড় মাছের মাথা, আস্তা শুয়োরে মাথা, বাঁশের চোঙ্গায় আরক ও মাইফুন করা বিন্নি চালের মদ দেওয়া হয়। দেখা গেছে, যাঁরা বয়োবৃদ্ধ, যাঁরা নিয়মকানুন জানেন, তাঁরাই কোন্‌টার পর কোন্‌ খাদ্যবস্তু উৎসর্গ করতে হবে, বলে দিতে থাকেন। যিনি উৎসর্গ করবেন, তিনি ঘাটে গিয়ে স্নান করে ভেজা কাপড়ে ভাতের পাতা সাজিয়ে দেন। সবই বাঁ হাতে পরিবেশন করা হয়। নবান্নর প্রথম রান্না করা ভাতের স্তূপ সাজানো হয়। পরে মাছ-মাংস তরিতরকারি, মদের উপকরণ, সাজানো পান, জল ইত্যাদি আনা হয়। আমরা সবাই বিশ্বাস করতাম, আন্তরিক আহ্বান জানালে, অদৃশ্যভাবে এসে মৃতেরা উৎসর্গীকৃত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করেন।

প্রথমে প্রতীকীভাবে হাত ধুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর সাজানো ভাত ভেঙে, যেভাবে একজন জীবন্ত মানুষ খান, তেমনিভাবে ভাত-তরকারি মেখে খাওয়ানো হয়। প্রথমে তেতো, পরে মাছের বিরাট টুকরো, আস্ত শুয়োরের মাথা ভেঙে খেতে দেওয়া হয়। পরে মাংস, চাখুই ইত্যাদি দেওয়া হয়। মাঝেমধ্যে মদ ও আরক ঢেলে দেওয়া হয়। সবশেষে খাওয়ার জল দেওয়া হয়। সবকিছু দেওয়া হয়ে গেলে হাত ধোয়ার জন্য জল ঢেলে দেওয়া হয়। এর মধ্যে মৃত ব্যক্তির স্মরণে বিলাপ করে সুর তুলে মহিলারা কান্নাকাটি করতে থাকেন। খাওয়ার পর পান-তামাক দেওয়া হয়। সবশেষে আবার ফিরে যাওয়ার জন্য বলা হয় এবং অদৃশ্য আত্মার পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। খুশিমনে খেয়ে গেছেন কি না প্রশ্ন করা হয়। সব নিয়মকানুন শেষ হলে উৎসর্গকারী পেছন ফিরে, বাঁশবেতের তৈরি একটা কাঠি ভেঙে দাঁত খোচানোর জন্য দিয়ে অনুষ্ঠান করেন। তিনি আর ভাতের পাতার দিকে পেছন ফিরে তাকান না।

এই উৎসর্গীকৃত পরিত্যক্ত খাবার পরে শুয়োরের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাহাড়ি জুমিয়াদের যে-কোনও উৎসবে, ব্যসনে মদ্যপান সংস্কৃতিরই অঙ্গ। ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী সবার জন্যই মদ বরাদ্দ থাকে। নবান্নর মতো বিশেষ উৎসবে তো

বরাদ্দ আরো বেশিই থাকে। যাঁরা বয়স্ক, তাঁদেরই প্রথমে মদ দেওয়া হয়। দুরকমের মদ তৈরি হয়। একটা হল 'বীতীক' — এটা চোঙা দিয়ে চুষে খেতে হয়। অন্যটা 'আরক' — এটা পাতন প্রক্রিয়ায় তৈরি করা মদ, গ্লাসে ঢেলে খাওয়া হয়।

উৎসবে একসাথে বসে মদ খাওয়াটা একটা রেওয়াজ। সংস্কৃতির অঙ্গ। কিন্তু অনেকসময় বিপত্তি বাঁধে কেউ মাত্রাতিরিক্ত পান করে বেসামাল হয়ে পড়লে। নবান্নর উৎসব, প্রথম তোলা ধানের অন্নগ্রহণ গৌণ হয়ে যেখানে পানের হট্টগোলটাই প্রধান হয়ে ওঠে, সেটাও কী আমাদের হুকুমু বা সংস্কৃতির অঙ্গ!

জুমের ফসল নিয়ে বাণিজ্যিক কিছু করা হয় না। সবটাই গৃহস্থের নিজের পরিবারের ব্যবহারের জন্য রাখা থাকে। ধান বা জুমের ফল-ফলারিও বিক্রি করা হয় না। নিজেরা খাবে, অন্যদের খাওয়াবে। বেশি হলে ফেলে দেওয়া হবে। ধান, কার্পাস, মকাদানা, কুমড়ো বা আদা-হলুদ ছাড়া অন্য জিনিস সংরক্ষণ করা যায় না। বীজধান এবং সম্বৎসরের খাওয়ার জন্য ধান রাখা হয়। তাতে সারাবছর চলেও যায়। আসলে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাভাবনা করে জুমিয়ারা কিছু তুলে রাখে না। তাদের কাছে বর্তমান জীবনটাই সর্বস্ব। আগামীদিনের কথা তাদের চিন্তায় আসে না।

ধান নানরকমের হয়। সাধারণভাবে খাওয়ার জন্য একরকমের ধান, পিঠেপুলি বা মদ তৈরির জন্য বিন্নি — সাদা, লালচে বা কালো বিন্নি চাল।

সারাবছর ধরে জুমের ধান খাওয়া চলে। আর যাদের খেত আছে, তারা খেতের ধান অর্থকরী শস্য বা 'ক্যাশ ক্রপ' হিসেবে বিক্রি করে। গোলাভরা ধান বছরে একবার দুবার একসঙ্গে ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ব্যাপারীরা আসে ভাটি দেশ থেকে। তারা সখ্যতা পাতায়, সহজ-সরল পাহাড়িদের কাছ থেকে সস্তা দরে ধান কেনে, নৌকোয় করে জলপথে ধান নিয়ে চলে যায়। এখানে ক্রেতা এসে ঘর থেকে জিনিস কিনে নেয়। বিক্রেতার পরিশ্রম করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে হয় না। সহজ-সোজা বাণিজ্য চলে।

জুমে একবারই ফসল হয়। একবার একবছর জুমের ফসল তুললে, সেই জমি অন্তত পক্ষে চার পাঁচ বছর ফেলে রাখতে হয় আবার জুম চাষ করার জন্য। তাই পরের বছর জুমের জন্য জায়গা বদল করে অন্যখানে যেতে হয়। এজন্যই জুমকে বলা হয় 'শিফটিং কালটিভেশন'। এই জুমচাষের জন্যই পাহাড়ের অধিবাসীরা বাড়িঘর বদলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাযাবরের মতো ঘুড়ে বেড়ায় 'ভার্জিন সয়েল'-এর খোঁজে — নতুন জমিতে যেখানে ভালো ফসল হবে।

বহুকাল ধরে জুম চাষের জন্য বনজঙ্গল কেটে-পুড়িয়ে বনজ সম্পদের যে সর্বনাশ করা হয়েছে এবং হচ্ছে, তার জন্য এখন কঠিন মূল্য দিতে হচ্ছে। বনের বাঁশ, গাছ শেষ

হতে চলেছে। বৃষ্টিতে ন্যাড়া পাহাড় থেকে মাটি জলের সঙ্গে নিচে চলে যাচ্ছে। সেই মাটি সমতলের ছোটো ছোটো সব নদীনালা ভর্তি করে তার জলধারণের ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিচ্ছে। আর নদীনালার জলধারণ ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাওয়াতেই বৃষ্টির জল উপচে উঠে ব্যাপক বন্যা সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, সমতল জমিতেও বন্যার পলি জমে ফসলের আর্থিক ক্ষতি করে দিচ্ছে।

এখন আমরা সকলেই জানি, এক জায়গায় যখন জুম চাষ করা হয়, তারপরের বছর সেখানে আর চাষ করা যায় না, কারণ, ন্যাড়া মাটির উর্বরতা বৃষ্টির জলে ধুয়ে নিচের দিতে চলে যায়। শুধু উর্বরতা নয়, বন ধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয়ও প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়। বনের অভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে, আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, পাহাড়ের ভূমিক্ষয়ের ফলে নিচের নদীনালার বুক ভরাট হয়ে অল্প বৃষ্টিতেই বন্যা সৃষ্টি হয়। পলিমাটিতে ধানিজমি নষ্ট হয়।

উর্বরতার অভাবে জুমের জন্য অন্য বনের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে যাযাবরের জীবন নিতে হয় বনবাসীদের। কারণ, এছাড়া তাদের কাছে আর কোনও উপায় নেই। এটাই তাদের একমাত্র জীবিকা। জুমই তাদের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি, নাচ-গান, গল্প-গাথা, জন্ম-মৃত্যু-জীবন, প্রেম-ভালোবাসা, বিয়ে — কেরেং কথমা। এ-অভ্যাস, এ-সংস্কৃতি ছেড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অথচ জুমের জন্য আর জঙ্গল নেই। বনভূমি, টিলা নেই। তাই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এখন 'টেরেন কাল্টিভেশন'-এর রমরমা। এখন একই জায়গাতে বারেবারে জুম চাষের পদ্ধতি বেরিয়েছে। এটা ইন্দোনেশিয়ায় দেখা গেছে। এখন মিজোরামেও চালু হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরাতেও চালু হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। এর জন্য কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

একই জায়গায় দ্বিতীয়বছর জুম চাষ পদ্ধতিটা এইরকম — ওই জমিতে একফুট বাই একফুট গোলাকৃতি গর্ত খুঁড়তে হবে, যার গভীরতা হবে একফুট। একটা থেকে আরেকটা গর্তের দূরত্বও হবে একফুট। এভাবে শত শত গর্ত খুঁড়ে তাতে কিছুটা খড়, বিশেষ গাছের কিছু পাতা দিয়ে মাটিসহ গর্তে গুঁজে দিতে হবে। এক বছর পর আবার জুম চাষের আগে প্রতি গর্তে দু-এক ফোটা ভিনিগার ফেলে দিতে হবে। ভিনিগার খারাপ পোকামাকড় মেরে ফেলবে। এবার ঐ গর্তগুলোতে জুমের ফসল লাগাতে হবে, যেমনি সাধারণ জুমে লাগানো হয়। ফসল ফলবে স্বাভাবিকভাবেই। পরের বছরও একই পদ্ধতিতে একই জায়গায় জুম চাষ চলবে। নতুন বনজঙ্গল খুঁজে আর যাযাবরী জীবনযাপন করতে হবে না। অথচ জুমিয়াদের জুম-সংস্কৃতিও বজায় থাকবে। জুম চাষের জন্য বারেবারে বনজঙ্গল কেটে পুড়িয়ে বন ধ্বংসও বন্ধ হবে।

আমার ছোটোবেলা

পার্বত্য ত্রিপুরা। কাব্য করে অনেকে লেখেন পার্বতী ত্রিপুরা। রাজ্যে টিলা-টংকরই বেশি। সমতল ভূমি মাত্র ত্রিশ শতাংশ। এখানকার অধিবাসীদের লোকে বলে পাহাড়ি, কারণ তারা টিলাভূমিতে বাস করেন — বলেন সমতলভূমি এমনিতেই কম, বাসস্থান তৈরি করে জায়গা নষ্ট করে লাভ কী? তার চাইতে টিলাতে বাসস্থান তৈরি করে বাস কর। পাশের সমতল জায়গাতে চাষবাস কর। পুকুর, কুয়ো খুঁড়ে জলের, পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে। মাছ চাষেরও ব্যবস্থা হবে। এইরকম মনোবৃত্তি নিয়েই আমাদের পাড়া স্থাপিত হয়েছে। টিলাতে বাড়িঘর তৈরি হয়েছে। দক্ষিণে পুবে-পশ্চিমে — সমতল জায়গাতে চাষবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিলাভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণে দুভাগ হয়ে চলে এসেছে। দক্ষিণে যেখানে শেষ হয়েছে — সেখান দিয়ে ছোটো ছড়া (নদী) লারমা বয়ে চলেছে।

ঈশান ঠাকুর আর কালাচাঁদ ঠাকুর ছিলেন দু-ভাই। সেই টিলাতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন — এখন থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে ঈশান ঠাকুর পুবে এবং কালাচাঁদ ঠাকুর পশ্চিমে বাড়িঘর করেন। টংঘর নয়। টিনের ঘর, বাঁশের তরজার বেড়া, কাঠের দরজা জানালা দিয়ে তৈরি তাদের ঘরবাড়ি। টালির ঘরও ছিল। এবং এখনো আছে। বাড়িতে দুজনেই বেশ বড় বড় পুকুর খনন করেন।

ওঁরা কোথা থেকে এসেছেন, আমরা পরিষ্কার জানতাম না। আমার মা ছিলেন ঈশান ঠাকুরের চার মেয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো। বাবা ছিলেন ঘরজামাই। ঈশান ঠাকুরের বড় ছেলে হরিনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশ ঠাকুরের মুখে শুনেছিলাম, ওঁরা নাকি মধুবন, হাতিরলেটা, কলকলিয়া, সিপাহিজলা হয়ে জুম চাষের জন্য টিলাভূমি খুঁজে খুঁজে এখানে এসে স্থিতিলাভ করেন।

টিলার উত্তরদিকে গভীর বন ছিল এককালে। সেদিকে ঘুরে ফিরে জুম চাষ হতো। এখনো হয় আর দক্ষিণে লারমা নদী পেরিয়ে সমতল জমিতে শুধু ধান চাষ হয়।

সমতল জমি হলেও সবসময় জল থাকে না। অথচ জল ছাড়া ভেজা চাষ (Wet Cultivation) হবার নয়। তাই উজানে লারমা নদীতে একটি বেশ বড় বাঁধ দিয়ে মাটির দিকে খাল কেটে জল নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করেন। বোঝা যায় মাঠে চাষ করতে হলে জলসেচেরও প্রয়োজন আছে জানতেন। এবং তারই বন্দোবস্ত তাঁরা করে নিয়েছিলেন।

বাঁধের নিচ থেকে আবার শুরু হয়েছে লারমা নদীর যাত্রা। এবং যেভাবে লারমা চলতো এখনো তাই চলেছে এবং ভাটি লারমা হয়ে শেষে বিজয় নদীতে এসে (বিশালগড়ের কাছে) মিশেছে।

আমাদের পাড়ার নাম ছিল ঈশান ঠাকুর পাড়া। তিন কিলোমিটার দক্ষিণে বুড়ি গাং ওরফে বিজয় নদী। যার পারে গোলাঘাঁটি বাজার। যে-নদীতে আগে নৌকা চলত। দশ কি.মি. পশ্চিমে বিশালগড় বাজার। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নূতন হাভেলি বা আগরতলা। ছয়-সাত কি.মি. পুবে টাকারজলা বাজার, থানা ইত্যাদি।

এখন সেই গ্রামের নাম হয়েছে মোহনপুর। পোস্টঅফিস হয়েছে নবশান্তিগঞ্জ বাজার এবং থানা বিশালগড়ের জায়গায় হয়েছে টাকারজলা।

কাশী ঠাকুর এবং ঈশান ঠাকুর দুই ভাইয়ের পরিবার সংসার বেড়ে উঠল। কাছাকাছি লুংগা আর লারমা নদীর পারের সমতল জমি জঙ্গল কেটে চাষবাস শুরুর কালে ওরা যার যেদিকে জমি তিনি সেদিকেই আবাদ করলেন। যার দিকে বনজঙ্গল তিনি সেদিকেই জুম করলেন। জুমের ধান কার্পাস তুলা তিল তরমুজ শিম দিয়ে খাওয়ার খোরাকি হলো। আর ক্ষেতের ধান বিক্রি করে তেল তামাক সিঁদল-শুটকি, কাছিম এসব কেনা হত খাওয়ার জন্য। পরনের প্রয়োজন মেটাত জুমের কার্পাস। মাছ আমাদের কিনতে হত না। মাছ ধরেই খাওয়া যেত। মরিচ তামাক ঝিঙা শিম সরিষা ঘরের সঙ্গের বাগানেই হতো আর হতো পেয়ারা কলা কাঁঠাল জাম কামরাঙা নিজেদের লাগানো গাছে। প্রতিটি ফল ফুল অফুরন্ত ছিল। ফুলের বাগান ছিল না, ফুল ছিল বনে এবং বন থেকে কুড়িয়েই আমাদের কাজ চলে যেতো। করবী সন্ধ্যামালতি ইত্যাদিও লাগানো হত। লোকসংখ্যা ছিল কম, সবই অফুরন্ত ছিল। জীবনযাপন ছিল এক প্রবহমান খুশির ওঠাপড়া।

কাশী ঠাকুর এবং ঈশান ঠাকুর দুই ভাইয়েরই সংসার পরিবার রমরমা হয়ে উঠল। ছেলে হল মেয়ে হল, নাতি-নাতনি হলো। ক্রমে ক্রমে ঘরের এবং পরিবারের সংখ্যা বেড়ে চলল। দুই ভাই জমিজিরেত ক্ষেত জুম মহিষ পাঁঠা ছাগল মোরগ মুরগি হাঁস পুকুর বেড়ে উঠল। বসতির আগে দুই ভাইই পুকুর কাটলেন। ঈশান ঠাকুরেরটা বড় এবং কাশী ঠাকুরেরটা ছোটো। ওটা ছিল বসতির পশ্চিমে। এ-পাড়া ও-পাড়া — আমরা বলতাম আয়াং বুদুল, ওঁরা আমাদের বলতেন আয়াং বুদুল। অর্থাৎ ওদিকের বসতি এবং এদিকের বসতি। প্রতিযোগিতা ছিল নানাভাবে, দৃশ্যে অদৃশ্যে।

ক্রমে এক সময় দেখা গেল কাশী ঠাকুর পাড়ার লোকসংখ্যা কমে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে পাড়াটা খালি হয়ে গেল। একসময় দেখা গেল ছাড়াবাড়ি। ওদিকের মানুষজন কোথায় যেন চলে গেল। জমি জায়গা আমাদের দিকের লোকজনের কাছেই বিক্রি করে ফেলে গেল। এখন আয়াং বুদুল পুকুরটা আছে এবং আমাদের দিকের থেকে গিয়ে দু'একটা

ঘর বসতি স্থাপন করেছে। নইলে সব শুনশান।

সেসব দিনে পাহাড়ি ত্রিপুরীদের মধ্যে ঘর জামাই প্রথা প্রবলভাবে বলবৎ ছিল। ঈশান ঠাকুরের চারজন ছেলে হরিনাথ, হেমচন্দ্র, সৌমেন্দ্র এবং সমরেন্দ্র। মেয়েরা ছিলেন চারজন বড় মেজো সেজো এবং ছোটো ছিলেন আমার মা। দাদু কোনো ছেলেকে কোথাও ঘরজামাই পাঠাননি। অথচ মেয়েদের সবাইকে ঘরজামাই এনে বিয়ে দিয়েছেন। তাহলে বোঝা গেল ঘরজামাই প্রথা কারও ব্যতিক্রমও ছিল। যাঁরা একটু অবস্থাপন্ন তারা কনে তুলে এনে ছেলেদের বিয়ে দেন। যেমন আমার দাদু ঈশান ঠাকুর করেছিলেন।

মা ছিলেন দাদুর সবচেয়ে ছোটোমেয়ে। তাই আদরের। অপূর্ব সুন্দরী, পাছা ছাড়িয়ে চুলের ঢাল, তেমনি চোখমুখ। শুনেছি মার জন্য দাদু একজন যুবককে ঘরজামাই এনেছিলেন দু-এক মাস দেখেশুনে বিয়ে দেবেন। একদিন নাকি সেই যুবক সন্ধ্যের দিকে কাশী ঠাকুরের বাড়ির কাছে বেড়াতে যান। সন্ধ্যার সময় ঘরের সবাই একসঙ্গে ভাত খাওয়া নিয়ম। সে-যুবক সময়মতো ফিরে এসে সান্ধ্যভোজে যোগদান করতে পারেননি। দেরি হয়ে গিয়েছিল। পরেরদিন সে-যুবক বিদায় হয়ে যান।

বড় ছেলে হরিনাথ ঠাকুরকে দাদু না কি দুদিনের মধ্যে একজন যুবক খুঁজে আনতে বলেন। কারণ বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বড়মামা আতান্তরে পড়ে যান। এখন কোথায় উপযুক্ত, ভালো ছেলে খুঁজে পাবেন দুদিনের মধ্যে? বড়মামার তখন নানা পাড়ায় বা গাঁয়ে ধানের গোলা ছিল। সস্তার সময় ধান কিনে গোলাজাত করে রাখতেন। বেশি দামের সময় বিক্রি করে দিতেন। লাভ হত প্রচুর।

অনেক চিন্তা ভাবনা করে বড়মামা মনে মনে পাত্র খুঁজতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, বর্তমান বিশ্রামগঞ্জে তখন ছিল ক্যাম্পের বাজার (মহারাজা উদয়পুর যাওয়ার পথে ক্যাম্প করে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন) নিকটবর্তী গুলিরায় পাড়ায় এক যুবক আছে, যাকে সেখানকার ধানের গোলা দেখেশুনে রাখার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। সেই ছেলেটা খুব কর্মপটু এবং খুবই সততাপরায়ণ তবে গরীব। বড় মামা বিয়ের আগের দিন সেই যুবককে এনে দেন এবং দাদু তাঁর সঙ্গেই আমার মার বিয়ে দেন। বিয়ের দুদিনের মধ্যে যথারীতি গোপালের (গরুর পাল নিয়ে চলার সরুপথ) ওদিকে জায়গা পরিষ্কার করে সবাই মিলে জঙ্গল থেকে বাঁশ ছন কেটে এনে ঘর তৈরি করে নব দম্পতিকে আলাদা সংসার পেতে দেন। একটা বড় ঘর দুচালা, একটা ছোট্ট লাগোয়া রান্নাঘর এবং পাশে লাকড়িঘর। সামনে মস্ত বড় উঠান। চাল ডাল তেল নুন বাপের ঘর থেকেই আসত। আস্তে আস্তে বাবা পাড়ার লোকের সাহায্যে গোয়ালঘর হাঁস-মুরগির ঘর এবং একটা ছোট্ট গোলাঘর তৈরি করলেন। গোলাঘরের নিচে ছাগলের ঘর।

দাদু বাবা মাকে দক্ষিণ পাথরে চার কাণি জমি দিলেন। মহিষ দিলেন দুটো। চাষ

করার জন্য। টুকটাক করে মা-বাবা প্রচুর পরিশ্রমের বিনিময়ে সংসার গড়ে তুললেন। বড়দা কামদেব এবং ছোড়দা রামদেব বড় হতে লাগল। বড়দাকে দিদিমা বা নানাই কোলেপিঠে করে বড় করেছেন। মা কাজে গেলে নানাই ঘর দেখেশুনে রাখতেন।

দাদু দিদা বুড়ো হতে লাগলেন। বড়দা খুব শক্তিশালী এবং কর্মে পটু ছিলেন। মহিষ দুটোও বুড়ো হতে লাগল মা বাবাকে কাছাড় পাঠালেন মহিষ কিনে আনার জন্য। সেদিকের মহিষ মণিপুরী মহিষ। খুব ভাল পোষমানা। ঘরমুখী কাউকে কিছু বলে না। বাবা কসবা থেকে ট্রেনে চেপে কাছাড় গিয়ে একটি মহিষ কিনে আনলেন সাত টাকা দিয়ে। ট্রেনে করেই মহিষটাকে আনা হয়েছিল। সেই মহিষ এসে এক বছরের মধ্যে বাচ্চা দিল মেয়ে মহিষ। প্রতি দু'বছর পর পর মহিষ বাচ্চা দিত। এরা সবগুলো মেয়ে। এলাকার সবাই বাবা মাকে মহিষ সম্পদের জন্য হিংসা করতে লাগল। প্রথম স্ত্রী মহিষের ঘরেও মেয়ে মহিষই জন্মাত। ফলে খুব তাড়াতাড়ি গোয়াল ভরে গেল। লোকে একদিকে ধন্য ধন্য করতে লাগল, অন্যদিকে এ-জাতের মহিষ কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আনাগোনা শুরু হলো।

ছোড়দা মহিষ রাখতেন, দেখাশোনা করতেন, দুধ দোয়াতেন অবশ্য বড়দা। প্রতিদিন এক বালতি দুধ দশ নম্বর কড়াইয়ে অল্প আঁচের আগুনে বসানো থাকতো। দুধের সর উঠত মোটা হয়ে। হাত দিয়ে তুলে আমরা মাকে না বলে খেয়ে নিতাম। মা দুধের সর ভেজে ঘি বানাতেন। দাদু দিদা এবং বড় মামাদের দিতেন আমাদেরও জন্যও রাখতেন।

ছোড়দা কোন মহিষই বিক্রি করতে দেবেন না। প্রত্যেকটি মহিষকে তিনি নানা নামে ডাকতেন। একবার মেজো মামিমা একটা সাড়ে তিন বছরের মাদাম কেনার প্রস্তাব দিলেন। ছোড়দা শুনে নাওয়াখাওয়া ছেড়ে দিলেন। তিনি কিছুতেই ঐ সুন্দর মহিষটাকে বেচবেন না। অথচ ঐ মহিষটি কেনার জন্য মামিমা জেদ ধরেছেন। মামিমাকে পাড়ার সবাই ভয় পেত। কারণ তিনি নাকি ডাইনি। যে-শিশু বা বাচ্চার দিকেই তিনি একদৃষ্টে চেয়েছেন সেই বাচ্চা বা শিশু না কি মরে যাবেই। সেজন্য সবাই তাঁকে দেখলেই বাচ্চা বা শিশুদের লুকিয়ে রাখতেন। এখন তিনি যদি মহিষ না পেয়ে রেগে যান তবে আমাদের ভাইবোনের সবাইকে তিনি খেয়ে নিতে পারেন ওইরকমই ছিল আমাদের মধ্যে কুসংস্কার। কাজেই ঐ সুন্দর মহিষটি তাঁকে বেচে দিতেই হলো। আর ছোড়দা একবেলা না খেয়ে মনমরা হয়ে দিন কাটিয়ে দিলেন।

যে-জায়গায় বাড়ি তৈরি করে মা-বাবাকে আলাদা করে দিয়েছিলেন দাদু, সে-বাড়ির চারদিকে বাবা সোনালা গাছ লাগালেন। একটি বিলিতি আমগাছ লাগিয়েছিলেন সামনের গেটেই। সেই আমগাছ বড় বড় ফল দিত। অন্যান্য গাছের আমের মত টক নয় তবে পাকার আগেই মাটিতে পড়ে যেত অথবা অর্ধেক পচে মাটিতে পড়তো। সেটাই

সবাই কুড়িয়ে খেত। সেই আমগাছ এখনো আছে, তবে এখন আর সে-গাছে আম ফলে না। মা বাপের বাড়িতে একটি কামরাঙা গাছ লাগিয়েছিলেন যার ফল খুব মিষ্টি। সেটা এখনো আছে। গাঁয়ের সবাই জানে ওটা মার লাগানো গাছ। বস্তুতপক্ষে গ্রামের সকলে সোনাল গাছ লাগাত বড় হলে সেগুলোকে খুঁটি করে বাড়িঘর তৈরি করা যেত। কাঁঠালগাছ যেমন সুস্বাদু ফল দিত তেমনি দরজা জানালার কাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এখনো হয়।

বর্ষাকালে চষবাসের সময় দুটো করে মহিষ বহু লোককে ভাড়া দেওয়া হতো। সেজন্য ধান পাওয়া যেত আড়াই-তিন মন করে। বাবা নিজেও দাদুর দেওয়া চার কাণি জমিতে ধানের চাষ করতেন। সে-জমিতে দু'ফসল ধান হতো। আমন আর আউশ। কারণ গ্রামের সকলে মিলে লারমা নদীকে উজানের দিকে বাঁধ দিয়ে সে-জমিগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। জমির ধান বিক্রি করে হাতে টাকা পয়সা আসতো। আর জুমের ধান, চাল করে খাওয়া হতো। এভাবে টাকা পয়সা জমিয়ে বাবা টিনের ঘর করলেন বর্তমান জায়গা ছেড়ে পূর্বদিকের জঙ্গলে বাড়ি হলো। চৌচালা টিনের ঘর, পাকা বাঁশের বেতের 'চাম্পাকাম্পা' বেড়া আর কাঠের দরজা জানালা। পুবমুখো ঘর পূর্বে উত্তরে গভীর বন। সেখানে বিরাট গোয়ালঘর বানিয়ে মহিষ নিয়ে এলেন। কাঠের খুঁটি, উপরে কাঠের বিম। সেখানে বাটালি দিয়ে সন লেখা হলো ১৩৩৬ ত্রিং। সেই বছরেই আমার জন্ম। লোকে বলে আমার জন্মের ফলে বাবা টিনের ঘর করতে পেরেছিলেন। আমি না কি ভাগ্যবান ছেলে। অথচ মামাদের, বড় মামিদের প্রত্যেকের বাড়িতে টিনের ঘর আছে। বড় মামাদেরতো একটি টালির ঘরও আছে। মোটমাট আমাদের গ্রাম হচ্ছে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

প্রত্যেকের বাড়িতে মহিষ ছাগল পাঁঠা মোরগ হাঁস, প্রত্যেকের বাড়িতে সারা বছর খাদ্যের সংস্থান ছিল। দু'একটা বাড়ি ছিল গরিব। শত পরিশ্রম করেও তাদের অভাব মিটত না। ধার-কর্জ করে তাদের চলতে হতো।

একেবারে ছোটবেলায় আমাদের কোন কাজ করতে হতো না। আমরা ঘুরে ঘুরে দুষ্টুমি করে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের দলপতি ছিলেন বড় মামার ছোট ছেলে রমেশদা। বয়সে সবার চেয়ে বড়। ছোট মামার ছেলে তিলকদা, মাসতুতো ভাই উপেন্দ্রদার ছেলে অশ্বিনী, মাসতুতু দিদির (চন্দ্রতারা) ছেলে আতু। তখন আমাদের বন্ধুত্ব এমনই ছিল যে, একজনের গলার স্বরে আমরা আকুপাকু করে ডাকাডাকি করে সকলে মিলিত হতাম। বড় বড় উঁচু আমগাছে উঠে আম পেড়ে খাওয়া ছিল আমাদের আনন্দ। একবার একটা গাছে উঠে আম পাড়ছিলাম। ছোটো ডালে পা রাখার ফলে ডালটা ভেঙে পড়ে এবং আমিও গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যাই। নিচে আম কুড়োবার জন্য ছোটভাই বীরলাম ছিল। পড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম বীরলাম এসে টেনে তুলে বলেছিল দাদা

ওঠো। বুঝলাম ডানদিকের কাঁধে ব্যথা এবং কাঁধটা নাড়াতে পারছিলাম না। কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল, কোনমতে ঘরে পৌঁছার পরে কেউ একজন বগলে পা রেখে হ্যাঁচকা টান দিয়ে কাঁধ ঠিক করে দিয়েছিল। গাছের ডালটা বেশি উঁচু ছিল না এবং মাথায় চোট লাগেনি। বড় মামিমা শুনে বলেছিলেন ওঠো, আরো গাছে গিয়ে ওঠো। বানর সব। মোটমাট কারোর কথা আমরা শুনতাম ন। দুপুরবেলায় নাম ধরে গালিগালাজ করে মায়েরা চিৎকার করে ডেকে ডেকে আমাদের ভাত খাওয়াতেন। অনেকসময় পিটুনি খেতে হতো। কাঁঠালের সময় কাঁঠাল খেয়ে, বেলের সময় বেল খেয়ে অথবা আনারসের সময় আনারস খেয়ে আমাদের পেট ভর্তি থাকত। কাজেই খাওয়ার সময়ের হিসাব আমাদের থাকত না।

এক বাগিচায় আমগাছগুলো এত উঁচু ছিল যে গাছে কেউ উঠতে পারত না। দুপুরে শেষ বৈশাখের মাতাল হাওয়ায় পাকা আম মাটিতে পড়লেই সেই আম পাওয়া যেত। সেই আম ছিল খুব মিষ্টি কিন্তু পোকায় ভর্তি। হাত দিয়ে কিংবা দাঁত দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে আম খাওয়া হতো। কোন ছুরি- কাঁচি আমাদের ছিলো না। ধোয়ামোছার কোন বালাই ছিল না।

একবার পাড়ার সবার চোখ উঠেছে। সবার চোখ লাল। সকালে যখন ঘুম থেকে উঠি তখন চোখের দু'পাতা লেগে লেপ্টে থাকত। মা গরম জল করে এনে দিতেন সেই গরম জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ধুয়ে চোখের পাতা আলগা করা হতো। কোন ওষুধ ছিল না। সাত আট দিন পর আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যেত। সেইসময় জ্যৈষ্ঠমাস, একদিন প্রচুর ভাল ভাল আম পেড়ে মার কাছে নিয়ে এলাম। মা বললেন, এখন আম খেলে তোর চোখ সহসা সারবে না। তুই এখন আম খাবি না। সব আম উঠানে ফেলে দিলাম। মা তুলে রাখলেন। চোখ ভাল হয়ে গেলে যদি কয়েকটা আম তখনো ভাল থাকে, তোকে খেতে দেব। এখন ভাবি, এত সহজে যেভাবে আমগুলো কোচড় থেকে ফেলে দিলাম! মা বড়মামাকে বলেছিলেন — নীলমণি খুব ভাল ছেলে। মার কথা শোনে। সব আম না খেয়ে ফেলে দিয়েছিল। শুনে বড়মামা অট্টহাসি হেসেছিলেন।

বড়মামা ছিলেন দাদু ঈশান ঠাকুরের বড় ছেলে। হরিনাথ ঠাকুর ওয়াখিরায় ঠাকুরের সমসাময়িক। বেশ কয়েকবার বড় মামা আমাকে পাশের পাড়াগুলোতে শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেতে নিয়ে গিয়েছিলেন। লম্বা উঁচু পেট মোটা বড়মামা, পেছন পেছন আমি। নেমন্তন্ন খেয়েদেয়ে ফেরার সময় শুয়োরের পিঠের শিরদাঁড়ার চামড়াসুদ্ধু লম্বা কাটা সিদ্ধ মাংস সম্মিলিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দিয়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। সেঁকা কলাপাতায় মোড়া মামার ভাগের সেই মাংসটাই আমিই বয়ে নিয়ে আসতাম। গ্রামে ফিরে এলে সেটা বড়মামা আমাকেই দিয়ে দিতেন।

তখন মাছ মাংসের কোন অভাব ছিল না। বড়মামারা প্রতি বেলাতেই মাছ নয়ত মাংস খেতেন। ছেলে সতীশ ঠাকুর বন্দুক আর শিকার নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর কোন কাজই ছিল না। আজকে হরিণ, কালকে শূকর পরশু বনমোরগ, পরদিন কালেশ্বর হরিণ। দিন অফুরন্ত সেসব দিনে একেকটা হরিণ শিকার করে মেরে বনে রাখতেন তারপর বাড়ি থেকে লোকজন নিয়ে যেতেন বয়ে আনার জন্য। হরিণ এনে বাড়িতে চামড়া ছাড়িয়ে মাংসোগুলো গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বাটোয়ারা হতো। শিকারী রাখতেন মাথা, সামনের একটা পা, বাকি মাংস সব ভাগ হতো। তখন দশ পনেরটা বাড়ি ছিল। উঠানে ধাড়ির উপর কলাপাতা বিছিয়ে মাংস কেটে ভাগ হতো। সবাইকে খবর দেওয়া হতো। যার যার ভাগের মাংস যে যে বাড়ির লোকজন এসে নিয়ে যেত। শুয়োরের মাংসেও সেভাবেই ভাগ হতো। হরিণের পাগুলো আমরা ছোটো বাচ্চারা নিয়ে শুকিয়ে রেখে খেলতাম। হরিণের পায়ের হাড় ছেঁচে একদিক সুঁচালো করে মহিলারা কাপড় বোনার সময় ব্যবহার করতেন। অনেকে খোঁপার কাঁটা হিসাবেও ব্যবহার করতেন।

ঘরে ঘরে পালিত শুয়োর পাঁঠা খাসি হাঁস মোরগতো ছিলই। তার উপর বনের শিকার করা মাংস। সব মাংস খাওয়া যেত না। চুলার উপর মাচা করে সেখানে আগুনের উপর বাড়তি মাংসগুলি শুকিয়ে রাখা হতো। অন্যদিকে ছিলো বাজার থেকে কিনে আনা কিংবা নদী থেকে ধরে আনা কাছিম। প্রতি বুধবারে গোলাঘাঁটি বাজার বসতো। এখনও বসে। সেখানে কসবা থেকে আট-নয়জন লোক কাঁধে করে কাছিম এনে বাজারে বিক্রি করতো। বড় বড় বোয়াল আঁড় পোঁটা আর কালবাউসের শুটকি পাওয়া যেত। আর সিঁদল ছিল অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী।

ক্ষেতে, লারমা নদীতে বাঁধের জলে মাছ ছিল অফুরন্ত। পাহাড়ের লুঙ্গার মাথায় ভেজা জঙ্গলে মুই হামজৌক পাওয়া যেত প্রচুর।

ধান চাষের জন্য রোয়া দেওয়ার আগে লাঙ্গলে দেয়া হতো। তখন দলে দলে ছেলেমেয়েরা মাছ ধরতো। শিং মাগুর লাটি পুঁটি ট্যাংরা ছিল প্রধান। সবাই ডোলা ভর্তি করে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরত। ক্ষেতে ছোট ছোট খাড়ি করে গাছের ডালপালার নিচে মাছ জমিয়ে, জল সিঁচে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। সেটা হতো ভাদ্র আশ্বিন মাসে। বড়শিতে মাছ ধরতাম পুকুরে অথবা খালেবিলে। পুকুর ছিল বড়মামাদের। বড় মাছ মৃগেল বা রুই ধরা পড়লে সেটা বড়মামাদের বাড়িতে নিয়ে যেতাম। পরে কেটে কিছু মাছ আমাদের পাঠিয়ে দিতেন। ছোট মাছ হলে সবগুলোই পাঠিয়ে দিতেন। বর্ষার সময় বৃষ্টির পরে মৌরালা মাছ পুকুরের কিনারে এসে কিলবিল করতো। তখন কাপড় নিয়ে কিংবা 'সুদাম' দিয়ে ধরতে আমরা নিজেরাই যেতাম। পুকুরের মালিককে সেগুলো দিতে হতো না। স্নানের সময় বালুতে গর্তের মতন করে — যেখানে ঘাঘার মাছ বাসা করে, সেখানে

কেঁচো বড়শিতে গেঁথে আস্তে করে গর্তে রেখে দেয়া হতো। তখন সে ঘাঘার মাছ কেঁচো খেয়ে ধরা পড়তো।

বাঁধের জলে শোল মাছ শিকার ছিল আমাদের প্রিয় খেলা। সন্ধের দিকে ছোটো ছোট জীবন্ত লাটি মাছ বড়শিতে গেঁথে সেটাকে জলের উপর ভাসিয়ে বড়শির হাতলগুলো মাটিতে গেঁড়ে রাখা হতো। পরদিন সকালে গিয়ে দেখতাম অনেকগুলো শোল মাছ গেঁথে রয়েছে। তখনকার দিনে কারোর জিনিসে কেউ হাত দিত না। কোন চুরিচামারি ছিল না। এসময়টা ছিল আশ্বিন মাসে। তখন এখনকার মত ধান গাছ এক হাঁটুর বেশি বড় হতো না। যেখানে যেখানে জল জমা হতো সেখানে মাছ জমা হতো। সেই জল সিঁচে ফেলে প্রচুর মাছ ধরা হতো। মাগুর শিং কৈ পুঁটি ট্যাংরা গুথুম। জীয়ল মাছ ঘরে বড় পাত্রে জিইয়ে রাখা হতো আর পুঁটিসহ ছোট মাছগুলি খাওয়া হতো।

জোরখা দিয়ে মাছ ধরা ছিল সব পরিবারের কাজ। বর্ষাকালে মাঠ জলে জলময় থাকত। সেইসঙ্গে থাকত অফুরন্ত মাছ। ধান ক্ষেতে সেই মাছ এবং জল নিচের দিকে চলে যেত। প্রত্যেকটি পরিবার নিজের নিজের আল কেটে রাস্তা করে সেখানে জোরখা পেতে রাখত। এখনও রাখে। দু'বেলাই জোরখা থেকে মাছ পাওয়া যেত। আবার বড় বড় মাগুর শিং ইত্যাদি জোরখায় ঢুকে মরে থাকত। সন্ধ্যায় একবার এবং সকালে একবার মাছ তুলে আনা হতো। এতো মাছ পাওয়া যেতো যে কিছুটা খেয়ে বাকিটা শুকিয়ে রাখা হতো। বড় কথা হচ্ছে এমনিতে চোখে অন্যের জোরখায় ভর্তি মাছ দেখলে কেউ কারো মাছ নিত না। জোরখায় মাছ ধরা সারা বর্ষাকাল ধরে চলতো।

বর্ষাকালে বারাই দিয়ে মন মন মাছ ধরা হতো। এখনো কিছু কিছু হয়। তবে সেই অফুরন্ত মাছ আর হয় না। এই মাছ ধরা দু'একটা পরিবারে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন মামাতো ভাই রমেশদার ও আমাদের পরিবার। বাঁশের প্ল্যাটফরমে বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি বিরাট বারাই পাতা হতো। ছড়াকে গাছ বাঁশ ও মাটি দিয়ে বেঁধে বারাই পাতা হতো যার উপর দিয়ে ছাকনি হয়ে জলকে চলে যেতে দেওয়া হতো। ওই জলের সঙ্গে যে-মাছগুলো আসত সবই ধরা পড়ত বারাইয়ে। বারাইটার সামনের অংশ থাকে ঢালু আর পেছন দিকটা ক্রমশ উঁচু হয়ে যায়। এবং বারাই দিয়ে যে জল যেত সেই জলের তোড় থাকত প্রবল, ফলে যে মাছ বারাই এ আসত তারা আর ফিরে যেতে পারত না। তবে বড় বড় শোল কিংবা পোঁটা মাছ দু'একটা বারাই-এ পড়ার পরেও আবার উজানে বেয়ে জলে চলে যেত। বাঁশগাছ আর মাটির বাঁধের ফলে এ-মাছগুলো কিন্তু আর বারাই পেরিয়ে ভাটির দিকে যেতে পারত না। পরে আশ্বিনে যখন জল কমে যেত জমা জলে সেগুলো ধরা পড়ত। সেগুলোকে এনে গরম জল ঢেলে মোড়াধারি পেতে উঠানে বেছে শুকানো হতো। সবশেষে চুলার উপর মাচায় রেখে শেষবারের মতো শুকানো হতো। এবং সম্বৎসরের

জন্য ছোটো শুকনো কলসিতে রেখে দেয়া হতো। পরে সেগুলো টাটানো তুলায় পুড়িয়ে বা ভাজা করে অথবা গোল মরিচ দিয়ে রেঁধে সারা বছরই খাওয়া হতো। এ ধরনের বারাই ছিল শুধু আমাদের আর সতীশ ঠাকুরদের পরিবারের। কারণ লক্ষ্মীছড়া শুধু আমাদের আর তাদের জমির উপর দিয়েই বয়ে যেত।

পাড়ার সকলে মিলে বুড়ি গাঙ্গের উপর বিরাট করে বারাই দেওয়া হতো। এবং সে-বারাই-এ বড় বড় মাছ যেমন পোঁটা কালবাউস মৃগেল রুই বোয়াল এবং ভারনা কাটারি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। দিনের বেলায় নদীর জল খোলা থাকত রাত্তিরে সে-খোলা-জায়গাটা বন্ধ করে বারাই-এ মাছ ধরা হতো। প্রতি রাতে গ্রামের দুই পরিবার পাহারায় থাকত। সে-সময় বড় বড় পোঁটা কালবাউস মাছ জ্বালানো আগুনে ঝলসিয়ে আমরা খেতাম। বড় বড় মাছ বারাই-এ পড়ার পরও আবার উজিয়ে নদীতে ফিরে যেত। সে এক মজার ব্যাপার ছিল। সেগুলোকে ধরার জন্য আমরা ওত পেতে থাকতাম। রাতে বঁম বঁম শব্দ করে বারাই বসত। আর তারই মাঝে বারাই-এর স্তূপীকৃত মাছ একদিকে রেখে বড় মাছ ধরার জন্য আমরা বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতাম। প্রায় মাছই ধরে রাখা যেত না। আবার উজান বেয়ে চলে যেত।

পরের দিন সকালে ঘুম চোখে লাঙ্গায় ভরে মাছগুলো নিয়ে আসা হতো এবং উঠানে ধাড়ি পেতে বাঁটোয়ারা হতো। সকালে এসে যে-যার মাছ নিয়ে যেত। এই বুড়ি গাঙ্গে কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে আমরা খালি হাতে মাছ ধরতাম। পনের ষোলজন লোক মিলে উজান থেকে ভাটির দিকে জাল হাতে মাছ ধরে অগ্রসর হতাম। গংনা, পোঁটা, কালবাউস জলের ভেতর কাঠের গুড়ির চারদিকে ধরা পড়ত। রূপালী মাছগুলি ঝকঝক করত। ভেতর থেকে বাইম মাছ ধরা পড়ত এবং এই মাছ খেতে ছিল সুস্বাদু। বড় বাইম হাতের কনুই পর্যন্ত চিড়ে বেরিয়ে যেত ধরা যেত না। তখন ধান কাটা শেষ। কাজেই কোনাকুনি ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে চলে যেতাম। নদীর এক জায়গায় নেমে মাছ ধরতে ধরতে দু'তিন কিলোমিটারের মত গিয়ে সকলে জল থেকে উঠে আসত। এভাবে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। তবে এটা হতো আট দশদিন পর পর কারণ, পনের ষোল জনের দল না হলে নদীর জল ঘোলা হয় না। এবং পরিষ্কার জলে মাছ পালিয়ে বেড়াতে পারে। কাজেই, জমায়েত করে যেতে হতো।

এই বুড়ি গাঙ্গের বড় বড় কুর পাছড়া দিয়ে বেড় দিয়ে বুনো বিষ দিয়ে মাছ ধরা হতো। বড় দূর ভারি পাছরা দিয়ে খেরাদ করে সেখানে বুনো বিষ ছেঁচে দেয়া হতো এবং সব মাছ ভেসে উঠত। মাছ ধরে আমরা ভেজা পাছড়া বা বিছানার চাদর পরিষ্কার করে ফিরে আসতাম। বড় দল করে এই বিষই বেশি করে ছেঁচে বিশ বাইশজন লোক নদীর এক কিনারে সেঁচে পরে নদীর জলে ছেড়ে দেওয়া হতো অসংখ্য মাছ মারা যেত। যতদূর পারা

যায় নদীতে ভাটির দিকে গিয়ে মাছ ধরা হতো। নদীর কিনারের বসতির লোকজনও এসব মাছ ধরে নিয়ে যেত। গোলাঘাঁটির কাছাকাছি জায়গায় এই বিষ দিলে বিশালগড়ের পশ্চিমেও মাছ ধরা পড়তো। এটা ছিল খুবই খারাপ ব্যবস্থা কারণ যেখানে বিষ ঢালা হতো। তার নিচের দিকে নদীর যত মাছ সবই মারা যেত। এ-ব্যবস্থা সৌভাগ্যক্রমে পরে আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শীতকালেও বুড়ি গাঙ্গের মাছ ধরা হতো। নদী তখন ছিল খুব গভীর। শীতেও এ-নদীতে নৌকা চলত। পনের বিশ হাত লম্বা মুলিবাঁশ আগুনে সেঁকে গোড়ায় লোহার শলাকা ঢুকিয়ে শক্ত করে নেওয়া হতো। সেই লম্বা লম্বা চল নিয়ে আমরা বড় বড় 'কুরে' অন্ধভাবে সেই লোহার 'চল্' দিয়ে গুঁতোগুঁতি করতাম। মাছগুলো শীতে গভীর কুরে গাছের গুড়িতে নিশ্চলভাবে থাকত। সেগুলো গাঁথা পড়ত। বড় বড় মাছ। মাছ গাঁথা হলে হাতের চইলের বাঁশ থর থর করে কাঁপতো। তখন সেটা একজন ধরে রেখে অন্যজন নদীতে নেমে জলে ডুবে সে-মাছটাকে ধরে নিয়ে আসত। এইভাবে শীতকালে বুড়ি গাঙ্গে আমরা মাছ ধরতাম।

সুদিনে অর্থাৎ নদীর ধান কাটা হয়ে গেলে কলকলিয়া আর গোপীনগরের মাঠের মাঝখানে একটা বিরাট বিলে গিয়ে পলো দিয়ে আমরা প্রতি বছর মাছ ধরেছি। এই বিলটা ছিল খরা লারমা নদী। নদী উত্তরদিকে বাঁক নেওয়াতে এই বিল তৈরি হয়। এই বিশেষ দৈর্ঘ্যে ছিল প্রায় তিন কিলোমিটার এবং প্রস্থে প্রায় আশি-নব্বই ফুট। এবং গভীরতায় ছিল প্রায় পাঁচ-ছয় ফুট। প্রতি বছরই বর্ষাকালে এই বিল জলের তলায় চলে যেত এবং তাতে প্রচুর বড় বড় মাছের সমাগম হতো। এই বিলটা কারো মালিকানাধীন ছিল না। আমরা 'পলো' দিয়ে বছরে চার-পাঁচবার মাছ ধরেছি। জানি না বিলের কাছাকাছি মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা এখানে মাছ ধরতেন কি না।

পাহাড়ের পাদদেশে ভেজা জঙ্গলে নরম হলদে পাহাড়ি কচ্ছপ পাওয়া যেত প্রচুর পরিমাণে। কাছিম পাওয়া যেত দু'একটা ধান ক্ষেতের মধ্যে। আষাঢ়-শ্রাবণের ধান রোয়ার পর আইলের উপর গর্তে কাছিমের ডিম পাওয়া যেত। ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে চলে যাওয়ার সময় কাছিমের ভারে নরম ধান গাছগুলে নু'ইয়ে পড়ত। এবং সেটাকে লক্ষ্য করেএগিয়ে গেলে কোন আইলের কোণায় অল্প জল আর নরম পাঁকের মধ্যে কাছিম ধরা পড়ত। আর কাছিম ধরা হতো আট-নয় ফুট চইল দিয়ে। বুড়ি গাঙ্গের বুকে বালুর মধ্যে ঠুকে ঠুকে চার-পাঁচজন আমরা চলতাম। ঠক করে শব্দ করে কাছিমের পিঠে চইলের শলাকা গিয়ে লাগত। তখন বালু খুঁড়ে কাছিমটাকে তুলে আনতে কোন অসুবিধে ছিল না। আর কাছিম পাওয়া যেত বিক্রির জন্য আনা গোলাঘাঁটির বাজারে। এ-কাছিমগুলো মানুষের কাঁধে করে শালগড়া বা কসবা থেকে আসতো। যারা নিয়ে আসত হাটের শেষে সন্ধের দিকে আমাদের বাড়িতে এসে রান্নাবান্না করে রাত্রিযাপন করে পরের দিন ভোরে

পান্তা ভাত খেয়ে চলে যেত। আমরা ছোটরা চার-পাঁচজন মিলে সুদিনে অর্থাৎ পৌষ-মাঘ মাসে যখন ক্ষেতের ধান কাটা শেষ হয় তখন কাঁকড়া ধরতে যেতাম। হাতে ডোলা আর ভেজা এবং একটু আধটু জলা মাঠভর ঘুরে ঘুরে কাঁকড়ার গর্ত খুঁজে গর্তে হাত ঢুকিয়ে কাঁকড়া ধরে ডোলায় ভরতাম। বড় কাঁকড়া হলে আঙুলে চেপে ধরত এবং কাঁকড়ার পা তার শরীর থেকে খুলে অনেকসময় সে-পা-টাকে আঙুলমুক্ত করতে হতো। আঙুল বেয়ে রক্ত পড়ত। ছোটো ছোটো কাঁকড়া সকলে বিশ বাইশটা ডোলায় ভরে ফিরতাম।

ওইরকম ভেজা জলা জায়গাতে কুইচ্যা মাছ ধরা ছিল আর একরকম আনন্দ। কুইচ্যা মাছ থাকে মাটির নিচে এবং তার কোন গর্তের চিহ্ন থাকে না। লম্বা সরু লোহার শলাকা আন্দাজে ভেজা জলার মাঠে মাটিতে ঢুকিয়ে কুইচ্যা শিকার চলত। কুইচ্যা মাটির নিচে গেঁথে গেলে লোহার শলাকা থর থর করে কাঁপত তাতে বোঝা যেত মাছ গেঁথে গেছে। তখন নরম মাটিতে হাত ঢুকিয়ে কুইচ্যাকে ধরে শলাকাসহ উঠিয়ে আনা হতো। দু'তিনটি করে মাছ নিয়ে আমরা ফেরতাম। সকলের ধারণা ছিল কুইচ্যা মাছের রক্ত নাকি খুব উপকারী।

একবার জমাতিয়া হদা অক্রা বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া টি বি ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন। পেটের নাড়ীভুঁড়ির টি বি। কিছুই খেতে পারতেন না। পেটে-পিঠে এক হয়ে মরণোম্মুখ অবস্থা। চিকিৎসা চলছে। একদিন ওয়ার্ডে রাউন্ডে গেলে আমাকে চিঁ-চিঁ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন বাবা এসেছিলেন জিজ্ঞেস করেছেন তুমি কী খেতে চাও বলো। আমি বলেছি মরণের আগে কুইচ্যা মাছ খেতে চাই। খেতে পারব কি না। আমি বলেছি পারবেন না কেন, খুব পারবেন, যদিও পেটের টি বি। হজম হবে কি না দেখবেন। বিক্রম বাহাদুরকে বাড়ি থেকে কুইচ্যা রান্না করে এনে খাওয়ানো হলো। ততদিনে ওষুধেও কাজ শুরু করেছে। ধীরে ধীরে তিনি ভাল হয়ে উঠলেন। তখন তিনি ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে চাকুরি করতেন। পরে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের হদা অক্রা হয়েছেন। এখানে বলে রাখা ভাল কুইচ্যা খেয়ে তিনি ভাল হননি। ওষুধ খেয়ে দু'মাস হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েও তিনি নিয়মিত আঠার মাস ওষুধ খেয়েছেন। তবেই টি বি রোগ ভাল হয়েছে।

ঘরের পাশে লারমা নদীতে মাছ ধরা ছিল খুব সহজ। কুর বেঁধে জল ছেঁচে সব জায়গাতেই মাছ ধরা যেত। লারমা নদীতেও ধরা যেত। এখনো তাই হয়। লারমা নদীতে হাঁটু জলে গুথুম মাছ বালুর তিন-চার ইঞ্চি নিচে থাকে। সেই বালু সোদাম দিয়ে ছাঁকনি দিলে গুথুম মাছ পাওয়া যায়। এটা যেন পুকুরের পালিত মাছ। যে-কেউ ঘণ্টা আধ ঘন্টা নদীতে গিয়ে বালু ছেঁকে একপোয়া আধসের গুথুম মাছ ধরে নিয়ে আসতে পারে। দুপুরে স্নানের আগে নিয়ে এসে ভাজা বা রান্না করে ভাত খেতে পারে। ঘরের চালের ঝিঙা বা

ক্ষেত-বাঁধের ঢেঁড়স পেড়ে নিয়ে রান্না করে খাওয়ার মতন।

মোটমাট তখনকার সময়ে মাছের কোন অভাব ছিল না। তেমনি ছিল না মাংসের অভাব। গরু মহিষ ছাড়া খরগোস পালা এবং বুনো মোরগ পাঁঠা খাসি হরিণ, শুয়োর কালেশ্বর মাংস খাওয়া হয়। এবং পাড়ায় শিকার করে বা কোন উৎসবে এসবের প্রচুর মাংস পাওয়া যেত এবং টাটকা মাংস সবগুলো খাওয়া যেত না। শুকিয়ে তুলে রাখাও হতো। তখনকার দিনে পাড়ায় কারোর ঘরে গরু ছিল না, সকলের ঘরেই ছিল মহিষ এবং মহিষের দুধ বালতি বালতি পাওয়া যেত। সেগুলো বিক্রির কোন সুবিধে ছিল না কাজেই নিজেদেরই খেতে হতো। দই করে ছানা করে খাওয়াও জানা ছিল না। শুধু মাকে দেখতাম সর ভেজে ঘি করে রাখতেন, সে-সর আমাদের খাওয়ার পরও বাকি থাকত। সর খালি হাতে তুলে নিয়ে চুরি করে আমরা খেতাম। বড় কড়াই-এ জ্বাল দেয়ার পর গরম উনুনে কড়াই বসা থাকত সর তৈরির জন্য। ছাগলের দুধ আমরা কোনদিন খাইনি। বড় হয়ে আমরা শুনেছিলাম মহাত্মা গান্ধী না কি ছাগলের দুধ খেতেন।

বাঁশের চোঙ্গার ভেতর মহিষের জ্বাল দেওয়া ঘন দুধ রেখে ক্ষিরের মতন করে খাওয়া দক্ষিণ ত্রিপুরায় দেখেছি। আমাদের দিকে ছিল না।

আগেই বলেছি মাংসও ছিল প্রতিদিন। সতীশদা হরিণ শিকার করে বাড়িতে এনে লোকজন ডেকে নিয়ে যেতেন। বাড়িতে এনে হরিণের মাংস ভাগ-বাঁটোয়ারা হতো। বুনো শুয়োর শিকারে পাওয়া গেলেও তাই করা হতো। অনেকসময় সতীশদা এসে বললেন, এক জঙ্গলে শুয়োর এবং হরিণ দেখে এসেছেন। বনে দলগত শিকার ব্যবস্থা ছিল শূঁকর হরিণ শিকারের আর এক পদ্ধতি। ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর পেছন পেছন গিয়ে হরিণ বা শুয়োর শিকার সম্ভব না। কাজেই গাঁয়ের প্রত্যেক পরিবারের একজন করে দা টিন ইত্যাদি নিয়ে মুখে চিৎকার বা নানা শব্দ করে শিকারের জন্তুকে একদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হতো যেদিকে বন্দুক নিয়ে সতীশদা ও আর কেউ গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। আমরা সবাই হৈ-হৈ করে — মনে করা যাক পশ্চিম থেকে পুবের দিকে শিকারের জন্তুকে নিয়ে যাব। পালিয়ে যাওয়া হরিণ বা শুয়োর সতীশদা গুলি করলেন। বুকে কিংবা মাথায় গুলি না লাগলে শুয়োর মরে না। কিন্তু জখম হলে তাকে অনুসরণ করা মানে ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা। একবার রক্তের দাগ দেখে দেখে পিছু নিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ শুয়োর তেড়ে এলো আক্রমণের জন্য। সতীশদাই ছিলেন সামনে তিনি বন্দুক তোলার সময় পাননি। তবে পাশ কেটে সরে দাঁড়াতে পেরেছিলেন নইলে ছিন্নভিন্ন করে শুয়োর ফেলে দিয়ে যেত। লোকে বলে বাঘ শিকারের চাইতে বুনো শূকর শিকার বেশি বিপজ্জনক।

একদিন সন্ধের দিকে খবর এল। সতীশদা একটা বাঘ গুলি করেছেন এবং গুলি

করে গাছের উপর উঠে রয়েছেন। এখন গাঁয়ের সবাইকে টিন আগুন নিয়ে জঙ্গলে নানারকম শব্দ করে এগিয়ে যেতে হবে সতীশদাকে গাছ থেকে নামিয়ে আনার জন্য। একে রাতের অন্ধকার, তায় গুলি খাওয়া বাঘ কোথায় লুকিয়ে রয়েছে কেউ বলতে পারে না অথচ সতীশদাকেও আনতে হবে, কারণ সারারাত একা গাছের উপর থেকে ক্লান্তি ও ঘুমের ঘোরে যদি পড়ে যান মাটিতে তবে বাঘ তাকে নিশ্চিত খেয়ে ফেলবে।

তাই দশ-পনেরটা বাঁশের মধ্যে কেরোসিন ভরে আগুন জ্বালিয়ে মশাল নিয়ে গাঁয়ের প্রায় আঠার-উনিশজন জওয়ান-বুড়ো টিন বাজাতে বাজাতে বনের দিকে রওনা হলাম। সতীশদা যে-গাছে উঠেছেন সেখানে যাওয়া নিতান্ত কষ্টকর। কারণ নিচে একাটা নরম মাটির জলা জায়গা। শক্ত মাটি খুঁজে পা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া এই আধো অন্ধকারে সম্ভব নয়। কর্তাবার্তা হলো আগুন এবং চেঁচামেচির শব্দে বাঘ কি এখনো আছে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য? প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ-আলোচনার পর সতীশদাই গাছ থেকে নেমে এলেন। পরের দিন বোঝা গিয়েছিল বাঘ গুলি খেয়েও অনেকদূরে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

রাজন্যশাসিত রাজধানী আগরতলার নাগরিক জীবন ও জীবিকা

রাজ্যবাসীদের যাঁরা প্রতিপালন করেন রাজা অথবা তাঁরা যেখানে থাকেন, তাকেই রাজধানী বলা হয়। রাজারা নানা জায়গায় সুবিধামত তাঁদের রাজধানী পরিবর্তন করেন। এই পরিবর্তনের পটভূমিকা থাকে নানা ধরনের। মোগল সম্রাটরা একবার আগ্রা একবার দিল্লি এবং ব্রিটিশরা কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। ত্রিপুরার রাজারাও একবার রাঙামাটি (বর্তমান উদয়পুর) থেকে পুরাতন আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আগেও তাঁরা নানা জায়গায় রাজধানী স্থাপন করেছেন।

ত্রিপুরার রাজাদের ১৮০তম রাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য (১৮৩০-১৮৪৯) পুরাতন আগরতলা ছেড়ে নূতন আগরতলায় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হাওড়া নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত পুরান আগরতলা থেকে তিনি হাওড়ার পশ্চিম পারে বর্তমান আগরতলা রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কুকিদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন থেকে শহরবাসীদের বাঁচাবার জন্য রাজার তেমন কার্যকরী আরক্ষা বাহিনী ছিল না। পাইতু কুকি, ডারলংদের বলা হতো কুকি বা খর্কাম। অভাব পড়লেই তারা হঠাৎ উজান থেকে দলবল নিয়ে সমতলে এসে আক্রমণ করত, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। মানুষদের মারধোর করত, ধান চাল লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত, মেয়েদেরও তারা লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। সমতলের নিরীহ বাসিন্দারা প্রায় গ্রামেই তাদের লুণ্ঠনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বিরাট বিরাট গর্তযুক্ত মাটির নিচে ধান চাল লুকিয়ে রাখত। সেইসব গর্তকে বলা হতো মাইখর।

কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের আমলেই ১৮৩৬, ১৮৪৩, ১৮৪৫, ১৮৪৬, ১৮৪৭ এবং ১৮৪৯ সালে কুকিদের লুণ্ঠন ছিল। (ত্রিপুরার ইতিহাস ড. জগদীশ গণচৌধুরী। পৃঃ ১৩৫) সেইজন্যই মাইদ্রা নদী বা হাওড়ার দক্ষিণ তীর থেকে পুরাতন আগরতলা ছেড়ে হাওড়ার পশ্চিম তীরে নূতন আগরতলায় রাজধানী স্থাপন করা হয়। এখানে তিনি প্রথমে নিজের ঘর তৈরি করেন এবং পরে উজির নাজিরদের এবং ঠাকুরদের ডেকে জায়গা বণ্টন করে দেন যেখানে তাঁরা এসে বাড়িঘর তৈরি করেন। বর্তমান উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের উত্তরে তিনি নিজের থাকার ঘর তৈরি করেন। সেটা ছিল বাঁশের বেড়া, টিনের ছাউনি, নিচে মাটির মেঝে। চাকরবাকরদের থাকার জন্য কলোনি করে দেন বর্তমান কর্ণেল চৌমুহনীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণার জায়গায়। এটাকে বলা হত 'বড় ঘর'। যারা যত কাজের

লোক, ধোপা, নাপিত, তামাক পরিবেশনকারী, হুকাধারী, ছত্রধারী, রান্নাবান্নার লোকজন, হাতিঘোড়া রক্ষণাবেক্ষণ যারা করতেন তারাই সকলে এখানে থাকতেন।

রাজ্যের যত জায়গা জমি সবই রাজার মালিকানাধীন। নূতন রাজধানীর সব জায়গাজমিও রাজারই। কাজেই তিনি জায়গাজমি যাকে যেভাবে খুশি ভাগ করে দিতে পারতেন। বড়ঠাকুর সমরেন্দ্র দেববর্মনকে দিলেন এখনকার কর্নেলবাড়ি। রাজবাড়ির পূর্বদিকে বর্তমান টাউন হলের পূর্বে জায়গা পেলেন উজির। নাজির পেলেন বর্তমান ওয়েট্স এন্ড মেজারের পশ্চিমে, যেখানে একটা বিরাট পুকুর ছিল, যেটাকে সবাই নাজির পুকুরপাড় বলে। ব্রজলাল কর্তা, নন্দলাল কর্তা, আর কর্ণ কর্তাদের পূর্ব পুরুষেরা জায়গা পেলেন বর্তমান গ্যাস ও ফ্রেম-এর ভেতরের দিকে। পরে তাঁরা কর্নেল চৌমুহনী থেকে বিদুরকর্তা চৌমুহনী পর্যন্ত রাস্তার পশ্চিমদিকে জায়গা নিয়ে চলে এসেছিলেন। অনেকের মতে কর্নেল চৌমুহনীর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে উজির সাহিব জায়গা নিয়েছিলেন। এরপর দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে প্রথমে প্রফুল্ল কর্তা, গিরিধারী কর্তা, মোহন কর্তা, নন্দলাল কর্তা এবং বিদুর কর্তা জায়গা নিয়েছিলেন। এ-জায়গাগুলি বর্তমানে মালিকানা বদল হয়ে প্রচুর দালান কোঠা তৈরি হয়ে যাওয়া চেনার উপায় নেই। এ-রাস্তার পূর্বদিকে গিরিধারী এবং হেমন্ত কর্তাদের জায়গা ছিল। গিরিধারী কর্তার বংশধররা এখনো সেখানে রয়ে গেছেন। রাস্তা পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে নবদ্বীপ বাহাদুরের বাড়ি এখন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন। তার দক্ষিণে প্রবীর কর্তাদের বাড়ি ছিল। এখন জৈনদের বাড়িঘর। প্রমোদ কর্তার বাড়ি মন্ত্রীবাড়ি রোডের পশ্চিমে পুরনো আর. এম. এস.-এর দক্ষিণে। মেইন পোস্ট অফিস-এর লাগোয়া পুবে ছিল নরসিং কর্তার বাড়ি, আরও পুবে রফিক কর্তার বাড়ি। বর্তমান নেতাজী স্পোর্টস সেন্টারে ছিল নরোত্তম কর্তার বাড়ি। বর্তমান ICAT-এর টিতে ছিল অরুণ কিশোর দেববর্মন বা অরুণ কর্তরা বাড়ি। ভূপেন্দ্র কর্তার বাড়ি ছিল বর্তমান নেতাজী স্পোর্টস কমপ্লেক্স।

এখনকার পি ডব্লিউ ডি অফিসে ছিল, প্রসন্ন দাসগুপ্ত এবং পরে বিজয়কুমার সেনের কোয়ার্টার। অন্যান্য মন্ত্রী এবং জজদের কোয়ার্টার ছিল বর্তমান মন্ত্রীবাড়ি লেনে। বর্তমান কাস্টম অফিস এবং রূপসী সিনেমা হলের জায়গায় ছিল গেদু মিঞার বাড়ি। মন্ত্রী কামিনী সিং ঠাকুরের বাড়ি ছিল ধলেশ্বর। উকিল আরমান আলী মুন্সী থাকতেন বর্তমান ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনীর উত্তর-পশ্চিম কোণে এখন যেখানে রেশন কার্ড অফিস। ফায়ার ব্রিগেডের দক্ষিণে ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী হেড মাস্টারের বাড়ি ছিল। বর্তমান জজ কোর্ট কোয়ার্টারের জায়গায় ছিল প্রভাত রায়দের বাড়ি, পুরাতন কর্নেল বাড়ি বলে পরিচিত। সরকার নার্সিং হোমের উল্টোদিকের গলিতে একটি দালান বাড়িতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহরা থাকতেন। পুরাতন কর্নেল বাড়ি বলে জায়গাটি পরিচিত ছিল।

বর্তমান পূর্বাশার জায়গায় ছিল রাজারাম ঠাকুরের বাড়ি। ক্যাপিটেল গ্যাস হয়ে রামঠাকুরের মন্দির পর্যন্ত তাঁদের জায়গা বিস্তৃত ছিল। এদিকে রামনগর তিন নম্বরের পুবে বিরাট এলাকা নিয়ে ছিল পদ্মকুটির বা পদ্ম ঠাকুরের বাড়ি। নগেন্দ্র ক্যাপটেন ছিলেন পদ্ম ঠাকুরের ছেলে। রাধামোহন ঠাকুরের চার ছেলে। তাঁরা থাকতেন দৈনিক সংবাদ ভবনের দক্ষিণ দিকে লাইন করে যথাক্রমে মন্ত্রী রেবতী ঠাকুর, অনঙ্গমোহন (বর্তমান নবারুণ পেট্রোলিয়াম), ললিত ঠাকুর প্রথমে জজ পরে উকিল। হৃদয়রঞ্জন ঠাকুর ছিলেন দক্ষিণ মাথায়। এখন রিলায়েন্স এবং কিরণ মেডিক্যাল হয়েছে। বংশী ঠাকুর ছিলেন বনমালীপুরে বয়েজ বোধজং-এর উল্টো দিকে। এখনকার উইমেন্স কলেজে লালুকর্তা বা ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ি ছিল। আদিত্য কর্তার বাড়ি ছিল বর্তমান বি এড কলেজে। চন্দ্রমা কর্তার বাড়ি ছিল বর্তমান হিন্দি স্কুলের দালানে।

বড় বড় ব্যাপারী বা ব্যবসায়ী ছিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে কামান চৌমুহনী এলাকায়, কামান চৌমুহনীর দক্ষিণে পশ্চিমে এবং পুবে। তাঁরা কেউ সাহা, পাল, বসাক, চৌধুরী ইত্যাদি। মাড়োয়ারী ছিলেন না কেউ।

হান্টার সাহেবের হিসেব মতে ১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে আগরতলার লোকসংখ্যা ছিল ৮৭৫ জন (শহর আগরতলার ইতিবৃত্ত ঃ মহাদেব চক্রবর্তী, জ্যোতিষ দত্ত)। যে-সংখ্যা বেড়ে ১৯০১ সালে দাঁড়ায় ৬৪১৫ এবং ১৯১১ সালে ৬৮৩১ জন।

তখনকার দিনে লোকসংখ্যা ছিল কম। দশ হাজারও হয়নি। তাঁরা ছিলেন ধর্মভীরু, সরল সত্যবাদী। তখন চুরি ছিল না, সীমানায় বেড়া দেওয়া হতো না। কারণ বেড়ার দরকার ছিল না। উঠানের জিনিসপত্র যেখানে সেখানে পড়ে থাকত, কেউ চুরি করে নিয়ে যেত না। ঘরে জিনিসপত্র ঘরেই পড়ে থাকত। শুধুমাত্র ভয় ছিল চবা বা কুকিদের লুটপাট। চোর তখন ছিলই না বলা চলে।

ভিখারীও ছিল না। শুধু বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা এসে খুব ভোরে ঘরের উঠানে এসে হরিনাম, কৃষ্ণ শতনাম গান করে নেচে চলে যেত। তখনো গৃহস্থরা ঘুমে। পরে গৃহস্থরা সকালে ঘুম থেকে উঠে সিধা সাজিয়ে ডালায় রেখে দিতেন। আটটা-নয়টার সময় বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা এসে তা নিয়ে যেত। এই ছিল পদ্ধতি। সিধার মধ্যে থাকত চাল, ডাল, শুকনা লংকা, তৈল, লবণ, মিষ্টি কুমড়ার টুকরা বা বেগুন প্রভৃতি।

ঘরবাড়ি ছিল কাঠের খুঁটির উপর ঢেউ টিনের চাল, নিচে মাটি বা পাকা মেঝে। ভাল সেগুন কাঠের খাটপালঙ্ক ছিল ঘরে ঘরে। পায়খানা ছিল, মাচার নিচে মুখ খোলা টিন। সেখানে মল জমা হতো। হরিজনরা এসে টিনগুলোর ময়লা জমা করে রাস্তার মোড়ে মহিষ দিয়ে টানা ট্যাংকে জমা করে নিয়ে যেত। সমস্ত শহরের ময়লা মহিষের গাড়ি করে সড়ক দিয়ে নিয়ে গিয়ে বর্তমান ৮, ৯ নং রামনগর দুর্গা চৌমুহনী — যেখানটায়

বর্তমানে আধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরী হচ্ছে — সেখানে ফেলা হতো। বিরাট জলাভূমি ছিল সেটি। সেদিকে তখন কোন লোকজন ছিল না। সমগ্র রামনগরটাই ছিল ধানের খেত। তাও অনাবাদী পড়ে থাকত। যে-মহিষগুলো ময়লার গাড়ি টানত, সেগুলোকে নিয়ে হাওড়া নদীর দক্ষিণে ভট্টপুকুরের জলাভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হতো। সেখানে সারাদিন চড়ে যেত এবং দিনের শেষে মালিকরা নিয়ে আসত।

ধনী রাজা কুমার কর্তা এবং ঠাকুর লোকেরা ঘরের ভেতরে কমোড ব্যবহার করতেন। অনেকগুলো কাঠের চেয়ারে কলাই করা এলুমিনিয়াম-এর গোল বাটি ফিট করে চেয়ারে উঠে পায়খানা করা হতো। একজন নির্দিষ্ট হরিজন রেখে বাটি পরিষ্কার করে আবার চেয়ারে ফিট করে দিত। কাজের শেষে আবার সেই মহিষ-টানা ট্যাংকে ময়লা নিয়ে সেই দুর্গাচৌমুহনীর ময়লাগর্তে ফেলা হতো। তবে সাধারণ লোকেরা খালের কিনারে বসেই ভোরে ক্রিয়াকর্ম সারত।

প্রতিটি বাড়িই বিরাট জায়গা নিয়ে অবস্থান করত। ছয়-সাতটা ঘরের পর প্রচুর জায়গা পড়ে থাকত। সেখানে ফুলের বাগান, পেছনের দিকে কিচেন, গার্ডেন থাকত। যেখানে ফুল কপি বাঁধা কপি ফ্রেঞ্চ বিন মরিচ বেগুন মিষ্টি কুমড়া মগদানা প্রভৃতি চাষ হতো। চার-পাঁচটা গরুর গোয়াল এবং একটি করে পুকুর প্রতি বাড়িতে অবশ্যই থাকত। মাছের চাষ এবং গরুর দুধ সব বাড়িতেই ছিল। খাওয়ার জল, কাপড় বোনা এবং স্নানের জল এইসব পুকুর থেকেই পাওয়া যেত। বাড়িঘরের পুকুর ছাড়াও শহরের সর্বত্রই বড় বড় দিঘি এবং পুষ্করিণ ছিল। এখন প্রচুর দিঘি পুকুর মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হয়েছে। শেষের দিকে টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করা চালু হয়েছিল। লোকেরা তখন নিমের ডাল এবং কোন কোন নরম গাছের ডাল দিয়ে দাঁতন করত। বেশিরভাগ লোক তামাকের আঙরা দিয়ে আঙুল দিয়ে দাঁত মাজত। পিঁড়ির উল্টোদিকে তামাকে আঙরা বেঁটে তা দিয়ে দাঁতন হতো। তখন কোন টুথপেস্ট বা টুথব্রাশ ছিল না। লোকে সকালে চা-ও খেত না। নূতন আগরতলা অবস্থান করছে একটি জলাভূমির উপর। এই জলাভূমি এখনো ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে দেখা যায়। এসব জায়গা ছিল গভীর বন। এখানে তখনকার লোকে বনের মোরগ চিতা হরিণ শূঁকর শিকার করত বলে শুনেছি। শেয়ালত সেদিনও ছিল। বড় বড় গাছ ছিল এবং সেসব গাছের গর্তে টিয়া বাসা বেঁধে ডিম পেড়ে ছানা বার করত। ম্যালেরিয়া রোগ জ্বর গুটি বসন্ত এবং কলেরা ছিল তখনকার প্রধান অসুখ। এসব রোগে নাকি প্রচুর লোক মারা যেত।

রোগশোকের জন্য বড় বড় কবিরাজ ছিলেন। সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম এখনো লোকে জানে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন নামকরা সব। পরে এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা এলেন। সর্বপ্রথমে ডা. স্টরফ সাহেব এলেন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। ১৯০১ সালে

মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ভি এম হাসপাতাল তৈরি করেন। মিস এইজ (Miss Aises) বলে তখন একজন লেডি ডাক্তার এলেন। তারপর ডা. জে এম বোস, ডা. এস ভট্টাচার্য, ডা. নিরঞ্জন দেববর্মা, ডা. মণিময় মজুমদার, ডা. শরৎ দত্ত, ডা. এ সেনদের নাম উল্লেখযোগ্য।

বড় অসুখবিসুখ হলে রাজা, কর্তা ঠাকুর লোকেরা বাইরের ডাক্তার এনে চিকিৎসা করাতেন। তারপর কুমিল্লার দিকে রাজাদের দৃষ্টি পড়ে এবং ব্রিটিশ ভারতের চিকিৎসকদের দিয়েই তারা বেশীরভাগ সময় চিকিৎসা করাতেন।

একটু মাথা ব্যথা হলে লোকেরা জলপড়া মন্ত্র দিয়ে চিকিৎসিত হতেন। পূজা ডিম মোরগ বলি, পাঁঠা বলিও ছিল। এখনো আছে তবে শহরের বাইরে বেশি। শান্তি স্বস্ত্যয়ন, সত্যনারায়ণ, শনিপূজা, মন্দিরে পূজা তখনো ছিলো, এখনো আছে। তাবিজ কবচ নানা রং -এর নানা প্রকারের আংটি ছিল, এখনো আছে।

মোগড়া আর আখাউড়া রোড ছাড়া তখন কোন ভাল রাস্তা ছিল না বললেই হয়। মোরাম দেওয়া রাস্তা। মানুষ খালি পায়ে হাঁটতে পারত না কারণ তখন জুতোর প্রচলন ছিল না। ছিল খড়ম। শুধু মহিষ গরু এবং ঘোড়ার গাড়ি এবং রাজাদের মোটর গাড়ি ঐসব রাস্তা দিয়ে চলত। রাজবাড়ির মহিলারা মোটর গাড়ি করে এবং ঠাকুরবাড়ির মহিলারা ঘোড়ার গাড়ি করে বাজারে এবং দোকানিরা গাড়িতে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে দেখাতেন। পছন্দ হলে খদ্দেররা নিয়ে যেতেন এবং দামটা পরে একসময় বাড়িতে গিয়ে নিয়ে আসতে হতো। তখন সাইকেল রিক্সা ছিল না। ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী সকলেই জুতা ছাড়া খালি পায়ে রাস্তার কিনার দিয়ে হাঁটত। কারণ মোরাম দেওয়া রাস্তার মাছ বরাবর হাঁটা যেত না। পয়সাওয়ালারা ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি অথবা হাতি দিয়ে চলাচল করতেন। অনেকেই পাল্কি দিয়েও চলাচল করতেন।

রাতে আলো থাকত না। মোড়ে মোড়ে রাজার লোকে গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে দিত। টিমটিম করে জ্বলত। কুয়াশা এবং পোকায় ঢেকে রাখত। আলো তেমন দেখা যেত না। বেশিরভাগ লোক রাতে পাটের মশাল জ্বালিয়ে রাস্তায় চলত এবং বাঁশের চোঙায় কেরোসিন ভরে মুখে পাটের মোটা সলতে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা চলতো। টর্চলাইট তখনো এদিকে আসেনি।

কারো কারো ঘরে দু'একটা চেয়ার থাকত। বেশির ভাগ লোকদের ঘরে পিঁড়ি এবং জল চৌকিই ছিল বলা যায় সরঞ্জাম। ঘরে অতিথি এলে তাতেই বসতে দিতে হতো। পান তামাক দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন হতো। চায়ের চল তখনো হয়নি। শুনেছি ম্যাজিশিয়ান ফটোগ্রাফার প্রফুল্ল সেন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সকালে গরম গরম চা পরিবেশন করতেন বিনা পয়সায়। উদ্দেশ্য লোককে চায়ে আসক্ত করে তোলা। তার প্রচেষ্টা বিফলে

যায়নি। বর্তমানে চায়ের ব্যবহার দেখলে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

সাব পোস্ট অফিস একটি ছিল। রেডিও টেলিফোন কেউ স্বপ্নেও শোনেনি দেখেনি। তবে তক্কা করে টেলিগ্রাম পাঠানো যেত। বেশিরভাগ লোকে লিখতে পড়তে জানত না। সরকারী আদেশ, নোটিফিকেশন আদালতের রায় এবং রাজার ঘোষণা ইত্যাদি বাজারে বাজারে ঢোল পিটিয়ে লোকদের শোনানো হতো। গরু মহিষ ছাগল পাঁঠা হারিয়ে গেলে নিকটবর্তী খোঁয়াড়ে খোঁজ নিতে হতো কারণ নিখোঁজ পশুপাখি খোঁয়াড়েই রাখার নিয়ম। রাজার বিনন্দিয়ারা পাহাড়ে গেলে তাঁইতুন দিতে হতো। বিনা পারিশ্রমিকে প্রতিবছর দুর্গা বাড়িতে দুর্গাপূজা হতো, রাজা বড় বড় সর্দার চৌধুরীকে পাহাড় থেকে ডেকে এনে একসঙ্গে বসে হসম ভোজন করতেন। তখন নিমন্ত্রিতরাও রাজাকে সোনা টাকা কাপড় হরিণ ইত্যাদি নজরানা দিতো। তখন তাদের সিনেমা দেখানো হতো। তবে সিনেমায় নায়ক নায়িকারা কথা বলত না। তখন ছিল মূক ছবির যুগ। তখনকার সময় আগরতলার লোকদের আয়ের উৎস ভালোই ছিল। বেশিরভাগই রাজার অফিসে কোর্ট-কাছারিতে চাকুরি করতেন। শিক্ষকরা স্কুলে চাকুরি করতেন। কারও কারও দোকান পাট ছিল ব্যবসা করে আয় করতেন। ঠাকুর-কর্তাদের তালুক ছিল তাতে প্রচুর আয় হতো। দারোগাদেরও জালুক মুশুক ছিল। রাজবাড়ির মেয়ে এবং ছেলে সন্তানদের মাসোহারা ভাতা দেওয়া হতো।

চাল ডাল মাছ মাংস কাঁচা তরিতরকারীর বাজার ছিলো মসজিদ পট্টিতে। মসজিদপট্টির বড় দিঘির চারপাশে বাজার বসত। রাজার আমলে বুধবার ছিল ছুটির দিন। সে-বারেই বাজার বসত। বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের আমলে সে-বাজার গোলবাজারে স্থানান্তরিত হয়।

গোলাকৃতি আকারে তিনি বাজার তৈরি শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। যেমন পারেননি এম বি বি কলেজ। মসজিদপট্টিতে ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ড থেকে যায়। এখন সেটা শান্তিপাড়া নামে খ্যাত।

দুধের বাজার বসত খালের পাড়ে। মহারানী তুলসীবতী স্কুলে-দক্ষিণে। এখন সেখানে বড় বড় দোকানপাট হয়েছে। শুনেছি দুধের বিশুদ্ধতা নিয়ে পরীক্ষা হতো এবং দুধের গুণমান বেঠিক হলে টিনের পর টিন থেকে দুধ খালে ফেলে দেওয়া হতো। খালের জল না কি দুধে দুধে সাদা হয়ে যেত। কাছাকাছি জায়গা বাদ দিয়ে কসবা কুমিল্লা মোগড়া আখাউড়া থেকেও পাঁঠা খাসি মোরগ হাঁস কাছিম মাছ সিঁদল শুটকি ডিম ইত্যাদি আসত। কেউ কাঁধে করে কেউ হাতে করে কেউ মাথায় করে কেউ নৌকা করে এইসব মালপত্র নিয়ে আসত। হাওড়া নদী এবং কাটাখাল দুটো দিয়েই না কি নৌকা আসত। এখনো মালপত্র প্রচুর আসে তবে অন্য পন্থায়। এবং জিনিসপত্রের দাম এখন আকাশছোঁয়া। আগে কোন জিনিস ওজন করে বিক্রি হতো না। আস্ত মাছ আস্ত কাছিম আস্ত পাঁঠা ছাগল

মোরগ যত বড়ই হোক না কেন তাই কিনতে হতো। কেটে কেটে বিক্রি করার পদ্ধতি ছিল না। বেরমা বা সিঁদল ছিল ভাগা। লাউ চালকুমড়া গোটা গোটা বেগুন ঢেঁড়শ আশি ভাগা হিসেবে এবং কাঁচা মরিচ ধনে পাতা ইত্যাদি হাতে যা উঠে বা ভাগ হিসেবে বিক্রি হতো। ওজন করে কেউ কোন জিনিস বিক্রি করত না।

তখনকার টাকা পয়সার হিসেবও আলাদা। টাকা আনা পাই চার পাই এক পয়সা চার পইসা এক আনা চার আনাই এক সিকি দুই সিকিতে এক আধুলি দুই আধুলিতে বা ষোলআনায় এক টাকা অথবা ৬৪ পয়সায় এক টাকা। এখন ১০০ পয়সায় এক টাকা।

১৯৩৮ সনে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমি ক্লাশ থ্রিতে ভর্তি হই। তখন ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসের স্টাইপেন্ড ছিল তিন টাকা। চালের দাম ছিল মন প্রতি আড়াই টাকা। একটা পাঁঠার দাম ছিল পাঁচ সিকা। তখনো আধ পয়সা পাওয়া যেত আধা পয়সায় মুড়ি কিনে আমরা তিনজন ছাত্র খেয়ে শেষ করতে পারিনি। মুড়ির সঙ্গে বিনা পয়সায় বাতাসাও দিয়ে দিতেন দোকানি। একটা বড় কাছিমের দাম বার আনা। আমার শ্বশুর মশাই যোগেশ ঠাকুরের ১৯৪২ সালের জানুয়ারি থেকে দু'টাকা জিনিসের দাম উল্লেখ করে শেষ করছি। একজন কামলার দৈনিক হাজিরা আট আনা, আগরতলা থেকে কুমিল্লা হয়ে সোনামুড়া যাওয়ার খরচ মোটর গাড়িতে ভাড়া সাত আনা, রেলভাড়া দু'জনের জন্য তিন টাকা সাত আনা, কুলি চার আনা। সোনামুড়া থেকে উদয়পুর যাওয়ার খরচ গাড়ি ভাড়া এক টাকা দুই আনা, কুলি তিন আনা। বিস্কুট এক টাকা এক আনা। উদয়পুর থেকে দেওয়ানবাড়ি পর্যন্ত কুলি ভাড়া দশ আনা। কবুতর তিনটের দাম ছ'আনা। অম্পি বাজারে ডাল ভাত এগার আনা, নৌকা ভাড়া দুই টাকা। খেলার তাস এক প্যাকেট ছ'আনা ম্যাচ কেস এক আনা।

সদ্য প্রয়াত দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলেছেন, তার ছোটবেলায় কুড়িটা সবরি কলার দাম ছিল চার আনা। পাঁচ হালি ডিমের দাম ছিল চার আনা। সেদিনকার কথা এখনকার লোকে বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু কথাগুলো হচ্ছে সত্যি।

আমরা ২০০০ সালে ঐতিহ্য উৎসব পালন করেছি। তার সঙ্গে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের একশত বছর পূর্তি উৎসবও পালন করেছি। এই উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আগের দিনের থাকা খাওয়া জীবন-জীবিকার কথাও স্মরণ করছি। এর ওপর ভবিষ্যতের বুনিয়াদ নির্ভর করে। এর মতই আমরা ফেলে আসা দিনগুলো পেছনে ফিরে তাকিয়ে স্মরণ করি। আমরা জানি The Older changeth yeilding place to new. কিন্তু এটা সত্য যে Old is Gold.

বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুবিকাশের ধারা

শিশু মানব সমাজের ধারক ও বাহক, দেশের ভবিষ্যৎ, বর্তমানের আশা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন। আমাদের সমাজজীবনে শিশু অত্যন্ত প্রার্থিত, আদরণীয়। যে-পরিবারে শিশু নাই সে-পরিবারে সাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি থাকলেও শান্তি, আনন্দ থাকে না।

এই শিশু সম্বন্ধীয় ধ্যানধারণার এবং তার বিকাশের জন্য চেষ্টা যুগে যুগে নানাভাবে আবর্তিত এবং পরিবর্তিত হয়ে এসেছে।

প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে আমরা পাই যে, বাল্যকাল থেকে শিশুকে নানা আদর যত্নের সঙ্গে ষোড়শ বর্ষ অর্থাৎ ষোল বছর পর্যন্ত তাড়না বা শাসন করতে হবে। তার মানবিক নানা বৃত্তিকে সুন্দর সংযত করে তার সামাজিকীকরণ করতে হবে এবং তারপর আর শাসন নয়, এরপর তার সঙ্গে মিত্রব্য আচরণ করতে হবে।

বাল্যে পঠন পাঠন চরিত্র গঠনের জন্য তাকে ব্রহ্মাচর্য শ্রমে যেতে হতো। সেখানে সে বারো বছর বিদ্যাভাস করে সংসার সমাজে ফিরে আসতো।

মোটামুটি যাই হোক সন্তানকে দামী ভাবলেও তাকে সংসার সমাজের একজন ভাবা হতো। এর বেশি কিছু নয়। মধ্যযুগেও প্রাচীন যুগের কাছাকাছিই মানসিকতা ছিল।

বিদেশেও দেখি Spone the rod and Spoil the child,এই মানসিকতাই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ক্রমশই সন্তানকে সমাজে দামী জিনিস বলে ভাবা শুরু হলো। তার শারীরিক মানসিক বিকাশ, তার ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য গুণাবলী প্রকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনার দিকে সমাজের দৃষ্টি গেল। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ধারায় তার বিকাশের জন্য সমীক্ষা, বিচার, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা শুরু হল।

দেখা গেল একটি শিশুকে কোনভাবেই তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। অজ্ঞানতার দরুণ আগে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শিশুর প্রতি নানা ধরনের অবহেলা করা হতো। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে শিশুর প্রতি মনযোগ এবং শিশু সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা একেবারেই পাল্টে গেল। কি স্বাস্থ্য, কি শিক্ষা, কি সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা সব বিষয়েই মানুষ বুঝতে পারলো যে মানবজীবনে শৈশবকাল এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়, একে অবহেলা অনাদরে নষ্ট করে দিলে পরে আর সংশোধনের কোন অবকাশ থাকে না।

একটি দেশের উন্নতি প্রগতি নির্ভর করে সে-দেশের মানুষের উন্নতি প্রগতির

উপর। দেশে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেই চলে না — সঙ্গে সঙ্গে উন্নত, সুস্থ, শক্তিশালী মানব সম্পদেরও দরকার। আর সেটা নির্ভর করে দেশের শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিকাশের উপর।

শিশুর জীবনে প্রথম পাঁচটি বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ-সময়েই তার মস্তিষ্কের গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সুস্বাস্থ্যের বুনিয়াদ এ-সময়েই পত্তন করতে হয়। এ-সময়ে প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম সুষম খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে না খাওয়ালে পরবর্তীকালে শত যত্ন নিলেও এই অভাব সঠিকভাবে পূরণ হয় না। ঠিক তেমনি আচার আচরণ সদগুণ, সুঅভ্যাস ইত্যাদিও এ-বয়সে না গঠিত হলে পরবর্তীকালে তা আর পুরোপুরি সম্ভব হয় না।

এভাবে শিশু সম্পর্কিত চিন্তাধারায় ক্রম আবিষ্কারের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে শিশুর জন্য ধাপে ধাপে নানা উন্নয়ন কর্মসূচী নেয়া হচ্ছে।

ভারতীয় প্রাচীন সমাজে শিশুর সংজ্ঞা যা দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় ষোল বছর পর্যন্ত শৈশব। তার পরেই শিশু তার কিশোরত্বে, যৌবনের দিকে চলে যায়। আধুনিক যুগে শিশু বলতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মূল্যবোধে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এইসব বিচার অনুযায়ী অগ্রসর হলে ভারতের সংবিধান থেকে আমরা দেখি যে, ১৪ বছর যাদের বয়স তাদের শিশু বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার ৭ বছর থেকে ১২ বছর পর্যন্ত যাদের বয়স তাদেরই শিশু হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই বয়সী শিশুদের অপরাধমূলক কাজে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় না এবং শাস্তিও হয় না; আবার Juvenile Justic Act 1986, এর মতে ১৬ বছরের নিচে ছেলে এবং ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের শিশু বলে গণ্য করা হয়। তাদের অপরাধের শাস্তি অনেক কম। তাদের Correctional বা remand home-এ নিয়ে যাওয়া হয় সংশোধনের জন্য Family Law, Child Marriage Act, 1929 -এর মতে ছেলে ২১ বছর এবং মেয়ের বছর ১৮ না হলে তারা শৈশবের স্তরেই থেকে যায়।

ত্রিপুরায় ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে দশ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের চিলড্রেন্স ওয়ার্ডেই ভর্তি করা হয়। এর উপরের বয়সী ছেলেমেয়েদের গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়েদের শিশু সংজ্ঞায় চিহ্নিত করেছেন। যা হোক আমাদের আলোচনায় আমরা ভারতীয় সংবিধানের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ীই ০ থেকে ১০ বছরের বয়সীদেরই শিশু বলে চিহ্নিত করে আলোচনায় অগ্রসর হবো।

সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে এই বয়সী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ। এই

হিসাব অনুযায়ী ভারতের ৯৩ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৩০ কোটি হচ্ছে শিশু। এবং ৩৬ লক্ষ (বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১১৫ কোটি) ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে শিশুর সংখ্যা ১২ লক্ষ।

এই শিশুদের উন্নয়ন বা বিকাশের ধারা দেখতে হলে আমাদের বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে। কারণ সামাজিক ধ্যান-ধারণা এবং আর্থিক অবস্থার উপরই শিশুদের উন্নয়ন বা অবনমনের বিষয়টি নির্ভর করে।

দেশের বা সমাজের আর্থিক সংস্কার পরিমাপ করার সহজ কোন মাপকাঠি আমাদের হাতে নেই। পরোক্ষভাবে আমরা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা, তাদের জীবনযাত্রার মান যেমন বাঁসস্থান, খাদ্যের পুষ্টিমূল্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংগ্রহ ক্ষমতা ইত্যাদির উপরই আর্থিক অবস্থার বিচার করি। সে-সঙ্গে দেখতে হয় যার যার বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে জীবিকা অর্জনের সুযোগ সমাজে মানুষ পাচ্ছে কি না, শিশুরা তাদের মূল্যবান শৈশবকে বিনষ্ট করে রোজগারের ধান্দায় ঘুরে-ফিরে স্কুল কলেজে না পড়ে সময় কাটাচ্ছে কি না। এদের রোগ শোক হলে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার সুযোগ পায় কি না এবং প্রয়োজনে তাদের ওষুধপত্র কেনার ক্ষমতা আছে কি না।

ত্রিপুরা সরকারের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে এই রাজ্যে ৭৩ শতাংশ-এর বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে। ভারত সরকারের হিসাবমত অবশ্য এই হার শতকরা সাত শতাংশ মাত্র। শতকরা তিয়াত্তর শতাংশ ভাগ দারিদ্র্য সীমার নিচে কথার অর্থ হচ্ছে এই সংখ্যাভুক্ত প্রতিটি পরিবারের আয় মাসিক ১২৫০.০০ টাকার নিচে। গড়ে পাঁচজন সদস্যের একটি পরিবার হলে সে-পরিবারে মাথাপিছু দৈনিক আয় ৮.৫০ পয়সা মাত্র। কাজেই সঙ্গত কারণেই তাদের একবেলা পেট ভরে খাবার সঙ্গতি নেই। সংক্ষেপে এই হচ্ছে আমাদের আর্থিক অবস্থা।

এটা আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমাদের আর্থিক অবস্থা এ-ধরনের শোচনীয় হয়ে আছে। অথচ দেশে কিন্তু টাকার অভাব নেই — জনসাধারণের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ রয়েছে। গ্রাম-পাহাড়ে মানুষের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য SREP, NREP, DRDP জওহর রোজগার যোজনার মত অর্থকরী প্রকল্পগুলো সর্বত্রই চালু আছে। দেশে খাদ্যশস্যেরও বড় অভাব নেই, প্রচুর পরিমাণে ধান, চাল দেশে উৎপন্ন হচ্ছে এবং ভারত সরকার কয়েকটি দেশে চাল রপ্তানী করে থাকে, দেশের দরিদ্র মানুষ যাতে কম দামে খাদ্যশস্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস উপযুক্ত দামে কিনতে পারেন তার জন্য সরকার ভর্তুকি দিয়ে নিজস্ব বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে রেশনের দোকানে এইসব জিনিসপত্র বিক্রির ব্যবস্থা রেখেছেন। তবু মানুষের কাজ নেই, রোজগারের অভাব কম দামের আটা, চাল, চিনি, কেরোসিন, লবণ কিনতে

পারেন না। গ্রামে-পাহাড়ে শতকরা ৫০/৬০ জন লোকই তাদের রেশন কার্ড মহাজনের কাছে বন্ধক রাখেন। এরা আধপেট এবং অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে এবং কোন স্থলে না খেয়ে খাবারের সন্ধানে দেশান্তরী হন। এই হচ্ছে সংক্ষেপে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক চিত্র।

আর এই অবস্থার সূত্র ধরেই শিক্ষাক্ষেত্রেও ছেলেমেয়েরা খুব সঙ্গত কারণেই সরকারের প্রদত্ত সুযোগসুবিধা নিতে না পেরে অল্প বয়সে রোজগারে নেমে যায়। প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য সরকার ঘোষিত বা সাংবিধানিক সুযোগসুবিধা, বইপত্র, স্টাইপেন্ড কোন কিছুই সময়মতো প্রয়োজনে তারা পায় না। এসব পাওয়ার জন্য দরবার করার সুযোগ সন্ধান বা সুবিধাও তাদের বেশির ভাগেরই জানা থাকে না।

(শিক্ষার অভাবে এদের মধ্যে কুসংস্কার স্বাস্থ্যহীনতা নানা পশ্চাৎপদতা থেকে যায়। নানা তন্ত্রমন্ত্র, কবচ, জলপড়া পূজাপালি, ডাইনি সন্দেহ, ভূতপ্রেত সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা তাদের সমাজজীবনকে অন্ধকারজনিত এবং দুর্গতিপূর্ণ করে তোলে।)

এই পশ্চাৎপদ সমাজের একটি প্রধান লক্ষণই হচ্ছে সন্তানের আধিক্য। মানুষ নিজের প্রবাহ ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে অমরত্ব চায় বলে সন্তান উৎপাদনের স্পৃহা তার একটি প্রিয় প্রচেষ্টা। সেখানেও আবার কন্যা সন্তানের দ্বারা তার মনোবাসনা পূর্ণ হয় না কারণ কন্যা পরগোত্রে চলে যায়। তার পরিচয়ের ধারাবাহিকতা কন্যার দ্বারা পূর্ণ হয় না। কাজেই তার পুত্র সন্তান চাই। যেহেতু এই লিঙ্গ নির্ধারণ মানুষের হাতে নাই তাই পর পর বেশ কিছু সন্তানের জন্মের পরও পুত্র সন্তানের চেষ্টায় আমাদের সমাজে মেয়েদের বার বার গর্ভধারণ করতে হয়। এভাবে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে যা আমাদের জাতির উন্নতির উপর একটা বিশেষ প্রভাব ফেলে। কারণ স্বাধীনতার পর গত কয়েক দশকে নানাভাবে আর্থিক উন্নতি এবং জীবনধারণের মাত্রা বাড়ালেও সামগ্রিকভাবে আমরা তার ফলভোগ করতে পারছি না এবং সমাজ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে বলে উন্নতির মাত্রা আমাদের জাতীয় জীবনে সেভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। খাদ্য উৎপাদন, স্কুল কলেজ বৃদ্ধি, কল-কারখানা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান কিছুই লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। অবশ্য এ-ব্যাপারে আমাদের সীমাহীন দুর্নীতি অব্যবস্থা এবং আমাদের অযোগ্যতাও প্রধানভাবে দায়ী।

আমাদের এই আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে আর যাই হোক সমাজ জীবনে সন্তানের চাহিদা কমায়। সন্তানবতী না হলে বাজা নারীর অশিক্ষিত সমাজে তো বটেই শিক্ষিত সমাজেও কম দাম এবং অসম্মান থেকে যায়। একদিকে ধারাবাহিকতা অন্যদিকে পারলৌকিক কাজগুলি যেমন শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদি বিশেষভাবে মুখাগ্নির প্রয়োজনে পুত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ মেয়েরা শাস্ত্র মতে এসব করার অধিকারিণী নয় এবং তারা

মা-বাবার অশরীরী আত্মাকে স্বর্গের দরজায় পৌঁছে দিতে পারেন না। এ ব্যাপারে তারা বঞ্চিত। এগুলো যদিও মানুষেরই সৃষ্টি তবু যুগ যুগ সঞ্চিত ধ্যান-ধারণার মধ্যে গেঁথে আছে। সমাজ এগুলোকে সহজভাবে বিনা ভাবনায় বিন্যাস করে। প্রয়োজন মতো পুত্র সন্তান না হলে বাড়ে লোকসংখ্যা, বাড়ে স্ত্রীর দুর্গতি, দোষারোপ, লাঞ্ছনা, অথচ সাধারণ মানুষ জানে না যে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পিতার ভূমিকাই বেশি। নারীর থাকে XX ক্রমোজোম এবং পুরুষের থাকে XY ক্রমোজোম। এখন পুরুষের Y ক্রমোজোম যদি স্ত্রীর X ক্রমোজোমের সঙ্গে মিলে তবেই নারীর গর্ভে আসে পুত্র সন্তান।

সুখের কথা আজকাল শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই মানসিকতার অনেক পরিবর্তন এসেছে। তবে খুব দুঃখের এবং লজ্জার কথা যে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে শিক্ষিত লোকেরা কন্যাভ্রূণ হত্যা করে চলেছেন। খবরে প্রকাশ ১৯৪৮ সালে একমাত্র বোম্বাই শহয়ে স্মামিনোসিনথেসিস পরীক্ষা করে চল্লিশ হাজার কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে। এর পেছনে সব চাইতে বড় কারণ হচ্ছে পণ প্রথা। এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় ৫০০ টাকা খরচ করে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাঁচান।

এই ধরনের হীনমনের চিন্তাধারা এবং বিজ্ঞাপন সামাজিক অবক্ষয় এবং অবনতির চিত্র তুলে ধরে তবু আমরা বিশ্বাস করি যে এসব কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে শিক্ষাই একমাত্র উপায়। একমাত্র প্রকৃত শিক্ষার আলোই আমাদের এসবের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে।

কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রের চিত্রটা কী রকম? আমাদের রাজ্যের সাক্ষরতার হার সর্বভারতীয় হারের তুলনায় বেশিই। সার্বিক সাক্ষরতার হার ৬০.৭ শতাংশ, এর মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৪৯ শতাংশ। শহরে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৮৩ শতাংশ। গ্রামে কম ৫৬ শতাংশ। তার মানে নিরক্ষরতার হার ৪০ শতাংশ। কাজেই একশো জনের মধ্যে ৪৪ জনই যেখানে নিরক্ষর সেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক বা সংস্কার মুক্ত ধ্যান-ধারণা কতটা কার্যকর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ-বিষয়ে আগেই বলেছি খুব স্বাভাবিক কারণেই ভুত প্রেত, ডাইন, ওঝা, জলপড়া, পশুপাখি বলি চলে সেখানকার জীবনে। হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিতে না গিয়ে চলে ওঝার চিকিৎসা বা গ্রাম্য হাতুড়ের চিকিৎসা। কারো নজরে লেগে শিশু শুকিয়ে মরে যায়। কোন প্রেতের ভয়ে সদ্য প্রসূতির সূতিকা রোগ দেখা দেয় বা ডাইনির নজরের ফলে সদ্য প্রসূতি মায়ের স্তনে ফোঁড়া হয়।

এগুলোর বৈজ্ঞানিক কারণ কেউ জানেও না কারণ খুঁজে দেখবার মত শিক্ষা বা সুযোগ কোনটাই নেই। যুগ যুগ ধরে যে, অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার আর বুজরুকি চলছে তার বিরুদ্ধে সবাইকে লড়তে হবে, সবাইকে লড়াইয়ে সামিল করতে হবে।

উল্লিখিত আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমাদের শিশুরা কীভাবে

কোন পথে বিকশিত হচ্ছে না সে-আলোচনা করা যাক। প্রসঙ্গত, আমাদের দেশে দিনে প্রায় ৪০, ০০০ শিশু জন্ম নিচ্ছে। বছরে আমাদের লোকসংখ্যা বাড়ছে ১ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি যা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মোট লোকসংখ্যার সমান। পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ১৬ জনই হচ্ছি আমরা ভারতবাসী। অথচ ভারতের ভূখণ্ডের পরিমাণ হচ্ছে বিশ্ব ভূখণ্ডের আড়াই ভাগ মাত্র।

বছরে ১ কোটি ৪০ লক্ষ শিশুর মধ্যে ১ কোটি ১৯ লক্ষই জন্ম নেয় কম ওজন নিয়ে। এদের ওজন আড়াই কেজি থেকে সাড়ে তিন কেজি থেকে কম। এর জন্য দায়ী মায়ের হীনস্বাস্থ্য। এইসব সন্তান প্রজননক্ষম মহিলাদের মধ্যে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ শতাংশই নিদারুণ রক্তাল্পতায় ভোগেন সঙ্গে সঙ্গে তারাও কম ওজনের এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। সন্তান পেটে আসার তিন মাসের মধ্যে অর্ধেকের বেশি গর্ভবতী মহিলারা উপযুক্ত খাদ্যাভাবের জন্য রক্তাল্পতা বা অপুষ্টিতে ভোগেন। মায়ের রক্তাল্পতা, অপুষ্টি, কম ওজন, বিপজ্জনকভাবে অশিক্ষিত প্রশিক্ষণহীন ধাইয়ের হাতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জন্ম নেয়ার ফলে ভারতে এক হাজার শিশুর জন্মের মধ্যে ৭৪ জনই মারা যায় (যুগান্তর ৩১/৭/৯৫) । এদের মধ্যে ২০ লক্ষ মারা যায় পাঁচ বছরের মধ্যে। এই লক্ষ লক্ষ শিশুর মৃত্যু যে দেশের এবং সমাজের কতবড় ক্ষতি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ পরিবারে একটি শিশুর মৃত্যু হলে মা, বাবা, ভাই-বোনের মধ্যে মানসিক বিপর্যয় নেমে আসে। অর্থের কথা বাদ দিলেও মানসিক ক্ষতির কোন পরিমাপ করা যায় না। এইসব শিশু মৃত্যুর কারণগুলো হচ্ছে এরকম মোট মৃত্যুর ৭৯ % শিশু মারা যায় RTI নিউমোনিয়াতে (ICCW Journal, July 94), ৪৬.৮% মারা যায় আন্ত্রিকে, ২৯.৮% মারা যায় রক্তাল্পতার জন্য, ২৩.৯% মারা যায় টাইফয়েড-ম্যালেরিয়া ইত্যাদিতে (Deptt. of women and child. Dec. 1993)। অপরিশুদ্ধ পানীয় জল,অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপুষ্টি এ সকল মৃত্যুর জন্য দায়ী। ভারতে যে ২৫ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে তার ৮১.৪% হচ্ছে পাঁচ বছর বয়সের শিশুরা। লৌহঘটিত রক্তাল্পতায় ভোগে ৫৬%, ৪০ লক্ষ প্রাক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আয়োডিনের কমতিতেভোগে, ২২ লক্ষ শিশু জড়বুদ্ধি আর ৬৬ লক্ষ শিশু একদম বোকা হয়ে যায়। ৯০,০০০ শিশু মৃত্যুর অবস্থায় জাত হয় আয়োডিনের অপ্রতুলতার জন্য। ভিটামিন 'A'-র অভাবে বছরে ৬০,০০০ অন্ধ হয়ে যায়। যার সঙ্গে যোগ হয় প্রোটিনের অভাবজনিত অপুষ্টি। এগুলো গেল সব নেতিবাচক দিক। ইতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে শিশুবিকাশের জন্য ভারত, রাজ্য সরকার এবং তার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডগুলি। নভেম্বর ১৯৮৯ সালে UN General Assembly শিশুদের অধিকার নিয়ে যে-কনভেনশন করে এবং ঘোষণা দেয় তাকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও রেডফোর্টের মঞ্চ থেকে দেশ

থেকে শিশুশ্রম দূর করার জন্য একটি ন্যাশানাল অথরিটি গঠনের ঘোষণা দেন — শিশুদের নানাবিধ উন্নতির জন্য কার্যসূচী নেয়ার কথা বলেন। তবে একথাও সত্য, যে অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, এসব কর্মসূচী তৈরি করা, আইন তৈরি করা এবং এ-ধরনের নানা কাজে হাত দেয়ার কথা দিয়ে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত হয়নি বা শিশুদের অবস্থারও উন্নতি হয়নি। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশজুড়ে যে কত প্রকল্প, কতশত কার্যসূচী কতদিকে, শত শত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের পাশাপাশি কাজ করছেন তাঁর হিসাবে দেয়া সহজ নয়। স্বাস্থ্যসূচীর নানা কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংস্থা WHO-র ঘোষণা অনুযায়ী সরকার অনুসৃত ঘোষাণা — ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য। এই সময়ের মধ্যে সকলের কাছে ন্যূনতম স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান দিনরাত কাজ করে চলেছেন। এসব প্রকল্পের মধ্যে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল প্রকল্প রয়েছে। উদ্দেশ্য, বর্তমানের শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ৭৪ থেকে কমিয়ে ৬০-এ নামিয়ে আনা। আমরা যদি পরপর কয়েকটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তুলনা করে দেখি, তবে দেখবো এই সব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে সাধারণ মৃত্যুর হার কমেছে। যেমন ১৯২১ সালে ৩৬ থেকে কমে ১৯৮১ সালে ১৫ এবং১৯৯১ সালে ৯-এ নেমে এসেছে। তেমনিভাবে গড় আয়ু বেড়েছে। ১৯০১ সালে এ-হার ছিল ২৪ বৎসর, ৮১ সালে হয়েছে ৫২ বৎসর এবং ৯১ সালে হয়েছে ৬০ বৎসর। প্রতি হাজার জাত শিশু মৃত্যুর হার ছিল ১৯৯২ সালে ২২০, ১৯৮১ সালে ১২০, ১৯৯১ সালে ১০৫।

এই হারকে ৬০-এ নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে তেমনি মাতৃমৃত্যুর হার বর্তমানে ৪%, এটাকে ১% বা শূন্যে নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তেমনিভাবে, যেহেতু মাথা পিছু আয় বাড়ছে সেজন্য জীবনযাত্রার মান বাড়ছে। ১৯৫১ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ১২২৭ টাকা। ১৯৯৪-৯৫-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫০০ টাকা। খাদ্য উৎপাদনও বেড়েছে ১৯৫১-তে ছিল ৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ১৯৯২-৯৩ তা বেড়ে হয়েছে ১০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ২৩৪%, গমের ক্ষেত্রে ৮০০%। এই বৃদ্ধির হার প্রায় অভাবনীয়। মাথাপিছু খাদ্যের Consumption-ও বেড়েছে। ১৯৫৬ সালে ছিল ৪৩১ গ্রাম, এখন তা বেড়ে ১৯৯৩ সালে ৪৭৫ গ্রাম হয়েছে। সমগ্র ভারতে ১৯৯৩ সালে দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৬০%। ১৯৯০-৯১-এ তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫%। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৯৫১ সালে ৭০%, এখন সেটা কমে হয়েছে ২৯%। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এটাকে ২০০০ সালের মধ্যে কমিয়ে ২১-এ নামিয়ে আনা। কেরালা রাজ্য ইতিমধ্যে এই হার কমিয়ে ১৯-এ নিয়ে এসেছে। সেজন্য মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে গর্ভবতী মাকে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে,

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে তাকে সকল রকমের প্রতিষেধক টিকা ইন্‌জেকশন দেয়া হবে (টিটেনাস, Toxid ইন্‌জেকশন দেবেন)। রক্তাল্পতা না হওয়ার জন্য বিনামূল্যে আয়রন ট্যাবলেট দেবেন। একক্লামসিয়া যাতে না হয় তার জন্য চেষ্টা নেবেন। সুস্থ নিরোগ সন্তান প্রসবের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। যাতে সন্তান সুস্থ; ভাল ওজনের হয় তা দেখবেন। কীভাবে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করাবেন এবং কতদিন পর আবার সন্তান ধারণ করবেন তাও দেখবেন, সে-সম্বন্ধে উপদেশও দেবেন। উপদেশ দেবেন কীভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে শিক্ষিত ধাইয়ের হাতে শিশুর জন্ম হয় এবং মা কী খাওয়া দাওয়া করবেন। এই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মা যেন অবশ্যই শিশু জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরেই স্তন্যদানের চেষ্টা করেন। একথা আজ সবাই জানেন যে, প্রথমদিকে মাতৃস্তন্যে যে-জলীয় পদার্থ থাকে তাকে 'কলোস্ট্রাম' বলে তা শিশুকে নিরোগ; রোগ প্রতিরোধক্ষম করতে সাহায্য করে। শিশুকে ছ'মাস পর্যন্ত সম্ভব হলে অবশ্যই মাতৃদুগ্ধে এবং তরল খাদ্যে রাখা উচিৎ, এরপর তাকে কিছু শক্ত খাবার দেয়া যেতে পারে। ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, পোলিও, হামের মত রোগ যাতে এক-তৃতীয়াংশ শিশুর মৃত্যু ঘটে সেটা কিন্তু সঠিক সময়ে ইন্‌জেকশান, টিকা প্রকল্পে রয়েছে। এ-ব্যাপারে আমাদের দেখতে হবে যে, যাতে ১০০ জনের মধ্যে ১০০ জন শিশুই এ-প্রকল্পের আওতায় আসে। WHO চেষ্টা করছে পৃথিবীকে পোলিও মুক্ত করতে, ভারতেও এ-ঘোষণায় যোগদান করে চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমাদের চেষ্টা করতে হবে এ-বিষয়ে পূর্ণ সাফল্যের জন্য। গুটি বসন্তের মত পোলিও নির্মূল হবে আশা করা যায়। শিশু-মৃত্যুর আরেকটি বড় কারণ নিউমোনিয়া। যাতে শতকরা ৭৯ জন শিশু মারা যায়। তাকে রুখতে আমাদের পরিবেশের দিকে নজর দিতে হবে। ধূলা, ধোঁয়া, ভিজে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ থেকে শিশুকে মুক্ত রাখতে হবে। সর্দি জ্বর ইত্যাদির লক্ষণের সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ-বিষয়ে শিক্ষিত পিতামাতা সঠিক চেষ্টা নিতে পারেন। আরেকটি বড় ও মারাত্মক ব্যাধি আন্ত্রিক। এতে ৪৬% শিশু মারা যায়। এ-থেকে বাঁচার বড় উপায় বিশুদ্ধ পানীয় জল, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন। খোলা প্রান্তরে, উঠানে শিশুদের মলমূত্র ত্যাগ না করিয়ে নির্দিষ্ট পায়খানায় পায়খানা করানো, হাত ধুয়ে খাওয়ানো, খাদ্যপাত্র ঢেকে রাখা, জল ফুটিয়ে খাওয়ানো — এসব অভ্যাস করতে হবে। আজকাল এটাও খুব বহুল বিজ্ঞাপিত যে আন্ত্রিকে ঘন ঘন পায়খানা হলে O.R.S; তরল পানীয়, বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, নয় তো শরীরে হঠাৎ জলীয়ভাগ কমে গেলে বিপদ হতে পারে। এখন সবকিছুই নির্ভর করছে পিতা, বিশেষতঃ মায়ের শিক্ষার স্তরের উপরে। যেখানে মা শিক্ষিতা সেখানে মৃত্যুর হার কম। এ-বিষয়ে কেরালা রাজ্যের কথা আমরা সর্বদা উল্লেখ করি। সেখানে শিক্ষার হার বেশি ফলে শিশুমৃত্যুও

কম। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে শিক্ষার হার কম বলে শিশুমৃত্যু বেশি। এখন ইউরোপ, আমেরিকার লোকসংখ্যা তেমন বাড়ছে না, ইটালিতে লোকসংখ্যা কমে গেছে, ডেনমার্কেও লোক আর বাড়ে না। স্থিতিস্থাপকতা এসে গেছে। সাধারণভাবে শিশুমৃত্যু সম্বন্ধীয় রোগগুলি সবই প্রতিরোধ করা হয়ে গেছে। মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু আর নেই। সচেষ্ট হলে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়ও আমরা এ-সাফল্য পেতে পারবো। শিশুবিকাশের ধারা আলোচনা করতে গেলে শিশুর বিকাশে যেসব অভিশাপ প্রতিবন্ধকতা করছে তারও একটু উল্লেখ প্রয়োজন। সবচেয়ে দুঃখজনক, ঘৃণ্য ব্যাপার শিশুশ্রম। আজ দেশে প্রতি ২০ জন শিশুর একজন শ্রমিক। এদের ১কোটি৩০ লক্ষ বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করছে। বারাণসীতে ৭ হাজার কার্পেট শিল্পে জড়িত। কাচের চুড়ি তৈরির কারখানা, শ্লেট তৈরির কারখানা এবং নানা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে এরা জড়িত। পশ্চিমবাংলার হাওড়ায় বিরাট সংখ্যক শিশু শ্রমিকরা দিনে ১০/১২ ঘণ্টা কাজ করে মজুরি পায় সামান্য, এদের কোন নিরাপত্তা নেই। ১৬ই সেপ্টেম্বর বাগনানে বাজির কারখানায় বিস্ফোরণে অনেক শিশু মৃত্যুবরণ করেছে। জরিশিল্পে বহু শিশু নিযুক্ত, এরা মেয়েদের পোষাকে বা অন্যান্য কাপড়ে খুব সূক্ষ্ম কাজ করে, এগুলো বয়স্ক কর্মীরা করতেই পারে না। এরাও দিনে ১০/১২ ঘণ্টা খাটে কিন্তু উপযুক্ত মজুরি পায় না। এভাবে ৯% শিশুশ্রমিক কার্পেট শিল্পে, ২৫% পিতলের কারখানায়, ৩৩% বিড়ি এবং কাচের চুড়ির কারখানায়, ৪২% দেশলাই ফ্যাক্টরিতে, ৪% বিভিন্ন বাগিচায় — এছাড়াও অসংখ্য দোকানে হোটেলে প্রায় পরিবারে অগণিত শিশু শ্রমিক রয়েছে। এ-বিষয়ে দেখা যায় দেশে ছেলে শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা কমলেও মেয়ে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে। সংবিধানে শিশুদের জন্য রয়েছে শিক্ষার কথা, তাদের উপযুক্ত বিকাশের জন্য খেলাধূলা, বিশ্রামের, অবসরের কথা, তাদের কোন ক্ষতিকর জীবিকায় নিয়োগ না করার কথা, কিন্তু এগুলোকে বাস্তবে আজো রূপ দেওয়া যায়নি। Labours laws Apprenties Act 1951 অনুসারে সাত থেকে চৌদ্দ বছরের শিশুকে আইনত কেউ কোন কাজে নিযুক্ত করতে পারে না। Factories Act 1934 মতে ১৪ বছরের নিচের শিশুদের কোন ফ্যাক্টরিতে কাজ করানো যায় না। Mines (Amandent) Act, 1983 মতে ১৪ বছরের নিচের শিশুকে খনিতে কাজ করানো যাবে না। বিড়ি কারখানা, দেশলাই বাজি, অন্যান্য বিস্ফোরক তৈরির কারখানা, সাবান এবং চর্মশিল্পের কারখানায় শিশুদের কাজ করানো নিষিদ্ধ। সংবিধানের Article 45 অনুযায়ী 1974 সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে। এতে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং এ-সুযোগ যারা পাবে না তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ঘোষিত হয়েছে। কারণ এটাই শিশুশ্রম বিলুপ্তির একমাত্র উপায়। Article 7-এ বলা হয়েছে শিশুশ্রমিককে একটানা দৈনন্দিন তিন ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না, এর মধ্যে

তাকে একঘন্টা বিশ্রাম দিতে হবে। সর্বমোট ৬ ঘন্টার বেশি তাকে কাজ করানো যাবে না। সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরদিন ৮টা পর্যন্ত তাকে কাজ করানো যাবে না। শিশু শ্রমিককে একই দিনে এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পর অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করানো যাবে না। আইনের এত রক্ষাকবচ তারপরও শিশুরা কীভাবে শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে তাদের বিকাশ কীভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে তা সকলেই দেখছেন। যাই হোক আজ এটা সুখের বিষয় যে এসব বিষয়ে চেষ্টা চলছে, জাতীয় শিশুশ্রমিক নীতি অনুসারে তিনটি পরিকল্পনা নিয়েছে, একটি সুরাটে হীরা পালিশ কারখানায়, অন্ধ্রের মোরকাপুর শ্লেট তৈরির কারখানায়, তামিলনাড়ুর শিবকালীতে দিয়াশলাই তৈরির কারখানায় কর্মরত মোট ২০,০০০ শিশুদের পরিবারের আর্থিক উন্নতি সাধন করে তাদের নিয়ম বর্হিভূত এবং নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বিশেষ স্কুলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এ-সঙ্গে চেষ্টা চলবে এই সব বিপজ্জনক জীবিকার পরিবর্তে উপযুক্ত জীবিকা গ্রহণে প্রশিক্ষণ দেয়া, পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। তামিলনাড়ু সরকার শিশু-শ্রমিকের জন্য এক উৎসাহজনক বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছেন। এতে যেসব মেয়েসন্তান অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করবে এবং ১৮ বৎসরে বিয়ে করবে তাদের এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে। খবরে প্রকাশ, রাজস্থান সরকারও নানা জরুরি প্রকল্প নিয়েছেন। এ-সবগুলো রূপায়িত হলে শুধু শিশুর মঙ্গল নয়, দেশের আর্থ সামাজিক চিত্রটা পুরোপুরি পাল্টে যাবে। এ-বিষয়ে আমরা পথশিশু বা স্ট্রিট চাইল্ডদের কথাও উল্লেখ করতে পারি। আমাদের দেশের বড় বড় মেট্রোপলিটন শহরে লাখ লাখ বস্তিবাসী শিশু, পথবাসী শিশু ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা শেষ পর্যন্ত নানা মাদক ব্যবসায়, চোরাচালানে, পতিতালয়ে খদ্দের আটককারী কাজে জড়িয়ে গুন্ডা-মস্তান সমাজ-এর ক্ষতিকারী নাগরিক হয়ে ওঠে। এদের জন্যও আজ বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরাতেও পথশিশুদের জন্য উন্নয়ন ও পুষ্টি বিধানে অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হবে। সেজন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছেন। সাহায্য পেলে অ্যাকশন প্ল্যান কার্যকরী করা হবে। শিশুদের বিষয়ে সব চাইতে লজ্জা ও দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে শিশু পতিতার বিষয়টি, যার কথা বলে আমি আমার আলোচনার সমাপ্তি টানবো। এশিয়ার দেশগুলিতে শিশু-পতিতার সংখ্যা দশ লক্ষের ওপর। পাকিস্তানের পতিতালয়ে যারা আছে তাদের মধ্যে ৪০,০০০ আছে বাঙালি এবং এর একটা বিরাট অংশ শিশু-পতিতা। ইউরোপের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এইসব শিশুর যৌনতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। ১৯৮২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ৪০.৫% ধর্ষণ হয় ষোল বা তার কম বয়সী মেয়েদের উপরে। আজকাল প্রায় নিতান্ত শিশুকে, স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাচ্ছে। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে পারলে শিশু-পতিতার সংখ্যা কমে যাবে। ধর্ষণ এবং Eveteasing বন্ধের জন্যও দরকার খুব কড়াকড়ি ধরনের

শাস্তি। বর্তমানের সহজ সরল আইন দ্বারা এসব বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে এজন্য দরকার সমাজ সচেতনতা এবং জনসাধারণের এসব অপরাধের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদী মানসিকতা ও প্রকাশ্য আন্দোলনের ব্যবস্থা। সরকারী পর্যায়ে আজ বিভিন্ন শিশুবিকাশের কর্মসূচী নিয়েছে। আমি শুধু এগুলোর উল্লেখ করেই বক্তব্য শেষ করছি। এদের মধ্যে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলাপমেন্ট স্কীম, (I.C.D.S.) (সম্পূর্ণ শিশুবিকাশ প্রকল্পের সম্প্রসারণ) এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছয় বৎসরের কম বয়সী শিশু গর্ভবতী মহিলা, শিশুদের স্তন্যদায়িনী মায়েদের পুষ্টি বিধান, স্বাস্থ্যের উন্নতি করা। দেশে ৩৯০৭টি I.C.D.S. প্রকল্পের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ১৭৬.০৪ লক্ষ শিশু এবং ৩৮.৭৮ লক্ষ সন্তানসম্ভবা ও শিশু পালনকারী মায়েদের সেবাদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের ৫০৭টি, I.C.D.S. ব্লকে যৌবনোন্মুখ মেয়েদের প্রকল্পে নেওয়া হয়েছে। এতে ১১ থেকে ১৮ বছয় বয়স্ক ০.৩৫ লক্ষ মেয়ে উপকৃত হচ্ছে। ৫৭টি I.C.D.S. প্রকল্পে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলি পরিচালনার কাজে রয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক সাহায্যপুষ্ট ২টি I.C.D.S. প্রকল্প রয়েছে অন্ধ্রে, উড়িষ্যায়, বিহারে ও মধ্যপ্রদেশে। অষ্টম পরিকল্পনায় I.C.D.S. প্রণালীকে সর্বজনীন করার কথা সরকার ভাবছেন। এছাড়া রয়েছে ১) পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত কাজকর্ম শিশু এবং মহিলাদের পুষ্টিবিধানের জন্য, ২) প্রাথমিক স্কুলে শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা। ১৯৯২ সালে অধিনিয়ম নেওয়া হয়েছে শিশুখাদ্য নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন, সরবরাহ এবং বিতরণ করার সুব্যবস্থার জন্য। শিশুদের জন্য জাতীয় কর্ম সম্পাদন পরিকল্পনা ১৯৯২ ডিসেম্বরে UNO সম্মেলনে শিশুর অধিকার সম্বন্ধে চুক্তি এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় বৈষম্যের দূরীকরণ সম্বন্ধীয় চুক্তি ভারত মেনে নিয়েছে। কন্যাসন্তানের সমর্থন প্রচেষ্টায় সরকার কন্যাসন্তানদের জাতীয় কর্ম সম্পাদনের পরিকল্পনা রূপায়ণ করেছেন। মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প আক্রান্ত এলাকায় শিশুদের জন্য ১৪৫টি শিশু তত্ত্বাবধান (ক্রেশ) কেন্দ্র মঞ্জুর করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক এজেন্সি যেমন কেয়ার ও ইউনিসেফ এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যেমন I.C.C.W. এবং ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সংঘের কাছ থেকে পাওয়া ত্রাণ সাহায্যগুলি সেখানে ভারত সরকার সমন্বয় সাধন করেছেন। মহিলাদের জন্য সেখানে ২টি Short Stay Home এবং প্রশিক্ষণ নিযুক্তি উৎপত্তি প্রকল্পের অনুমোদন করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরেও যেসব কাজ আগেই হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলোও সরকার নতুন উদ্যোগে দেখছেন। এতে ২,৪৪,২৫৮ টি শিশু এবং গর্ভবতী, শিশু লালনকারিণী মায়ের জন্য ৭৮ টি I.C.D.S মঞ্জুর করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকার সর্বিক সাক্ষরতা, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদেরও উপকৃত করেছেন। স্বাস্থ্যের বিষয়ে শিশু জীবিত থাকা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নামের কার্যসূচী ১৯৯২-৯৩ সালে শুরু করেছেন। এই কার্যসূচীতে ২৫৫ টি জেলায় শিশুদের বেঁচে থাকা এবং ১০৪

টি জেলায় নিরাপদ মাতৃত্বের কাজে সাফল্য লাভ করেছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। উপসংহারে এইটুকু বলছি যে, এইসব শিশুবিকাশ সম্বন্ধীয় কার্যসূচী অভিনন্দিত হলে এটা সাংঘাতিক কিছু নয়। এই সব সাহায্য শিশুর প্রতি দয়া নয় এটা এদের দাবি, সাংবিধানিক অধিকার। এগুলো আমাদের বহু-বহু আগেই রূপায়িত করার চেষ্টা নেওয়া ছিল। যা হোক, এ বিষয়ে বলবো Better late than Never, এবং আমরা এইসব কর্মসূচীকে স্বাগত জানিয়ে একযোগে সবাই সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান শিশু মঙ্গলের জন্য অবশ্যই কাজ করবো কারণ শিশুই দেশের ভবিষ্যত।

সমৃদ্ধি ও সুখের জন্য জনবিস্ফোরণ রুখতে হবে

পৃথিবী এগিয়ে চলেছে। তার সাথে আমার কম করে হলেও এগিয়ে চলেছি। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে মানুষ জল-স্থল-অন্তরীক্ষে বিজয় অভিযান চালিয়েছে। পৃথিবী এখন ক্রমশই ছোট হতে হতে ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আমরা প্লেগ, বসন্ত, কলেরার মতন মহামারি নির্মূল করে মানুষের মৃত্যুর মিছিল রোধ করতে পেরেছি। সেদিনও কলেরায় নবশান্তিগঞ্জ বাজারের (গোলাঘাঁটির কাছে) মণিপুরি বস্তি শ্মশানে পরিণত হয়েছিলো। সেখানকার বাসিন্দারা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে সিপাহিজলা স্কুল সংলগ্ন সদর ঘাঁটিতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। এখন কলেরায় গ্রাম কি গ্রাম আজ উজার হয় না। গুটি বসন্তও একেবারে নিশ্চিহ্ন। প্লেগের কথা মাঝে-মধ্যে পশ্চিম ভারতের দিকে শোনা যায়। কুষ্ঠ প্রায় নির্মূলের পথে। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে যাচ্ছে। পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে আন্ত্রিক এখনো দেখা দেয়।

এই সব কিছুর ফলশ্রুতিতে মানুষের আয়ু স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেড়ে গেছে। এখন ভারতীয়দের গড় আয়ু ৬২ বৎসর। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ছিলো ৩১ বৎসর। তেমনি শিশুমৃত্যুর হার এখন হাজারে ৭৪। তখন ছিলো ১০৮। মাতৃমৃত্যুর হারও অনেক কমেছে। জন্মহারও কমেছে তবে তেমনভাবে নয়। এখনও ভারতে প্রতি বছর দুই কোটি জনসংখ্যা যোগ হচ্ছে, যেটা নাকি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যার প্রায় সমান।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক কমিটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বর্তমান পৃথিবীর ৩০টি দেশ খাদ্য সঙ্কটে রয়েছে। তারা চলেছে আন্তর্জাতিক সহায়তার উপর।

এদিকে আমাদের ভারতবর্ষে খাদ্যোৎপাদন এত বেশি বেড়েছে যে, সেগুলো গুদামজাত করে রাখার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। দানাশস্য নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো সমুদ্রে ফেলে দিতে হচ্ছে। অথচ ভারতে ৩৫ কোটি মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নীচে। তারা একবেলাও পেট ভরে খেতে পায় না। আমাদের ত্রিপুরায়ও এখনো ৬৫ শতাংশ গরিব মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে। সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থা তাদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য পৌঁছে দিতে পারছে না। হাতের কাছে খাদ্যশস্য থাকলেও তাদের কাছে পয়সা না থাকায় তারা কিনতে পারছে না। তাদের কাছে কাজ নেই, তাই রোজগারও নেই।

আয়ের ক্ষেত্রে ৪৪ শতাংশ ভারতীয় দৈনিক এক ডলারেরও কম আয় করে। ৬৬ শতাংশ মানুষ নিম্ন আয়ভুক্ত।

ভারতে প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে একজন অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রতি সপ্তাহে তিন লক্ষ শিশু অপুষ্টির কারণে নানা রোগে ভুগে মারা যায়। পাঁচ বছর বয়সের আগেই প্রতি হাজারে ৫০ জন শিশু মারা যায়। যা শ্রীলঙ্কার চাইতে পাঁচগুণ বেশি।

প্রতি বছর পৃথিবীতে ২০ কোটি মহিলা গর্ভবতী হন। ১৬০০ মহিলা প্রতিদিন গর্ভকালীন অবস্থায় এবং প্রসবকালীল জটিলতায় মারা যান। প্রতি মিনিটে একজন করে এবং ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার প্রতি বছর মারা যান। তার মধ্যে ৯১ শতাংশ এশিয়া এবং আফ্রিকায় এবং ৪০ শতাংশ সাউথ এশিয়ান দেশের। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলোতে এই হার ১ শতাংশেরও কম।

আমাদের দেশে ৭১ কোটি মানুষের কোন স্যানিটেশনের সুযোগসুবিধা নেই। তারা বস্তিতে বা ঝুপড়িতে থাকে। যেখানে থাকে, শোয়, খাবার খায়, সেখানেই আবার তাদের পায়খানা-প্রস্রাবের জায়গা। নোংরা পরিবেশে অপরিস্রুত জলে তাদের জন্ম, রোগ-ভোগ এবং মৃত্যু। ১৯ কোটি মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পায় না। ১৫ কোটি মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগসুবিধার নাগাল পায় না। ৩৯ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা আমাদের দেশে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাইয়ের সাহায্য গর্ভকালীন সময়ে এবং সন্তান প্রসবের সময় পান না। মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার আজও অনেক বেশি। আমাদের ভারতীয়দের জীবনের মান খুবই নিচে। পৃথিবীর ১৮৯ টিদেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৭৪। ১৫ বছরের উপর বয়সের শিক্ষার হার সমগ্র পৃথিবীতে ৭৩ শতাংশ, আমাদের ভারতে ৪৪ শতাংশ।

১৯৯১ সালের সেন্সাসে ৭ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা ৩০ কোটি। তার মধ্যে নিরক্ষর ৪৮ শতাংশ। পৃথিবীতে ৩৪ কোটি শিশু স্কুলের গন্ডির বাইরে। তার মধ্যে ২২ শতাংশ ভারতীয়। অথচ, শিক্ষায় ভারতের এক অংশের মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে এগিয়ে। তথাপি নিরক্ষরতায় ভারতই সবচাইতে উপরে।

ভারতের ২০ শতাংশ মানুষ ধনী এবং স্বচ্ছল। তারা দেশের সমগ্র আয়ের ৪৬ শতাংশ উপভোগ করেন। আর যারা আর্থিকভাবে দুর্বল, নিম্ন আয়ভোগী মানুষ, তাদের কাছে দেশের আয়ের মাত্র ৮ শতাংশ গিয়ে পৌঁছায়। চিত্রটা আরো একটু পরিষ্কার হয়, যদি আমরা দেখি, 'ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল'-এর মতে ভারতে স্বর্ণের ব্যবহার সবচাইতে বেশি। ১৯৯৮ সালে ভারতে সোনা ছিল ৮১৯ টন, অথচ সবচাইতে ধনী দেশ আমেরিকায় ছিলো ৪২৪ টন মাত্র। আরেক ধনী দেশ সৌদি আরবে — ২০৮ টন, চীনে (বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ) ১৯১ টন, জাপান ১১০ টন, পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে ১৪৪ টন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জীবনধারণের মানদণ্ডে পৃথিবীর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতের

থাকার কথা ছিল সবার উপরে। কিন্তু তা হয়নি। ৩৫ কোটি মানুষ একবেলা ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে না। অনেকের মতে, প্রাকৃতিক এবং মানব সম্পদে ভারত সবচাইতে ধনী দেশ। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভারতই হচ্ছে সবচাইতে গরিব। প্রতিবছর ১৮ বছরের নিচে ১২ লক্ষ মেয়ে এদেশে যৌনকর্মী হিসেবে দেহ-ব্যবসায় নামে।

বৈপরীত্যে ভরা ভারতবর্ষ ঃ সত্য সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ!

যে জনসংখ্যা আমাদের দেশে বর্তমান, তাদের বাসস্থান, স্বাস্থ্য-পরিষেবা, পুষ্টি ও যথাযোগ্য খাদ্যের যোগান আমরা দিতে পারছি না। আমাদের ভারত সাফল্য অর্জন করেছে শুধু সবুজ বিপ্লবে, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার তৈরিতে, অন্তরীক্ষ-মহাকাশ প্রকল্পে এবং পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে। নইলে পৃথিবীর ৮০ কোটি মানুষ যেখানে ক্ষুধার্ত থাকে, সেখানে ভারতের অংশ হচ্ছে ৩৫ কোটি। মানে অর্ধেক অংশই ভারতীয়। এর সমাধান কোথায়?

বিজ্ঞানীদের মতে একজন মানুষের বেঁচেবর্তে থাকার জন্য জমির প্রয়োজন হয় ৯ একর। ৬০ জনের লাগে ১ স্কোয়ার কিলোমিটার জমি। এতটুকু জায়গাতেই তার বাসস্থান, খাদ্য উৎপাদন, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, পশুপালন, খেলাধূলার জায়গা, স্যানিটেশন — সবরকম অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

পৃথিবীর বহিরায়তন ৩১ কোটি ৬২ লক্ষ ১৬ হাজার ১৮৬ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৭০ ভাগ জল, ৩০ ভাগ স্থল, স্থলের মধ্যে মাটি, পাথর, পাহাড়, মরুভূমি — যার আয়তন ৯ কোটি ২১ লক্ষ ৯ হাজার ২৯ বর্গ কিলোমিটার। মানুষের মাথা গোঁজার জন্য রয়েছে ৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে এন্টার্টিকা ৮০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫০০ বর্গ কিলোমিটার। গরম জায়গা ৮০ লক্ষ ৪৭ হাজার, মরুভূমি ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭০০ বর্গ কিলোমিটার। বলা হয়, চাষযোগ্য জমির মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ এখন পর্যন্ত ব্যবহারে আনা হয়েছে। এভাবে দেখতে গেলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য আরও অনেক জায়গাজমি রয়ে গেছে। যদিও তা সহজভাবে সকলের নাগালের মধ্যে প্রয়োজনমত আসছে না। কাজেই জায়গা থেকেও নেই, বলতে হবে।

এর প্রেক্ষিতে ভাবতে গেলে দেখা যাবে, ত্রিপুরা রাজ্যে জনসংখ্যার তুলনায় জায়গা জমি আর নেই। বনভূমি, টিলাভূমিতেও মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়া যাচ্ছে না। সমতলভূমি তো কবেই শেষ হয়ে গেছে।

১৯৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিলো ২৫০ কোটি। ১৯৯৭ সালে তার বেড়ে হয়েছে ৬০০ কোটি। পণ্ডিতদের অভিমত, প্রজেক্টেড জনসংখ্যা ২০২৫ সালে ৮০০

কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ জনসংখ্যা বাড়বে বলা হয়েছে। ইউ. এন. ও-র মধ্যে উন্নত দেশগুলোতে ১২ শতাংশ করে, কম উন্নত দেশগুলোতে বাড়বে ৭৫ শতাংশ করে। ভারতে ১৬-১৭ শতাংশ বাড়বে, চীনে বাড়বে ২২-১৮ শতাংশ। তারপর আবার উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা কমবে ২৩ থেকে ১৫ শতাংশ করে। ইউরোপে কমবে ৯ থেকে ৬ শতাংশ। উত্তর আমেরিকায় কমবে ৫ থেকে ৪ শতাংশ।

এত এত মানুষের জন্য আমরা কোনদিকেই কুলিয়ে উঠতে পারছি না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, ধরুন, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্কুল। বর্তমানে ৭ লক্ষের উপর রয়েছে প্রাথমিক স্কুল। কিন্তু প্রতিদিন ৪৮ হাজার শিশু জন্ম নিচ্ছে। যদি ২৪ জনের বদলে ৩৬ জন ছাত্রকে প্রতি ক্লাসে জায়গা দিতে হয়, তবে প্রতিদিন আমাদের ১ হাজার ৩০০ ক্লাসরুম দরকার। প্রতিদিন ৩৬৪ টি স্কুল দরকার। অর্থাৎ, ৯৭ হাজার স্কুল বছরে করা দরকার। সরকারি পাওয়া হিসেব অনুসারে, সেখানে মাত্র ১০ হাজার স্কুল করা হচ্ছে। ২০০৫ সালে আমাদের শিশুসংখ্যার অনুপাতে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার প্রাথমিক স্কুল করতে হবে। এক্ষণে ৯৭ হাজার দরকার। বছরে এর জন্য ২ হাজার ৮০ লক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন। জি. ডি. পি.-র ৩ শতাংশ এতে খরচ করতে হবে।

এদের ৫০ শতাংশকেও সেকেন্ডারি এডুকেশন দিতে চাইলে প্রতিবছর ৭৫ হাজার স্কুল করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা কোনদিনই সম্ভব নয়। আর বাসস্থান? প্রতিদিন কত কত হাজার লক্ষ বাসস্থান বা গৃহ নির্মাণ করতে পারলে আমরা সবাইকে মাথা গোঁজার ঠাঁই দিতে পারবো, তার হিসেব কষা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব সেই প্রচেষ্টা সফল করে তোলা।

তেমনি লজ্জা নিবারণের জন্য আমাদের অনেক কাপড় প্রয়োজন। বর্তমানে দেশে মাথাপিছু কতটুকু কাপড় পাওয়া যায়, তার একটা হিসেব দেওয়া গেলো — জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও মাথাপিছু কাপড়ের লভ্যতা ১৯৯৮-৯৯-এ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩০.৬১ স্কোয়ার মিটার। যেটা ১৯৯২-৯৩ সালে ছিলো ২৪.৫০ স্কোয়ার মিটার।

মাথাপিছু লভ্যতার হিসেবটা কাগজে-কলমে রয়ে গেছে খাদ্যোৎপাদনের মতো। গরিব জনতার হাতে কাজ নেই, পয়সা নেই। ক্রয়ক্ষমতার অভাবে তাদের বেশিরভাগ মানুষকেই অর্ধ উলঙ্গ থাকতে হয় এবং সেটা দেখে দেখে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

একে তো দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষ। তার উপর আমাদের সমগ্র বাজেটের ৪০ শতাংশ বিদেশীদের ঋণের সুদ হিসেবে দিতে হয়। সব ঋণের সুদ তাতেও মেটানো যায় না। ঋণের উপর ঋণ করে কিছু আসল আর সুদ মেটাতে হয়। এভাবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ভারত ঋণের বোঝা বহন করছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে, উন্নত দেশগুলো বছরে বছরে দেড় লক্ষ কোটি টাকা সুদ পায়। সেজন্য ধনীরাই আরও ধনী হচ্ছে। ১৯৬০

সালে ধনী ও গরিব দেশের আয়ের অনুপাত ছিল ৩০ ঃ ১। ১৯৯১ সালে সেই আয়ের অনুপাত হচ্ছে ৬০ ঃ ১। অর্থাৎ, ওরা আরও ধনী হচ্ছে আমরা আরও গরিব হচ্ছি। পৃথিবীর যা আয়, তার ৯৮ শতাংশ ধনী দেশগুলো পায়, আর বাদবাকিরা পায় মাত্র ২ শতাংশ।

পশ্চিমী দেশের রাস্তাঘাট খুব চওড়া এবং পরিচ্ছন্ন। এককথায় অতুলনীয়। আমার ডেনমার্ক, সুইডেন যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলে। দেখেছিলাম ঝকঝকে তকতকে বড় বড় বাস আধঘন্টা পরে পরে রাজপথ ধরে চলেছে। খুব ভিড়ের সময়ও তেমন গাদাগাদি ঠেলাঠেলি করে উঠতে হয় না। আমাদের দেশের বাদুড়ঝোলার কথা মনে পড়ছিলো। অফিস টাইমের বাইরে সেখানকার বাসগুলো মাত্র তিন-চারজন যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে। চওড়া রাজপথের দু'ধারে খালি ফুটপাথ, সাইকেল আরোহীদের লেন, দ্রুতগামী ছোটো কারের জন্য মাঝখানে খালি রাজপথ, পথের মাঝখানে ডিভাইডার।

ডেনমার্কের আয়তন ৪৩,০৭৪ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ৫৩ লক্ষ। জন্ম হার প্রতি হাজারে ১২, মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ১১, শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ৪.৭, শিক্ষার হার ৯৯ শতাংশ, গড় আয়ু ৮০ বছর। দেশটা সহায়সম্পদে ভরপুর, অথচ লোকজন নেই।

আমাদের দেশে কোনটাই কুলোয় না। শহরের রাস্তাঘাটে ফুটপাত নেই, মানুষের বসার জায়গা নেই, সাইকেল রিক্সার জন্য. গাড়ির জন্য রাস্তা নেই, পার্কিং-এর জায়গা নেই। অথচ মানুষে মানুষে গিজ গিজ করছে সর্বত্র।

ত্রিপুরা তথা ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা যা আছে, তাদের সকলের জন্য আমরা বাসস্থান বা মাথা গোঁজার ঠাঁই দিতে পারিছ না। তাদের খোলা আকাশের নিচে, ফুটপাত অথবা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কিংবা ঝুপড়িতে নরককুণ্ডে থাকতে হয়। গ্রামের লোকেরা কাজের সন্ধানে শহরে ভিড় করে, ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি দিনের পর দিন আরও জটিল আকার ধারণ করছে।

দেশে যদিও যথেষ্ঠ পরিমাণ দানাশস্য আছে, তা আমজনতার কাছে গিয়ে পৌছোচ্ছে না। রোজগারের পথ নেই, কাজেই চাল আটা কেনার জন্য তাদের কাছে পয়সা নেই। তাদের অভুক্ত, অর্ধভুক্ত থাকতে হচ্ছে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অপুষ্টিতে অসুখে ভুগে মারা যাচ্ছে। শহরের রাস্তাঘাটে আমরা প্রায়ই দেখি অভুক্ত ক্ষুধার্ত মানুষ ডাস্টবিনের পাশে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে আবর্জনা থেকে বাসি পরিত্যক্ত খাবার খুঁটে খাচ্ছে। এর চাইতে লজ্জাকর মর্মান্তিক দৃশ্য আর কী থাকতে পারে!

ভারতের ৪৪ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। চোখ থেকেও তারা অন্ধের মতো। নিজের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্যার সমাধান তারা করতে পারেন না। তেমনভাবে দেশের সার্বিক সমস্যা সমাধানের বদলে তারা নিজেরাই সমস্যা হয়ে থাকেন। কর্মসংস্থান করা

তাদের পক্ষে তেমনভাবে সম্ভব হয় না, ফলে তারা নিত্য অভাব ও নৈরাশ্য নিয়ে বেঁচে থাকার যুদ্ধ করেন, যে-যুদ্ধ জয় করা কোনদিন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

স্বাস্থ্য পরিষেবা আজকাল একটি ক্রয়যোগ্য মূল্যবান সামগ্রী হয়ে উঠেছে। পয়সা দিয়ে এ-সেবা কিনে নিতে হয়। কাজেই বেশিরভাগ মানুষ যেখানে গরিব, তারা এ-সেবা কিনতে পারে না। অশিক্ষার জন্য পুষ্টিকর খাবার কিনে খাওয়া এবং স্বাস্থ্যবিধান মেনে চলা, বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। টিকা বা ভ্যাকসিন না নেওয়ার ফলে ভ্যাকসিন প্রতিরোধযোগ্য রোগের হাতেও শিশুদের মৃত্যু হচ্ছে। অপুষ্টি আর আন্ত্রিক তো রয়েছেই।

কর্মসংস্থানের অভাবে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ বেকার শহরে এসে হন্যে হয়ে কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, দেশের অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, এমনকি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা পর্যন্ত চাকরি পাচ্ছে না। ফলে বেকারত্বের জ্বালা, অভাব, নৈরাশ্য মানুষকে দিন কে দিন ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। অনেকে প্রলোভনে পড়ে ভুল পথে অসামাজিক কাজ অথবা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিচ্ছে। সমাজ এবং দেশে এভাবে অশান্তি ও আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে।

দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার ফলে, রাস্তাঘাট এবং পরিবহনব্যবস্থাও আরও একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অটোরিক্সাতে তিনের জায়গায় পাঁচ জন, জিপে আটের জায়গায় ১৫-১৬ জন, গাদাগাদি করে বাসে আসা-যাওয়া আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক গা সওয়া ব্যাপার। হঠাৎ করে প্লেনে সিট পাওয়া, আমাদের ত্রিপুরায় একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অসুখ-বিসুখ, চাকরির ইন্টারভিউ বা কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে আমাদের কলকাতার দিকে যেতে হলে, প্লেনের টিকিটের জন্য আমাদের হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়।

ট্রেনের টিকিটের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। কলকাতার বাস, ট্যাক্সি, অটোরিক্সার সমস্যার কথা আমাদের সকলের জানা। এসবের জন্য দায়ী — জনবিস্ফোরণ। অত্যাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিই এসবের মূলে কাজ করছে।

এইসব ছবি সামনে রেখে যদি দেশের সার্বিক চিত্র মনে মনে ভাবেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাক, একথা বলতে পারবেন না। এখন জ্ঞানীগুণী, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবক সকলেই পরিবার পরিকল্পনার কথা বলেন, আর লোকসংখ্যার বৃদ্ধি যাতে না হয়, তার চেষ্টার কথা বলেন। এবং একথা ঠিক যে, যে-হারে ভারতে জনবিস্ফোরণ ঘটে চলেছে, একে রোধ করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেজন্য সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো আজকাল বৎসরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ১১ জুলাইকে জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালন করে। জনসাধারণের প্রত্যেকেরই এই সমস্যার সমাধানের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু কঠোরভাবে চীনদেশের মতো, সন্তান সংখ্যার উপর কোন নিয়মবিধি আরোপ করা এখনো এদেশে সম্ভব হয়নি। চীনে সরকারি ব্যবস্থা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং

তাতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অনেক কমে এসেছে। এ-ব্যবস্থা আমাদের দেশেও প্রয়োগ করা যায় কি না চিন্তাভাবনা করা দরকার।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-ব্যবস্থাগুলো আমাদের দেশে আছে ঃ

১. একটা নির্দিষ্ট বয়সে অর্থাৎ ১৮ বৎসর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে, তার আগে না। কারণ, টিন এজারদেরও যদি বিয়ে হয়, এবং তারা সন্তান ধারণ করে, ১৩ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে তাদের অনেকগুলো সন্তান হয়ে যাবে। ১৮ বৎসর বয়সে বিয়ের পর অন্তত দু-বছর সন্তান উৎপাদন করবে না, এই সদিচ্ছা উহ্য থাকে। ২০/২২ বছর বয়সে প্রথম সন্তান হলে স্পেসিং করে ২৫/২৬ বছর বয়সে আর একটি সন্তান তারা আনতে পারে। এবং এরপর সন্তান উৎপাদন একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু ১৮ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ের আইন কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে। সেটা কেউ মানছে না। ফলে যা হয়, তাই হচ্ছে। ১৫ বছর থেকে ৩০ বছরে সন্তান সংখ্যা ৬/৭ জন হয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা কমছে না, বেড়েই চলেছে।

২. ভ্রূণমোচনের সুযোগ-সুবিধা। ডাক্তারবাবুদের উপদেশ মতো এখন বিবাহিত মেয়েদের স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে ভ্রূণমোচন করা হচ্ছে। কিন্তু অবিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে এ-কাজটা এত সহজ নয়। এটাকে খোলাখুলিভাবে লিগালাইজ করে দিতে হবে। যাতে সরকারি স্বীকৃত হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে ভ্রূণমোচন করা যায়। তাতে মহিলাদের জীবনের ঝুঁকি অনেক কমে যাবে।

স্পেসিং-এর জন্য ওরাল পিলস, কনডোম এবং কপার-টি সহজলভ্য করে দিতে হবে এবং এর জন্য ব্যাপক প্রচার দরকার। স্থায়ীভাবে সন্তান যাতে আর না হয়, সেজন্য পুরুষদের ভেসেকটামি এবং মেয়েদের টিউভেকটামি পদ্ধতি আছে। পুরুষদের ভেসেকটামি খুবই সহজ, সোজা এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ, অথচ যৌন সংসর্গে কোন অসুবিধা হয় না। তবে পশ্চিমী দুনিয়াতে ওরা জন্মহার কমিয়ে রেখেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিল দিয়ে এবং কনডোম দিয়ে।

আসল কথা হচ্ছে, পরপর অনেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার হয়ে গেছে। সরকারের কোন জনসংখ্যানীতি এখনো তৈরি হয়নি।

শিক্ষা, বিশেষ করে নারীশিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। শিশুমৃত্যুর আধিক্যও কমাতে হবে। সার্বিক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সহজলভ্য করে শিশুর জীবন সুনিশ্চিত করতে হবে। জনসংখ্যরা পরিকল্পিত নীতি নির্ধারণ করে জনসংখ্যা সীমিত রাখার চেষ্টা নিতে হবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন বলেন,

নারীশিক্ষাই পারে জনস্ফীতি রোধ করতে। তিনি দেখিয়েছেন, ১৯৮৯ সালে চীনে, ভারতে এবং ভারতের কেরলে জন্মহার ছিল, যথাক্রমে ২২, ৩০ এবং ১৯। ওই সময়ে নারীশিক্ষার হার ছিলো প্রতি হাজারে চীনে ৬৫, গোটা ভারতে ৪০ অথচ কেরলে ৪৬ জন। নারীশিক্ষার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টিও জনস্ফীতি কমাতে সাহায্য করবে।

[ইউ. এন. ডি. পি. ইউনিসেফ, ডব্লিউ. এইচ. ও.-এর দেওয়া তথ্য থেকে এবং অন্যান্য মন্তব্য ও মতামত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার খবর এবং প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত]

বড়দার বিয়ে

গোলাঘাঁটি বাজারের লাগোয়া পূর্বপ্রান্তে ছিলো আমাদের হবু তালুই মশাই রামহরি দেববর্মার বাড়ি। বিরাট লম্বা দশাসই ছিলেন আমাদের হবু তালুই মশাই। বাবা, মাসতুতো দাদা নরেন এবং সঙ্গে ছোট্ট আমি — একসাথে গিয়ে কনে দেখে এলাম। বেশ বড়সড় শরীর, গায়েগতরে জোর আছে মনে হলো। দেখতেও খারাপ না। রামহরিবাবুর আগের পক্ষের তৃতীয় মেয়ে। মেয়ে পছন্দ হয়ে গেলো, কাজেই এবার দেনাপাওনার কথা। ঠিক হলো তিনকুড়ি টাকা। বড়দাকে ওঁরা আগেই দেখেছে, বলবান, উঁচু, লম্বা। পছন্দ না হওয়ার কোন কারণই নেই। অতএব বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেলো।

পাহাড়ে ঘড়ি-ঘণ্টা নেই। গোধূলি লগ্নেই সব বিয়ে হয় পাহাড়ে। বাঙালি নাকাচি (এখন পাহাড়িরাও নাকাচি হয়) নিয়ে বাজনা বাজিয়ে প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার দূরে গ্রামের দিকে রওনা হলো বরযাত্রী। সঙ্গে বেহারা পালকি নিয়ে চললো। দুপুরে রওয়ানা হয়ে দুপুর দুটো নাগাদ পৌছানো গেলো। প্রথমে মেদিনী কাঁপিয়ে বাজনদারদের বাজনা বাজলো আমাদের গ্রাম থেকে রওয়ানা হওয়ার আগে, পরে বাজারের কাছে আবার একটু এবং সবশেষে কনের বাড়ির উঠোনে গিয়ে বাজনা বাজলো। কনের যাত্রার জন্য সবাই প্রস্তুত। দরজায় জল ভর্তি মাটির ছোট কলসে আম্রপল্লব, গৃহপ্রবেশ পথে নতুন রিগনাই দিয়ে সামিয়ানা। ভেতরে হৈ-হট্টগোল, কান্নার রোল, যারা ছোট তারা ছোটাছুটি করছে। হাসাহাসিও করছে। আমরা প্রায় দশ-পনেরোজন — রীতি অনুযায়ীই হবু তালুই মশাই আমাদের একটা ঘরে বসতে দিলেন। জল এবং কিছু আরক দেওয়া হলো। পান দেওয়া হলো। সেসবের সদ্ব্যবহার করে আমাদের দল তাগাদা লাগালো, তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে। নাহলে গোধূলি লগ্ন পেরিয়ে যেতে পারে। কান্নার রোল ইতিমধ্যে কমে গিয়েছিলো, কিন্তু যাত্রার সময় এগিয়ে আসায় আবার প্রচণ্ড জোরে উত্থিত হলো। বিমাতাকে বেশি করে কাঁদতে হয়। নাহলে লোকে বদনাম দিতে পারে — 'যেহেতু নিজের পেটের মেয়ে নয়, তাই মনে কোন দুঃখ-কষ্টই নেই।' সেজন্যই মা দ্বিগুণ জোরে কাঁদতে লাগলেন মনে হলো। কিংবা এমনও হতো পারে, তাঁর মনে সত্যি সত্যিই কষ্ট হচ্ছিলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে কনে পাল্কিতে উঠলো। সঙ্গে আমাদেরই দু'জন আয়োজক। ওদের দিক থেকে মেয়ের ছোটো বোনসহ দশ-বারোজন আমাদের সাথে এলেন। আমাদের

মহা আনন্দ। বাজনা বাজাতে বাজাতে সবাই রওনা হলো। আমাদের ঘরে কোন মেয়েই নেই, একমাত্র মা ছাড়া। কাজেই আনন্দ ও উত্তেজনা একটু বেশিই ছিলো। আমরা পাঁচ ভাই। তখনো আমাদের কোন বোন ছিলো না। ছোটো বোন স্বর্ণলতা জন্মেছিলো এর অনেকদিন পর।

কনেকে পাশেই মাসতুতো দিদি — বাঙ্গ চন্দ্রতারার ঘরে ওঠানো হলো। তিলকদা ও আমি ছোটো মাটির কলসিতে করে কনের এবং বরের স্নানের জন্য পুকুর থেকে জল তুলে আনলাম। এই উপলক্ষে আমাদের দুজনকে দুটো করে জল-গামছা দেওয়া হলো। তখনকার সময়ে এটা ছিলো আমাদের কাছে মহাপ্রাপ্য। একটা গামছা পরে, অন্যটা কাঁধে চাপিয়ে আমরা বরকে নিয়ে পাড়া ঘোরাতে বেরোলাম। একটা গামছা রাস্তায় বিছিয়ে দিলে, বর তার উপর দিয়ে হেঁটে অগ্রসর হয়। একটা গামছার পরে অন্য গামছা বিছিয়ে বিছিয়ে আমরা গ্রামের দু-এক বাড়ি ঘুরে 'গজ ফিরগ' নিয়ম পালন্ করলাম। 'গজ ফিরগ' মানে হচ্ছে, আগের দিন বর হাতিতে চড়ে পাড়া প্রদক্ষিণ করতো। এখন সেটাই সংক্ষিপ্ত হতে হতে গামছাতে এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে অবশ্য বাজনদারেরা চলে মহা ধুমধামে বাজানা বাজিয়ে বাজিয়ে। আর থাকে পাড়ার একদঙ্গল ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। এদিকে ততক্ষণে বিকেল হয়ে এসেছে। কনেকে স্নান করিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলে আনা হয়েছে বিয়ে বাড়িতে। কুমুই গোছের মানে কনের জামাইবাবু জাতীয় কেউ কনেকে পিঠে করে বহন করে নিয়ে এসেছে দুটো বালিং (ডালা) দিয়ে আড়াল করে। ঘরে-দরজায় চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে মার্কিন কাপড় দিয়ে বর্ডার দেওয়া। বাঁশের তৈরি বেদির দু'দরজায় দু'টো চাঁদোয়া টাঙানো। বেদির মাঝখানে চারটে লম্বা লম্বা বাঁশে নতুন রিগনাই দিয়ে পাঁচটা বা সাতটা, অথবা ন'টা চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। মাটি দিয়ে মাঝখানের জায়গা উঁচু করা হয়েছে। সেখানে রাখা হয়েছে শিলনোড়া। বিয়ের মন্ত্র শেষ হলে আশীর্বাদের সময়, সেখানে দাঁড়িয়ে বর-কনে জলের ছিটে নিয়ে আশীর্বাদ নেবে।

বেদির পশ্চিম প্রবেশদ্বারে চাঁদোয়ার নিচে বর এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে তার আয়া (নিতবর)। বরের গায়ে সুতির শার্ট। পরনে হাতে তৈরি ধুতি, মাথায় পাগড়ি। তার আয়ারও প্রায় একই পরিচ্ছদ, শুধু পাগড়ি নেই। বরের হাতে একটা দর্পণ — পেতলের তৈরি। দরজায় দাঁড়ানো বরের ডান কাঁধে পেছনে দাঁড়ানো আয়ার হাত। আয়া বেদির ভেতর থেকে ঝারির জল নিয়ে, ঝুঁকে বরের পায়ে ঝারির জল ছিটিয়ে পা-ধোয়ানোর নিয়ম রক্ষা করলো। সঙ্গে উলুধ্বনি পাঁচবার। এরপর বরের কাঁধে রাখা আয়ার হাতের তর্জনীর সাথে নিচে বরের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে পাঁচ থেকে সাতবার সুতো পেঁচানো হলো। একে বলে 'খীতীং আওলা'। সুতো পেঁচালেন আয়াজীক। এখন আয়াজীক সুতো খুলে না দিলে বর বেদিতেই প্রবেশ করতে পারবে না, বিয়ে তো দূরের কথা। সুতো খুলে

দেওয়ার জন্য শর্ত আছে। আয়াজীককে টাকা দিলে তবেই তিনি সুতো খুলে দেবেন। এই নিয়ে নিতবরের সঙ্গে আয়াজীকের দর কষাকষি চললো। বরের পক্ষে নিতবর বললো, 'দু'টাকা'। আয়াজীক বললো, 'অসম্ভব'। নিতবর এরপর দর লাগালো, 'তিন টাকা'। সেটাও আয়াজীক মানতে নারাজ। অবশেষে রফা হলো সাড়ে চার টাকায়। তখনকার দিনে, সেই ১৯৩৫ সালে এই টাকার মূল্য ছিলো অনেক। সমর্থ লোকদের ক্ষেত্রেই এত টাকা দাবি করা হতো। তা-না হলে সাধারণ ক্ষেত্রে দেড়-দুই টাকাতেই রফা হয়ে যেতো।

আজকাল দেখা যায়, বর এবং বরযাত্রী এলে সদর দরজাতেই হবু জামাইয়ের হবু শ্যালিকা-শ্যালকেরা পথ আটকান এবং কয়েক শ'টাকা না দিলে ঢুকতে দেন না। দরজায় জটলা হয়, দর কষাকষি হয় এবং শেষ-মেষ বরের প্রবেশের অনুমতি মেলে।

কন্যাদান সম্পন্ন হলে ফুল ছেটানোর জন্য বেদির বাইরে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রথমে বরকনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে, পরে কনের পিঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে কনেকে বরের চারপাশে ঘোরানো হলো। কনে বরের সামনে এলে বর কনের কোলে ফুল ফেলে দেয় আর সেই ফুল নিয়েই বরের মাথায় ছেটানো হয়।

কনে বিকেলের আগেই উঠোনে পোঁতা একটি করবী গাছের ডাল, কুমুই (জামাইবাবু)-এর পিঠে চড়ে গিয়ে উপড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে। গাছের পোঁতা ডালকে উপড়ে ফেলাকে বলে 'খুম ফাং ফুইঅ'।

বেদির ভেতর ব্রাহ্মণ কনের বাবা এবং বরকে মন্ত্রাদি পড়িয়ে যজ্ঞ শেষ করে ফেলেছেন। কনের বাবা নতুন কাপড় দিয়ে এবং জামাইয়ের আঙুলে আঙটি পরিয়ে জামাই বরণ করে নিলেন। এই সময়েই কুমুইয়ের পিঠে চড়ে কনে বেদিতে হাজির হলো। সঙ্গের দুই আয়াজীক সাজানো ডালা বা বালিং দিয়ে কনেকে আড়াল করে রাখছেন। কনে বসলো উত্তরের পিঁড়িতে। এইবারে আসল বিয়ে শুরু। একটা জলভরা ঘটের উপর উপুড় করে রাখা বরের ডান হাতে কনের ডান হাত রাখা হলো। তার উপর কনের বাবার হাত রেখে মন্ত্র পড়ে বিয়ে হলো। সঙ্গে সমস্বরে বাজনা, উলুধ্বনি এবং নাপিতের শ্লোক পড়া ইত্যাদিতে, কারোর কথাবার্তা কানে ঢোকা দায়।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে আরো অনেক বিয়ে বাড়িতেই যোগ দিয়েছি, অভিজ্ঞতাও বিচিত্র। কিন্তু ছোট্টবেলার সেই বড়দার বিয়ের স্মৃতি আজও যেন সমান ভাস্বর।

বিমল সিংহ

'বসনের ঠাকুরমা' এবং অন্যান্য গল্প প্রবন্ধের সুলেখক সাহিত্যিক প্রাক্তন মন্ত্রী বিমল সিংহের প্রয়াণ দিবস দেখতে দেখতে বৎসর ঘুরে এল। ৩১শে মার্চ ১৯৯৮ ইং তিনি উগ্রপন্থীদের গুলিতে শহিদ হন। নিজের নিষ্পাপ সরল ব্যক্তিত্ব নিয়ে অন্যকে অবিশ্বাস করতে জানতেন না বিমল সিংহ। মানুষের প্রতি বিশ্বাস ছিল অপরিসীম এবং মনে সাহস ছিল অপরিমেয়। মানুষের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাকে পাথেয় করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মতন ভেবেছিলেন — 'আমাকে কেউ মারবার পারাবর নাই।' অথবা জনতাই আমাকে রক্ষা করবে। কিন্তু ঘাতকের কালো হাত থেকে মুজিব রক্ষা পাননি, আমাদের অতিপ্রিয় আপনজন বিমল সিংহও রক্ষা পাননি। বিমল সিংহের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের যেমন অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তারও বেশি ক্ষতি হয়েছে লংতরাই তথা ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি ও সমতলীয় অধিবাসী সকলের।

প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহকে তাঁর নিজের সরকারী কোয়ার্টারে গিয়ে প্রথম দেখি। খালি গা, বিরাট রোমশ শরীর, কাঁচা-পাকা দাড়িগোঁফে চৌকো মুখ ভর্তি, চোখে হাসি — দেখেই মনে হয়েছিল ভরসা করা যায় মানুষটার উপর। এত সহজ সরল অথচ নির্ভরযোগ্য।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হচ্ছেন পদাধিকার বলে ত্রিপুরা যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির প্রেসিডেন্ট কাম চেয়ারম্যান। সমিতির সম্পাদক হিসাবে কার্যকরী কমিটির সভা করার জন্য একটা তারিখ এবং সময় দরকার, সেজন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। টেবিল ক্যালেন্ডার দেখে তারিখ দিলেন, সময়ও দিলেন। সে ১৯৯৬ সালের কথা।

এর কয়েকদিন পর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি টেলিফোনে আমাকে বললেন — মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন আমি যেন তাঁর অফিসে গিয়ে একটু দেখা করি। 'Reproductive & Child Health'-এর উপর বিশ্বব্যাঙ্কের একটা প্রকল্প আছে। সেটা আমাকে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখুন'। বললেন, যদি ইন্টারেস্টেড হই, তবেই যেন এই প্রকল্পে কাজ করি। পরে জানিয়েছিলাম, আমি এই প্রকল্পে কাজ করব না, কেন না যে-পোস্টে এ-কাজ করার কথা, সেটাতে শুধু দায়িত্বই আছে, স্বাধীনভাবে কাজ করার তেমন সুযোগ নেই। তিনি হেসে বলেছিলেন, 'ঠিকই বলেছেন। অন্য কোন জুনিয়র অফিসারকে এই কাজটা করতে বলব।'

ত্রিপুরা যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির কোন এক সভায় জনৈক সরকারি ডাক্তার বলেছিলেন, সমিতি যেন যক্ষ্মা রোগীদের জন্য কিছু ওষুধ কিনে দেন। কারণ, সরকারের স্টোরে ওই বিশেষ ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে এবং রোগীরা ওষুধ পাচ্ছে না। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সমিতি প্রত্যেক বছরে ৮০/৯০ হাজার টাকার ওষুধপত্র, এক্সরে ফিল্ম ইত্যাদি কিনে সরকারকে সহযোগিতা করে। মন্ত্রী বিমলবাবু জানতে চাইলেন, 'সমিতি ওষুধ কিনে দেবে কেন?' তখন সেই ডাক্তার বললেন, 'সরকারের টাকা নেই, সেজন্য।'

শুনে বিমলবাবু যেন আঁতকে উঠলেন! কে বলেছে টাকা নেই? ডাক্তারবাবু আমতা আমতা করতে লাগলেন। সেদিন সেই সভায় তদানীন্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তাও ছিলেন। তিনি বললেন, 'ওষুধের জন্য কোন রিকুইজিশন দিয়েছেন? টাকার অভাব, তাই ওষুধ কেনা যাবে না — এই মর্মে অফিস থেকে কেউ আপনাকে (সেই ডাক্তারকে) জানিয়েছে?' ডাক্তারবাবু বললেন — 'না।' তাহলে? আসলে রিকুইজিশন দেয়া। সেটাকে অনুসরণ করে অফিস থেকে স্যাংশন নিয়ে ওষুধ কেনার ঝামেলায় না গিয়ে সমিতি যদি আইতরমা বা ওই রকম সরকার অনুমোদিত কোন সংস্থার সাহায্যে ওষুধ কিনে দেয়, তবে কোন পরিশ্রমই করতে হয় না।

মন্ত্রী বিমলবাবু বললেন — 'ওষুধের রিকুইজিশন দিন'। স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে বললেন, 'ওষুধ যেন কিনে দেওয়া হয়।' এবং সেভাবে ওষুধ কেনা হয়েছিল। কথা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি বিষয় ছিল তাঁর নখদর্পণে। অফিসাররা যা বলল, তাতেই তিনি বিশ্বাস করতে রাজি ছিলেন না। নিজে বাজিয়ে দেখতে জানতেন।

একবার, আই জি এম হাসপাতালের ভেতরের চত্বরে একটা মিটিং-এ আমন্ত্রিত হয়ে গেলাম। সভায় বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্যে জানা গেল একটা বিরাট পরিকল্পনা বা স্কিম চালু হতে যাচ্ছে। যেসব রোগী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন, তাঁদের যদি চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে যেতে হয় তবে সরকার আর্থিক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাহায্য সহযোগিতা করবে। রাজ্যের মেডিকেল বোর্ড-এর অনুমোদন শুধু তাঁর দরকার হবে। বোর্ড যদি রেফার (Refer) করে, তবে রোগীকে আর কিছুই করতে হবে না। সরকারি ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা তাঁকে এবং রোগীর সঙ্গে যিনি যাবেন তাঁদের জন্য এরোপ্লেনের টিকিট এবং ট্রেনের টিকিট কেটে দেবেন। রোগী কলকাতায় কিংবা ভেলোরে গিয়ে সরাসরি হাসপাতালে ভর্তি হবেন। সেজন্য বিড়লা হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার সেন্টার ও ভেলোর ক্রিশ্চিয়ান হসপিটালের সঙ্গে ত্রিপুরা সরকারের চুক্তি হয়েছে এবং তাদের কাছে আগাম টাকা জমা রাখা হয়েছে। রেফার্ড হওয়া রোগীর সেসব হাসপাতালে অপারেশন বা চিকিৎসার জন্য ওষুধপত্রের যাবতীয় খরচ সরকারই বহন করবে। চিকিৎসার পর যখন রোগী ফিরে আসবেন তারও যাবতীয় রাহা খরচ সরকারই দেবে।

এই ব্যবস্থাপনার কথা শুনে মনে হয়েছে এটা একটা অভাবনীয় অভূতপূর্ব জীবনদায়ী ব্যবস্থা। একে বাস্তবায়িত করার জন্য শুধু মানসিকতা থাকলেই হয় না, তার জন্য নানাভাবে, নানাস্থানে চেষ্টাচরিত্র করে বিমলবাবু এটা সম্ভব করেছেন।

এই চিকিৎসা সহায়তার জন্য তিনি দিল্লিতে দরবার করে দু'কোটি টাকা এককালীন মঞ্জুরি নিয়েছেন এবং রাজ্যের সীমিত বাজেট থেকে চার কোটি টাকা ম্যানেজ করেছেন। মোট ছ'কোটি টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন — সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারই সুদের টাকায় গরিব রোগীদের রাজ্যের বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। গরিব রোগীদের আর রাজ্যের বাইরে গিয়ে আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত হতে হবে না, বা স্টেশন থেকে এ-হোটেল, সেখান থেকে এ-আউটডোরে সে-আউটডোরে ঘুরে ঘুরে হয়রানও হতে হবে না। এ-যেন একটা ভগবান প্রদত্ত আশীর্বাদ। এ-ব্যবস্থাপনায় প্রয়াত মন্ত্রী বিমল সিংহের একটা অবিস্মরণীয় অবদান। কলকাতা এবং দিল্লির ত্রিপুরা ভবনের মত এখন ভেলোরে এবং চেন্নাইয়েও ত্রিপুরা ভবন হয়েছে, রাজ্যের রোগীরা সেই সব ভবনে অগ্রাধিকার পান। এটাও কি তাঁর অবদান কি না আমার জানা নেই। এসবের উদ্যোগ নেওয়া এবং এগুলিকে বাস্তবায়িত করা সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও বিমলবাবুর পক্ষে অসম্ভব হয়নি।

একবার থ্যালাসেমিয়া সোসাইটির হয়ে মন্ত্রী বিমলবাবুর কাছে ডেপুটেশনে গিয়েছিলাম। সঙ্গে প্রফেসর কাশীনাথ দাস ও অন্যান্যরা ছিলেন। কথা হচ্ছে — থ্যালাসেমিয়া রোগীদের মাসে একবার, কারো কারো দু'বার রক্ত নিতে হয় (blood transfution)। রক্ত টাকা দিয়ে কিনতে হয় — গরিব যারা তারা স্বভাবতই রক্ত নিতে পারেন না, অনেকেই মৃত্যুর পথে বা মুমূর্ষু অবস্থায় থাকেন বা বাপ মায়েরা সর্বস্বান্ত হয়ে যান — সারা জীবন রক্ত নিয়ে তাঁদের বাঁচাতে হয়। রাজ্যে খুব বেশি সংখ্যক থ্যালাসেমিয়া রোগী নেই — হয়ত বা ৩০ জনের বেশি হবে না। আমরা বললাম সরকার কি এই কয়জন থ্যালাসেমিয়া রোগীকে বিনামূল্যে রক্ত দিতে পারেন না? আপনি তার একটা ব্যবস্থা করুন। বিমলবাবু সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ডেকে বললেন — থ্যালাসেমিয়া রোগীরা এখন থেকে বিনা খরচে রক্ত পাবে। রক্তের জন্য তাদের টাকা দিতে হবে না। এমনিভাবে এত সহজে এককথায় তিনি সব সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করে আমাদের অনুরোধ মেনে নিলেন — খুব আনন্দ হয়েছিল এবং আশ্চর্য লেগেছিল। এই ছিলেন বিমলবাবু।

আজকাল চিকিৎসার জন্য বিশেষত রোগ নির্ণয়ের জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে। রোগ নির্ণয়ের জন্য কতসব জটিল কলকব্জা তিনি জি বি বা রাজধানীর হাসপাতালে এনেছেন এবং সেগুলোর ব্যবহারবিধি রপ্ত করার জন্য ক্ষেপে ক্ষেপে ডাক্তারদের বাইরে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে মেশিনগুলো চালু করেছেন তা সবার জানা। এখন C.T. Scan-এর সুবিধা জি বি হাসপাতালেই পাওয়া যাচ্ছে,

আলট্রাসোনোগ্রাফি — প্রায় প্রতিটি মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছে গেছে এবং সেগুলোর উপকারিতাও রাজ্যের মানুষ পাচ্ছে। তিনি বলতেন আমরা পিছিয়ে থাকবো না — অন্যান্যদের সঙ্গে আমরাও ২০০০ সালে পৌঁছোতে চাই এবং সেজন্য দ্রুত গতিতে — তিনি বলেছিলেন। দুঃখ এই যে, তাঁর সেই দুর্জয় চলা থামিয়ে দেয়া হল।

১৯৯৭ সালে প্রায় চার মাস রাজ্যের বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে দেখলাম আই জি এম এবং জি বি হাসপাতালের ভেতরে এবং চত্বরে একটা নয়নমুগ্ধকর ছবি। চারদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ঝক্‌ঝক্ তক তক করছে। হাসপাতালের চত্বরে ব্রিক সোলিং দিয়ে পাকা করা হয়েছে সেজন্য পরিষ্কার রাখতেও সুবিধা হয়েছে, কোণে কোণে ঘেরা দেওয়া ফুলের এবং পাতাবাহারের বাগান। যে-হাসপাতালের অভ্যন্তরে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারাচ্ছন্ন নোংরা করিডোর, পা রাখতে ঘৃণা হতো সেটা এখন পরিষ্কার এবং আলোকিত। যাঁরা হাসপাতালকে এবং তার চারদিকের ড্রেনগুলোকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্বে রয়েছেন — যাঁদের শত ডাকাডাকি করেও পাওয়া যেত না — সেই কর্মীরা এখন যাদুকর বিমল সিংহের সংস্পর্শে এসে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। মনে হচ্ছিল এরা তাহলে আগরতলার হাসপাতালগুলোকেও এভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে পারে।

চেস্ট ক্লিনিকের পেছনের আগাছাও কেটেছেঁটে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। সামনেও বাগান। পরে দেখেছি মন্ত্রী বিমল সিংহের উপস্থিতিতেই কর্মীরা সবাই যাঁর যাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যান। কাউকে তিনি ধমক দিয়েছেন, কারোর চাকরি খেয়েছেন — এমন কোন ঘটনাও নেই। এটা তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং ক্যারিশমার জন্যই সম্ভব হয়েছে। তাই হাসপাতাল যেমন হাসপাতাল নামের যোগ্য হয়েছে। রোগীরাও স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নতভাবে পেতে শুরু করেছেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন বাবা মুঙ্গিয়া ট্রাস্ট একটা ধাপ্পাবাজ সংস্থা। তারা কোনদিনই এখানে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করবে না। পরে তাঁর কথাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। মুঙ্গিয়া ট্রাস্ট অনেক পাঁয়তারা কষে অনেক তঞ্চকতা করে সরে পড়েছে। এবং তিনি এও বলতেন, যে ত্রিপুরা সরকারই রাজ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করবেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন রাজ্যে একটা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতেই হবে। অনেকের কাছে এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন অসম্ভব মনে হলেও বিমলবাবুর কাছে এটা অসম্ভব মনে হয়নি।

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের স্বল্পকালীন উপস্থিতিতে (২৩-৯-৯৫ থেকে ৩১ - ৩ - ৯৮ ইং) রাজধানীর হাসপাতালে কিছু দৃশ্যমান চিত্র যেগুলো আমার চোখে পড়েছে — তারই কিছু উপস্থাপনা নিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টেনেছি।

কারণ বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রতিভাধর নেতা, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক এই নেতৃত্বের মূল্যায়ন বা তাঁর সাহিত্যের আলোচনা করার ক্ষমতা আমার নেই।

সুধন্বা দেববর্মা ঃ এক অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্ব

প্রথম দর্শনে এবং আলাপচারিতায় বিশুদ্ধ নম্রতার এই মানুষটিকে দেখলে সবারই মনে হত, নিপাট ভালোমানুষ। এর দ্বারা কোন সাহসিক কাজকর্ম, কোন বিপদাপন্ন পথের ঝুঁকি নেয়া অসম্ভব। ত্রিপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ সুধন্বা দেববর্মাকে দেখলে, ... এরকম ধারণাই স্বাভাবিক ছিল। এত বিনয়ী, এত মৃদুভাষী, আত্মপ্রচারে নিরুৎসুক মানুষটিকে সবাই খুবই সাদামাটা ভাবতেন। কিন্তু এই সাধারণ ধারণা সর্বাংশে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হবে যদি তাঁর বাহ্যিক চলনবলনের একান্ত বিপরীত, কঠিন ব্যক্তিত্বের আত্মগোপনে থাকাকালীন দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ এবং সাহসিক দিনলিপিগুলি প্রকাশিত হয়। এগুলো অনেকেরই অজানা।

গুরুতর মানসিক এবং স্নায়ুচাপ, শারীরিক কষ্ট সহনের মধ্য দিয়ে এই নির্ঝঞ্ঝাট ভালো মানুষটি অনেক অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন যা একজন স্বদেশ ও সমাজ প্রেমীর জন্য সেদিন আবশ্যকীয় এবং গৌরবপূর্ণ ছিল।

এসব কথা বলতে গেলে অবশ্যই কিছু পশ্চাৎপটের বর্ণনার প্রয়োজন এসে যায়। যেমন একটি ছবির বাঁধাইয়ের জন্য তার উপযুক্ত ফ্রেমের সাহায্য নিতে হয় ঠিক তেমনি। কাজেই সেই কথাগুলোতেই আসছি।

বহুদিনের সামন্ততান্ত্রিক শাসনের পাথর ভেদ করে পার্বত্য জনজাতির নতুন জীবন চেতনা সেদিন অঙ্কুরিত হতে চলছিল। ক্রম জাগরূক এক জাতিগোষ্ঠী তার প্রকাশ ও বিকাশের স্বপ্নে পথ খুঁজছে ভবিষ্যত আশায়। সেই চেতনারই বাস্তবরূপ একদিন দেখা দিল ত্রিপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে।

১৯৪৫ সালে ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলন যেমন ছিল অভূতপূর্ব তেমনি ছিল অনন্য প্রকৃতির। শিক্ষার জন্য নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জনাকয়েক আগরতলায় বোর্ডিং-এ পাঠরত ছাত্র-যুবকদের প্রয়াসে ত্রিপুরার পাহাড়ি জনজীবনে একটা অমূল্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে, শোষণ এবং অন্যায়ের প্রতিকারে দেশে দেশে আন্দোলন হয়, বিদ্রোহ-বিপ্লব হয়। কিন্তু শিক্ষার জন্য, শুধু নিজেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য, কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ অনুযোগ না করে, রাজার কাছে, শাসকের কাছ, প্রার্থনা, আমরা শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে স্কুল চাই, পাঠশালা চাই — এটা সত্যি

কোথাও দেখা যায়নি।

আগেকার ত্রিপুরী সমাজ একটা যুগসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছিল। '৪৫ সালের মে মাসে প্রলয়ঙ্করী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহানায়ক হিটলারের আত্মহত্যা এবং জার্মানির আত্মসমর্পণ, আগস্ট মাসে হিরোসিমা নাগাসাকিতে এটম বোমা নিক্ষেপ এবং জাপানের আত্মসমর্পণ ও মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি। ত্রিপুরার বাইরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের টালমাটাল অবস্থা। ত্রিপুরী সমাজের অর্ধেক তখন কৃষি কাজে হাতেখড়ি দিয়েছে, সঙ্গে জুমচাষও তারা ছাড়েনি। এখনো ছাড়েনি, কারণ এটা এ-সমাজের রক্তমাংসের সঙ্গে মজ্জাগত হয়ে গেছে। জুমের ধানে সংবৎসরের খোরাকি চলে যায়। ক্ষেতের ধান বিক্রির টাকা দিয়ে সংসারের অন্যান্য খরচা চলে। মোটমাট পাহাড়ি সমাজ স্বস্তিতেই ছিল। এখন আর জঙ্গল নেই, যেখানে জমুচাষ করা যায়। এক জায়গা থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় জমুচাষ করার সুযোগ অন্তর্হিত।

সমতল জমিতে কৃষি কাজের সুবিধে, একই জায়গায় বারে বারে ফসল ফলানো যায়। ফলে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় বাসস্থান গড়ার অসুবিধাও আর থাকে না। একই জায়গায় স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলার সুবিধে পাওয়া যায়। জীবিকার পরিবর্তনের ফলে জীবনযাত্রা প্রণালীরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বুনো বেপরোয়া উদার সরল জীবন থেকে সূক্ষ্ম অনুদার হিসেবি জীবনের অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়াস নিতে হয়। ফলে লেখাপড়ার চিন্তা দেখা দিতে বাধ্য।

তখন দেখা গেল কোন পরিবারের তিন চার জন সন্তান থাকলে অন্ততঃ এক সন্তানকে লেখাপড়া শেখাবার চিন্তাভাবনা এসেছে এবং তার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। এইভাবে আমাদের ঈশান ঠাকুর পাড়া থেকে বড় মামার ছেলে সতীশদা, মেজো মামার ছেলে ত্রিবেণীদা, বড় মাসির ছেলে ব্রজেন্দ্রদা এলেন আগরতলায় বোর্ডিং-এ থেকে লেখাপড়া শেখার জন্য। শুনেছি কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েই তারা ঘরে ফিরে যান বিয়ে সাদি করে ঘর সংসার করার জন্য।

তাদের ফিরে যাবার চার-পাঁচ বছর পর আমরা এলাম (১৯৩৯ ইং) আগরতলায় পড়তে। উজান ঘনিয়ামারা থেকে মামা অশ্বিনী, পেকুয়ারজলা থেকে ওয়াখিরায় ঠাকুরের নাতি খগেন্দ্র, আমাদের পাড়া থেকে দেবেন্দ্র, রমেশদা ও আমি। রমেশদা ও আমার আসার একবছর আগেই তিনজন পড়ুয়া এসেছিলেন। বর্তমান হকার্স কর্নারের দক্ষিণের পুকুরের পশ্চিম পাড় থেকে বোর্ডিং বর্তমান উমাকান্ত একাডেমি সংলগ্ন ট্রাইবেল বোর্ডিং হাউসের জায়গায় চলে এসেছিল।

সতীশদা ও ব্রজেন্দ্রদার সমসাময়িক কালেই সুধন্বাদা সুতারমুড়া থেকে, সুরেশ লালসিংমুড়া থেকে, ললিত, হরেন্দ্র, ব্রজলাল ও যোগেন্দ্ররা ধরিয়াথল থেকে বোর্ডিং-এ

আসেন উমাকান্ত একাডেমিতে পড়তে।

খোয়াই থেকে দশরথদা এবং দ্বারিক আসেন একই জায়গায়; সদর পূর্বাঞ্চল থেকে আসেন হেমন্ত, জগবন্ধু, বগলা, চিত্তরঞ্জন, রামচন্দ্র ও সদর উত্তরাঞ্চল থেকে আসেন তারামোহন ও সুরেন্দ্র প্রমুখ।

ত্রিপুরা বোর্ডিং-এ থেকে তখন ম্যাট্রিক পাশ করে গেছেন গয়াচরণ, সুরেশ, দশরথ ও সুধন্বা। সুরেন্দ্র ও খগেন্দ্র তাঁদের পরের ব্যাচে পাশ করেন, আর অনেকেই ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত পড়ে ঘরে ফিরে গেছেন।

লাঠিয়াছড়া থেকে অঘোর আগরতলায় আত্মীয় বাড়িতে থেকে উমাকান্তে পড়তেন, পরে বোর্ডিং-এ চলে আসেন। '৪৭ সালে আমরা দু'জনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই।

সদরের পাহাড়ি সমাজে তখন লেখাপড়া করার একটা স্পৃহা দেখা দিয়েছে, বোঝা যায় যাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা কিছুটা সচ্ছল তারাই পড়ার, পড়াবার আগ্রহ দেখিয়েছে। আমাদের যাদের অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না, তারা এসেছেন রাজার দেয়া স্টাইপেন্ডের আশায়। যারা বরাবর পাশ করে গেছেন তারাই স্টাইপেন্ড পেতেন।

১৯৪৫ সালে (তখন অঘোর ও আমি ক্লাশ টেনের ছাত্র) আমরা ক'জন মিলে জনশিক্ষা সমিতি গড়ে যখন পাহাড়ি এলাকায় পাঠশালা প্রতিষ্ঠা শুরু করলাম, তখন যারা আগরতলায় আসতে অক্ষম তারা ওইগুলোকে লুফে নিলো। স্থির জলে যেন ঢিল পড়ল। এতদিনের ঘুমন্ত অন্ধকার নিরক্ষর পাহাড়ি সমাজে একটা উজ্জ্বল আলো যেন জ্বলে উঠল। সবাই যেন এতদিন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। শিক্ষার আন্দোলন যত না দেখা গেল আলোড়ন হয়েছিল তার দ্বিগুণ। দু'একটা পরিবার ছাড়া সবইকেই জুমে ও জমিতে খাটতে হয়। আদিম যন্ত্র দা, টাক্কাল ও কাস্তে দিয়েই গতরের শ্রম দিয়ে সকলের জীবিকার্জন। মা, বাবা, বড় ভাই, বোন খাটতে গেলে বাকি যারা একটু বড় তাদের মহিষ চরাতে জঙ্গলে যেতে হয়, পরের ছোটো যারা আরা ছোটো ছোটো ভাই বোনদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। উঠানে ধান শুকাতে দিলে হাঁস, মুরগি, তাড়াতে হয়, তাদের কারোর পড়ার বা স্কুলে যাওয়ার সময় হয় না। কাজেই গাঁয়ে ৮০/৯০ জন স্কুলে যাবার উপযুক্ত ছেলেমেয়ে থাকলে দশ পনেরজন স্কুলে যেত। হাতে শ্লেট, মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবিওয়ালা বাল্যশিক্ষা বই আর পেনসিল নিয়ে যাওয়া আসা।

জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার সময় যাঁদের দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় আনতে পেরেছিলাম তাঁদের মধ্যে সুধন্বাদা ছিলেন কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। দশরথদা ছিলেন দ্বিতীয় বয়োজ্যেষ্ঠ। কাজেই সুধন্বাদা হলেন সভাপতি, দশরথদা সহ-সভাপতি, হেমন্ত সম্পাদক, অঘোর কার্যকরী সম্পাদক।

সমিতি গঠিত হওয়ার পর দশরথদা আবার হবিগঞ্জের বৃন্দাবন চক্র কলেজে

বি এ পড়া শেষ করতে চলে যান এবং সুধন্বাদাও শ্রীকাইল কলেজে আবার পড়তে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এর মধ্যে মহারাজা বীরবিক্রমের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি পেয়ে গেলাম। সুধন্বাদা, হেমন্ত, অঘোর ও আমি মহারাজার সঙ্গে দেখা করে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্য আর্জি জানালাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর তখন ভি. এ. ডব্লিউ ব্রাউন (একজন ইংরেজ) রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। মহারাজ তাঁকে আমাদের আবেদনের বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা দেখতে বললেন। বর্তমান দু'নম্বর এম এল এ হস্টেলের মেইন অংশটা তৈরি করিয়ে ব্রাউন সাহেব সেখানে থাকতেন এবং প্রায় প্রতিদিন বিকালে উমাকান্ত মাঠে এসে আমাদের সাথে ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন খেলতেন। তিনি আমাদের অপরিচিত ছিলেন না। তাঁরই সুপারিশে আমরা মহারাজের অনুদান পেয়ে গেলাম, এবং '৪৬ সালের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশরও বেশি পাঠশালা গড়ে তুললাম।

এরপর '৪৭ সালে আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই। সেই সালেই মে মাসে বীরবিক্রমের প্রয়াণ। আগস্ট মাসে ভারতের স্বাধীনতা লাভ, কেন্দ্রে কংগ্রেসের ক্ষমতা লাভ এবং রাজ্যে দেওয়ানি শাসন ও পরে অ্যাডভাইসারি শাসন। এরপর '৪৮/৪৯ সালে জনশিক্ষা সমিতির কর্মীদের উপর সরকারের নজরদারি এবং কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে তাঁদের অনেকের উপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি শুরু হল।

দশরথদা কলকাতায় এম এ (ল) পড়া ছেড়ে দিয়ে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য পাহাড়ে এসে আত্মগোপন করেন এবং সুধন্বাদা চাকুরি ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হন। অঘোর, হেমন্ত ও অন্যান্য কর্মীরাও আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হন। '৪৮ সালের মে মাসে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ, একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে গড়ে ওঠে। পরে তা গণমুক্তি পরিষদে পরিণত হয়। তখনো পর্যন্ত দশরথ, সুধন্বারা কেউই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেননি। শুধু সরকারের পুলিশের চোখে তারা কমিউনিস্ট বলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পরে '৪৯-'৫০ সালে তারা সকলে এক যোগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

'৪৬/'৪৭ সালে জনশিক্ষা সমিতির পাঠশালাসমূহ প্রতিষ্ঠার পর সমিতির কর্মীদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। যে সব রাস্তাঘাট বা পাড়া দিয়ে আমরা চলাফেরা করতম আমাদের দেখবার জন্য পাড়ার লোকজন উৎসুক হয়ে থাকতেন। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আমাদের থাকার জন্য এবং যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ থাকত। সব বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমাদের সম্ভব ছিল না। সেজন্য অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হতেন। আমাদের চলাফেরা গতিবিধি লোকের নখদর্পণে থাকত। জেট প্লেন চলে গেলে আকাশের বুকে যেমন একটা সাদা ধোঁয়ার রেখা তৈরি হয়, আমাদের চলার পথেও তেমনি রেখা তৈরি হতো।

আমাদের অনুরোধ, উপদেশ লোকে মাথা পেতে নিতে শুরু করলো। সরকার আমাদের জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারলো না। তিতুন প্রথা, মহাজনের দাদন প্রথা, ৪/৫ বৎসর ঘর জামাই প্রথা, সমাজে মদের অত্যধিক প্রচলন আমাদের কাছে অন্যায় এবং খারাপ বলে মনে হয়েছিল। বিনা পারিশ্রমিকে তিতুন এবং অভাব ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সংবৎসরের শ্রমের ফসল নামমাত্র দাদন দিয়ে মহাজনরা নিয়ে নিতেন এবং পুনরায় নামমাত্র দাদন দিয়ে একজনের সারাবছরের শ্রমে মূল্যবান ফসল কিনে নিতেন এবং বছরের পর বছর সে ঋণের ভারে নিমজ্জিত থাকত। এটা আমাদের কাছে অন্যায় বলে মনে হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। দাদনের হার ঠিক করে দেওয়া এবং ধর্মের গোলা তৈরির চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল।

এতদিনের প্রচলিত এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রথা ভেঙে এরা যে সমাজে বিপ্লব নিয়ে আসবে! এদের এক্ষুনি শেষ করো। এরা কমিউনিস্ট। এদের ধরে এনে জেলে পোরো। পুলিশ লেলিয়ে দিলেন সমগ্র এলাকায়। নিরীহ মানুষদের ধরে এনে মারধর করা হলো, নেতাদের না পেয়ে এলাকায় এলাকায় ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। শেষে সমগ্র খোয়াই এলাকাকে উপদ্রুত ঘোষণা করে সরকার মিলিটারি নামিয়ে দিলেন। ফলশ্রুতি — মধুতি, রূপশ্রী ও কুমারীর আত্মদান করে শহিদ হওয়া মিলিটারির গুলিতে।

নেতারা সব জনতার মাঝখানে হারিয়ে গেলেন। একজায়গায় একত্রে থাকা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হলো না। আজকে যেখানে আছেন পরের দিন অন্য জায়গায় তাঁদের চলে যেতে হতো। পুলিশ-মিলিটারি সকল পাহাড়িদের টাকার বিনিময়ে গুপ্তচর বা ইনফরমার নিযুক্ত করলো।

যেখানে নেতা বা নেতারা থাকতেন সেখানে চারদিকে পাহারাদার থাকতো। উঁচু - গাছের উপর উঠে পালা করে সারাদিন পুলিশ মিলিটারির গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা হতো। দূরে কোন অপরিচিত লোক দেখা গেলে তাকে নিয়ে এসে ভালোভাবে তার আগমনের উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে তাকে ছাড়া হতো।

নেতারা একত্রে থাকতে না পেরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য ছদ্মনাম নেওয়া হলো, দশরথদা হলেন লাম্প্রা, সুধন্বাদা হলেন গং, অঘোর হলেন থিচ্‌লাং।

চারদিকে পুলিশ ও পুলিশের লোকে পাহাড় ছেয়ে গেছে। গুপ্তচর আর টিকটিকি পেছনে রয়েছে। কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। এক্ষুনি খেয়ে এক্ষুনি চলা, এক জায়গায় ঘুমিয়ে অন্য জায়গায় প্রাতরাশ। এভাবে আর কতদিন থাকা যায়! এর বিহিত করতে হবে।

আস্তে আস্তে প্রতিরোধের জন্য একটা ভীষণ নিয়ম নীতির মধ্যে একটা বাহিনী

গড়ে তোলা হলো। যার নাম শান্তি সেনা।

আজ এখানে, কাল অন্যখানে। লোকে বলতে শুরু করল এঁদের উপর দেবতার আশীর্বাদ রয়েছে। তা না হলে দশরথ আজই জম্পুইজলা থেকে এসেই কী করে খোয়াই অবস্থান করছিলেন। এঁরা তা হলে মন্ত্র জানেন!

একবার অনেকদিন পর সুধন্বাদা সুতারমুড়ার বাড়িতে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে খবর গেল, পুলিশ এসে হাজির হওয়ার উপক্রম। যারা পাহারায় ছিলেন দৌড়ে এসে খবর দিলেন। পুলিশ এসে পড়ল বলে। সুধন্বাদা আর কী করেন, বুদ্ধি করে তৎক্ষণাৎ মাথায় গামছা (রিতুকু) পরলেন মেয়েরা যেভাবে পড়ে সেভাবে। বুকে রিয়া, কোমরে রিগনাছ, খালি কলসি ভরে তিমিং মাথায় এবং তার উপরে আর একটা খালি কলসি নিয়ে, মেয়ে সেজে পুলিশের সামনে দিয়েই কুয়োর দিকে এগিয়ে গেলেন। পুলিশ না কি বুঝতেই পারেনি। সুধন্বাদা অনেক দূরে জঙ্গলে চলে গেছেন তারপরই পুলিশ বুঝলো, পরান পাখি — উড়ে গেছে। এভাবে পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া একবারই সম্ভব হয়, বারে বারে হয় না। এর জন্য যে-সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দরকার, তাও সকলের থাকে না। এগুলি সত্যি গল্প এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

গুপ্তচর বা টিকটিকিরা চারদিকে তক্কে তক্কে থাকে ও কারো খবর পেলেই পুলিশের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাদের কাজ। গুপ্তচরের উপরও গুপ্তচর থাকে। কে পুলিশের লোক কে পুলিশের লোক নয় এটা প্রায় সবার জানা হয়ে যায়। তথাপি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়ানো মাঝে মাঝে সত্যি দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

সুতারমুড়ারই আর এক ঘটনা। সুধন্বাদা ওইদিকে আবার এসেছেন, রাস্তার মধ্যিখানে টিকটিকির সঙ্গে মুখোমুখি। সুধন্বাদা পেরিয়ে গেলেন এবং তক্ষুনি লোক পাঠালেন গুপ্তচরকে ডেকে আনার জন্য। সবাই মিলে ঠিক করা হলো গুপ্তচরকে আটকে রাখতে হবে যাতে বাজারে গিয়ে কাউকে খবর দিতে না পারে। গুপ্তচরটি এলে বলা হলো তুমি তো খুব ভাল রান্না করতে পারো, কাজেই আজকে তুমি খাঁচায় রাখা মোরগটি কেটে একটু রান্না করো, সবাই মিলে তোমার হাতের রান্না খাবো। বেচারি কেঁই-কাঁই করলো, 'আমার একটু কাজ ছিল বাজারের দিকে। আমি একটু যাই, এক্ষুনি এসে রান্না করবো।' 'না না, দেরী হয়ে যাবে বাজারে তুমি অন্য সময় যেয়ো, এখন তাড়াতাড়ি মোরগ কেটে রাঁধো।' সে কী আর করে, রান্নাবান্না করে সবাই মিলে খাওয়ার পর তাকে এবং আরেকজন লোককে বলা হলো সুধন্বাদাকে একটু এগিয়ে দেওয়ার জন্য। কিছু দূর গিয়ে সুধন্বাদা লোকটাকে বোঝালেন, 'দেখো, আমরা তো কোন খারাপ কাজ করছি না, দেশের জন্য সমাজের উপকারের জন্য আমরা কাজ করছি। কিন্তু সরকারের পুলিশ আমাদের ধরে জেলে নিতে চায়। কে অন্যায় কাজ করছে?' লোকটি বলে, 'পুলিশ!' 'তা হলে তুমি কেন

পুলিশকে সাহায্য করছ? আমরা সবাই জানি, তুমি পুলিশের গুপ্তচর। গুপ্তচরদের কী শাস্তি হওয়া উচিত তুমি তা জান।' তখন লোকটা সুধন্বাদার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল, 'আমি বুঝতে পারিনি, আমাকে মাফ করুন।' মৃত মা-বাবার নামে শপথ নিয়ে লোকটা গুপ্তচরবৃত্তি ছেড়ে দেয়। পরে শুনেছি সেই লোকটা সুধন্বাদার বড় ভক্তদের একজন হয়ে গিয়েছিল।

সুধন্বাদারই আর একটা ঘটনা। সুধন্বাদা জুমের টংঘরে থাকেন, দরকার বুঝে বনের ভেতর লুকোন। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী ঘরে রান্না করে কলাপাতায় ভাত মুড়ে, বাঁশের চোঙায় গোদক ও তরকারি নিয়ে স্বামীর জন্য খাবার পৌঁছে দেন। বাঁশের চোঙায় জলও দিতে হয়।

একদিন বনের রাস্তায় পুলিশ দলের মুখোমুখি হলেন। পুলিশের বড় কনস্টেবল জিজ্ঞেস করলেন, 'কার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছ?' সুধন্বাদার স্ত্রী বললেন, 'বোনারির জন্য।' মানে বান্ধবীর জন্য। 'সে কোথায়?' 'জুমে'। 'চলো আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।' স্ত্রী দেখলেন মহাবিপদ, এবার নির্ঘাত ধরিয়ে দিতে হবে, আর কোন উপায় নেই। তিনি চলেছেন পুলিশ পার্টিও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। একবার ভাবলেন অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবেন কিন্তু কোন দিকে? এমন সময় তিনজন মহিলা জুমের দিক থেকে আসছে দেখতে পেলেন। একটু এগিয়ে একজন সমবয়সী মহিলাকে বললেন, 'খারে,খারে, (বান্ধবী, বান্ধবী) আমি তো তোমার জন্যই ভাতের মোচা নিয়ে যাচ্ছি, তুমি চলে এলে কেন?' মহিলা পুলিশ দলকে দেখে বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটা। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো, 'নারে, আমার শরীর ভাল নয়, সেজন্য ফিরে এসেছি। চলো, ভাতের মোচা ফিরিয়ে নিয়ে চলো, ঘরেই খাব। তোমার আর যেতে হবে না, জুমের দিকে এখন আর কেউ নেই, এদিকে আর যেয়ো না।' কাজেই সবাই ঘরের দিকে ফিরে এলো। সুধন্বাদাকেও পুলিশ সে-যাত্রায় আর খুঁজে পেলো না। পুলিশ সন্দেহ করলেও বুদ্ধির লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলো।

কিন্তু পুলিশ বলে কথা, তারা নাছোড়বান্দা। গুপ্তচর তাদের খবর দিয়েছে যে সুধন্বাদা এ-এলাকাতেই লুকিয়ে আছেন, তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, সে খুব বিশ্বস্ত টিকটিকি।

পুলিশের দল বাজারের দিকে চলে গেল কিন্তু সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে চুপিসারে আবার ফিরে এসেছিল। সুধন্বাদাও দুপুরের খাবার না পেয়ে এবং কোন খবরাখবর না পেয়ে একা সূর্যাস্তের পর ঘরের দিকে এক পা এক পা করে চলে এসেছিলেন।

এসে ভাত খেতে খেতে সব খবর জানলেন, খাওয়া তখনও শেষ হয়নি এমন সময় উঠোনোর দিকে শব্দ পেলেন, পুলিশ এসেছে। তিনি পিছনের দরজা দিয়ে এক লাফে বেরিয়ে খড়ের গাদায় গিয়ে লুকোলেন। একদম নিশ্চুপ। একজন পুলিশ নাকি

খড়ের গাদায় বেয়নেট দিয়ে খোঁচা দিয়েছিল এবং তা নাকি সুধন্বাদার শরীরের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলো। ভাগ্যিস ভগবানের দয়ায় সে যাত্রায় তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে — কাউকে না পেয়ে পুলিশও ফিরে গিয়েছিল। গল্পের মত এসব ঘটনার সংখ্যা অনেক, সবগুলো সংগ্রহ করতে গেলে বই হয়ে যাবে।

আত্মগোপন করে থাকা, প্রতিদিন পালিয়ে বেড়ানো, পুলিশের এবং তাদের গুপ্তচরদের ফাঁকি দিয়ে দিনযাপন, রাত কাটানো, নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া — এর একটা বিহিত করা দরকার। সেজন্য ঠিক হলো পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলে হবে, সেজন্যই আস্তে আস্তে শান্তিসেনা গড়ে উঠল। ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলস তখন ডিসব্যান্ডেড হয়ে গেছে, তাঁদের কয়েকজনকে ট্রেনিং-এর ভার দিয়ে এ বাহিনী গঠিত হলো। এভাবেই গণমুক্তি পরিষদের সদস্যরা অচিরেই পুলিশের মোকাবিলায় সক্ষম হলো। ছোটো ছোটো পুলিশ দলের গ্রামে গ্রামে অপারেশন এবং অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল। ত্রিপুরার অভ্যন্তরে তখন গণমুক্তি পরিষদের সমান্তরাল শাসন কায়েম হয়ে গিয়েছিলো। দাদনের রেট ঠিক করে দেওয়া হলো, গরিবদের ধর্মের গোলা থেকে ধান নিয়ে সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা হলো, সরকারের কাছে বকেয়া খাজনা দেওয়া মকুব করে দেওয়া হয়েছিল। ঘর জামাই প্রথার সময় কমিয়ে এক বছর করা হলো। সমাজের মদের প্রচলন অনেক কমানো গিয়েছিল। তিতুন প্রথা বাতিল করা হলো। গুপ্তচর বা টিকটিকিদের হুঁশিয়ার করা হলো এবং যাদের শোষণ করা যায়নি, তাদেরও কাজকর্ম কমে গিয়েছিল। এতসব অসামান্য ঝুঁকিপূর্ণ সাহসিক কাজের অংশীদার ছিলেন তখনকার সব নেতা এবং কর্মীরা।

আপাতদৃষ্টিতে সেই ভদ্র বিনয়ী সজ্জন সাধুসন্ততুল্য ব্যক্তিটার এই কর্মযজ্ঞে ভূমিকা ছিল ঝুঁকি এবং উত্তেজনাপূর্ণ।

তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত কর্মভার এবং তাঁর উপযুক্ত ভূমিকা পালনে কোনদিনই পিছিয়ে আসেননি। নিজের নিরাপত্তা, অস্তিত্ব বিপন্ন করে তিনি সেদিন এগিয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ — স্মৃতির মণিকাঞ্চন

১৯৭১ সাল। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের খবরে তখনকার দৈনিকগুলো পরিপূর্ণ থাকত। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদীয় নেতা আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেননি পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগের নেতারা। বরঞ্চ তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে জেলে বন্দি করে রেখেছিলেন। পরে অবশ্য এ-মামলা টিকেনি, শেখ মুজিবর রহমানকে ছেড়ে দিতে হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ মুজিবর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় ঘোষণা দেন — "এবারের সংগ্রাম — স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

এর প্রেক্ষাপট ছিল পূর্ব পাকিস্তানে বাংলার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সংস্কৃতি, গল্প কবিতা নাটক গান ইত্যাদিকে ধ্বংস করে সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য কায়েম করা। এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি কলোনিতে পরিণত করা।

পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের জনসাধারণ তা মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী মহল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তখন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল চার কোটিরও বেশি আর পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ২ কোটির মত। ৩১৩ আসনের পাকিস্তান জাতীয় সংসদে ১৬৭টি আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার কথা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা একটার পর একটা ছলে-বলে-কৌশলে তাঁকে সেই সুযোগ, সেই ক্ষমতা বা সম্মান থেকে বঞ্চিত রাখেন।

কাজেই যা হবার তাই হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে ফেটে পড়েন। সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, যুব-ছাত্র, বুদ্ধিজীবী মহল এমনকি ই পি আর, আনসার বাহিনীও এই বিদ্রোহে শামিল হন। এর ফলে উন্মত্ত খান সেনারা জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ পাকিস্তানী খান সেনাদের হাতে নিগৃহীত হন, নিহত হন, বহু বহু মা-বোন অত্যাচারিতা ও ধর্ষিতা হন।

পাকিস্তানী খান সেনাদের বর্বরোচিত অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রায় এক কোটির উপর মানুষ দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ

করেন। আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায়ও প্রায় ১৫ লক্ষ লোক আশ্রয়ের জন্য আসেন। তখন ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল ষোল লক্ষের মতো। যাঁরা ত্রিপুরায় আশ্রয়ের জন্য আসেন তাঁদের ত্রিপুরাবাসীরা অতিথি হিসাবে সম্মানের সঙ্গে সমাদরে গ্রহণ করেন। বহুলোক বিভিন্ন পরিবারের অতিথি, কেউবা নামমাত্র ভাড়া দিয়ে আগরতলা শহর এবং তার আশেপাশে শহরতলি এবং গ্রামগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেকে গাড়ি, টেলিভিশন, ফ্রিজ, রেডিও ইত্যাদিসহ চলে আসেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষকে শত শত বাঁশ ও ছনের লম্বা লম্বা অস্থায়ী ঘর তৈরি করে সারা রাজ্য জুড়ে আশ্রয় দেওয়া হয়। তাঁদের মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং খাওয়া খাদ্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে সরকারী এবং বে-সরকারী কর্মকর্তারা হিমসিম খেয়েছেন। স্যানিটেশন এবং রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়েছিল। তথাপি তেমন রোগ শোকের আবির্ভাব এবং বিস্তৃতি হতে পারেনি। পরে যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের হাসপাতালে রেখে সার্জিকেল চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে সার্জনরা, নার্সরা অমানুষিক পরিশ্রম করে সকলকে সেবা দিয়েছেন। জি বি হাসপাতাল তখন যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে পরিণত হয়েছিল।

মনে আছে আমি তখন টি বি ডিপার্টমেন্টের হেড। আমার কাজের জায়গা ভি এম হাসপাতাল চত্বরের চেস্ট ক্লিনিক। যেখানে টি বি রোগ নির্ণয়ের জন্য বুকের মিনিয়েচার এক্সরে হয়, বড় এক্সরে হয়, কফ, রক্ত, প্রস্রাব পরীক্ষার সব ব্যবস্থা আছে এবং সেগুলো করাও হয়। Mantorex test করা হয়, যেটা গ্ল্যান্ড টি. বি., চোখের টি. বি., চর্মরোগের টি. বি.'র জন্য দরকার। রক্তের ই এম আর এবং অন্ত্র নাড়ীর রোগ নির্ণয়ের জন্য মল পরীক্ষা করে টি. বি.'র জার্ম অ্যাসিড-ফাস্ট-ব্যামিলাস আবিষ্কারের ব্যবস্থাটা শুধু নেই।

যা হোক, এপ্রিলের এক সকালে পাকিস্তান আর্মির এপারে চলে আসা এক লেডি ডাক্তার ক্যাপ্টেন নাজিরা বেগম এক জিপভর্তি বাঙালি জোয়ান নিয়ে আমাদের চেস্ট ক্লিনিকে এলেন। তিনি এসে আমার চেম্বারে নিজের পরিচয় দিলে বললেন — এই ৮/৯ জন রোগী নিয়ে তিনি জি বি হাসপাতালে গিয়েছিলেন, ওখানকার আউটডোরের ডাক্তাররা তাদের পরীক্ষা করে তাদের বুকের এক্সরে করার জন্য ক্লিনিকে রেফার করে দিয়েছেন। আমরা তক্ষুনি তাদের সবাইকে এনে নামধাম লিখে বুকের এক্সরে করে বলে দিলাম পরের দিন সকালে আসতে। পরের দিন এক্সরে ফলাফল দেখে যাদের বুকে যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়েছে তাদের যথারীতি যথোপযুক্ত ওষুধ পত্র দিয়ে দিলাম। কীভাবে, কতদিনে ওষুধও খেতে হবে — তাও তাদের একে একে বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

এরপর থেকে প্রতিদিন ওয়ার্কিং দিনগুলিতে এই লেডি ডাক্তার রোগী নিয়ে আউটডোরে আসতেন এবং দু'তিন জনের বুকের এক্সরে করিয়ে দরকার মত ওষুধপত্রও

নিয়ে যেতেন। ওঁদের এক গোপন হাসপাতাল ছিল হাবুল ব্যানার্জির বাগানের অভ্যন্তরে। তখন সে-জায়গাটা গাছ-গাছালিতে ভর্তি বনজঙ্গলই ছিল বলা যায়। সেখানে জয়বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের একশত শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ছিল। একদিন এই লেডি ডাক্তার এবং আমাদের ডা. অবনী মজুমদার (মেডিসিন স্পেশালিস্ট) আমাদের চেস্ট ক্লিনিকে এসে বললেন — আমাকে এক্ষুনি একটু দূরে এক রোগী দেখতে যেতে হবে। বাসায় গিয়ে কিছু খেয়ে নেব বললাম, ওঁরা বললেন খুব ইমার্জেন্সি কেস, আর খাওয়ার জন্য চিন্তা নেই, সেখানেও পাওয়া যাবে, আর দেরী করা যাবে না, এক্ষুনি গাড়িতে উঠুন। তাঁদের কথামত গাড়িতে উঠলাম, তখনো আমি জানতাম না হাবুল ব্যানার্জির বাগানে তাঁদের হাসপাতাল আছে। গাড়ি চলল দক্ষিণ দিকে বটতলা দিয়ে, সেকেরকোট, বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ পেরিয়ে হাবুল ব্যানার্জির বাগানে পৌঁছে গাড়ি ডানদিকে মোড় নিল। তার কিছুদূর গিয়েই একটা ঝকঝকে তাঁবুর ভেতরে দেখলাম, রাজপুত্রের মতন দেখতে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের এক সুন্দর যুবক শুয়ে আছেন। ক্যাম্প খাটের পাশে নিচে এক এনামেলের পাত্রে জল এবং সেই জলে চাকা চাকা রক্তের দলা। জলে রক্তে Bowl-এর অর্ধেকটা ভর্তি, দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। যুবক দেখলাম খুব নার্ভাস হয়ে আছেন, এ-সময়ে কিছু করার নেই। কারণ ফুসফুসে রক্ত আসা বন্ধ করার কোন সহজ পন্থা নেই। আপনি স্টিচ করে কিংবা ব্যান্ডেজ করে রক্ত আসা বন্ধ করার কোন সুবিধে পাবেন না। আর মনের উদ্বেগ বাড়লে রক্তচাপ বাড়বে এবং রক্তক্ষরণ বাড়তে পারে।

আমি প্রথমেই বিছানার কাছে গিয়ে রোগীর নাড়ীর গতি দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে রক্তে আধা ভর্তি পাত্রকে পরিষ্কার করে আনতে বললাম। কারণ ওই রক্ত দেখে-দেখেই তিনি আরও নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিলেন। পাত্র পরিষ্কার করে আনার পর সেখানে কিছু ছাই ফেলে দিতে বললাম, ছাই-এর মধ্যে ওঁকে কফ ফেলতে বললাম। ছাই-এর মধ্যে রক্ত তেমন দেখা গেল না। বললাম, এইটুকু রক্ত গেলে কারো কিছু ক্ষতি হয় না, আপনারও কিছু হবে না। মনে হলো কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। রক্তের চাপ দেখলাম অস্বাভাবিক উঁচু, ডাঃ মজুমদারও দেখলেন। আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে রোগীকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম একটু বেশি আছে স্বাভাবিকের চাইতে। রাত্রে ঘুমোননি, একটু ঘুমোতে পারলে রক্তও বন্ধ হবে এবং প্রেসারও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। ব্লিডিং বন্ধ হলে কফ পরীক্ষা করিয়ে নেবেন এবং একটু সুস্থবোধ করলে রাতেই আগরতলা শহরে এনে বুকের একটা বড় এক্সরে করিয়ে নেবেন। কফ পরীক্ষা এবং বুকের এক্স রে দেখে চিকিৎসার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া যাবে। এই মুক্তিযোদ্ধার নাম মনে আসছে না। তিনি নাকি এই এলাকার সেক্টর কমান্ডার এবং ঢাকার নবাবের বংশধর। বারে বারে আশ্বাস দিয়ে কিছুটা আশ্বস্ত করে আমরা পাশের তাঁবুতে এলাম। চারদিক থেকে আমাদের আপ্যায়নের জন্য

ছড়োছড়ি পড়ে গিয়েছিল। আমরা চা খেলাম, মিষ্টিও খেয়েছিলাম মনে হয়, এক প্যাকেট বিলিতি সিগারেট দিলেন আমাকে, ভদ্রতা করে সেটা নিয়ে এসেছিলাম, যদিও সিগারেট আমি ক্বচিৎ খাই।

পরে এই সেক্টর কমান্ডারের বুকে টি বি হয়েছে এক্সরে-তে ধরা পড়েছিল এবং আমরা যথারীতি চিকিৎসা করে ভাল করে দিয়েছিলাম।

বড় র‍্যাঙ্কের (অফিসার) মুক্তিযোদ্ধাদের বুকের এক্স রে দেখবার জন্য লেডি ডাক্তার আমার ইন্দ্রনগরের বাড়িতেও যেতেন। কার্যোপলক্ষে শেষের দিকে তিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন দুপুরে, তিনি সিধাই-এর দিকে যাবেন, বললেন, আমি এবং আমার ড্রাইভার ভাই আপনাদের কোন অসুবিধে না হলে এখানেই ভাত খেয়ে যাবো। আমরাতো সোনার চাঁদ হাতে পেলাম। কিন্তু তেমন তরিতরকারি কি আছে? দুপুর পৌনে একটা তখন, টুকটাক মাছ, ডাল তরিতরকারি আছে, তাই দিয়েই খাইয়ে দিলাম। কথা দিলেন, পরে আবার একদিন এসে ভাল করে খেয়ে যাবেন। ক্যাপ্টেন সাহেবা বললেন, আমরা পরশুদিন রাত্রে জয়বাংলায় নেমে যাবো, সেদিন রাতেই খেয়ে যাবো। তবে আমাদের সঙ্গে চার-পাঁচজন সঙ্গী থাকবেন। আমরা বললাম, বেশ তাই হবে। সেদিন তিনটে দেশি মোরগ এনে কেটেকুটে ভাল করে রান্না করা হলো, সঙ্গে কালিখাসা চালের পোলাও। তাঁরা কথামতো এলেন সন্ধ্যের কিছু পরেই। আমরা বেশ পরিপাটি করে বড় বড় বাটিতে মাংস সাজিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসালাম এবং খেতে দিলাম। তিনি বললেন, দুঃখ করবেন না ভাইসাব, আমরা আপনাদের কাছে এসে যে, সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি, যে, আদর যত্ন সম্মান পেয়েছি, নিজের ভাইবোনেরাও এভাবে আমাদের আদর যত্ন করত কি না সন্দেহ। শুধু দোয়া করবেন, দেশের জন্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এবং আপানাদের আর্মির ভাইয়েরা যে-রক্ত দিয়েছেন, তা যেন সার্থক হয়। আপনাদের, বিশেষ করে ত্রিপুরার ভাইবোনদের আমরা কোনদিনই ভুলব না, ভুলতে পারব না। আমরা আপনাদের কথা জন্ম জন্ম ধরে মনে রাখব। রাতে জিপে করে তাঁরা চলে গেলেন, কোথায় কোনদিকে গেলেন, আমরা আর জানতে পারিনি। এরপর '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় উৎসব পালিত হলো, আমরা সপরিবারে ঢাকা ঘুরে এলাম।

আজ বাংলাদেশ তরতাজা যুবক। ২রা থেকে ৯ই ডিসেম্বর ২০০০ সাভারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গণস্বাস্থ্য সম্মেলনে আবার বাংলাদেশ এবং ঢাকা ঘুরে এলাম। স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে দেখলাম। নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের কথা তেমনভাবে জানেন না, জানার কথাও নয়। তবে এরা পুরোপুরি স্বাধীন দেশের মানুষ। এদের কোন হীনম্মন্যতা

নেই — এঁরা চলেন দৃপ্তভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। রেখা আখতার নামে ২৭ বছরের মুসলিম মহিলা ঢাকা থেকে টয়োটা ভ্যান চালিয়ে এসে আখাউড়া বর্ডার থেকে আমাদের নিয়ে যান, আমাদের মন্ত্রীদের আনা-নেয়া করেন। মনে হয় এই একটি দৃষ্টান্তই স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ চেনার পক্ষে যথেষ্ট।

স্বাধীন বাংলাদেশ দিনে দিনে আরও উন্নতি করুক, এই কামনা করি।

ইউরোপ ভ্রমণের ডায়ারি

এক.

বহুদিনের মনের সুপ্ত বাসনা সস্ত্রীক একবার ইউরোপ ঘুরে আসব। সস্ত্রীক এজন্য যে এর আগে একবার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ফেলোশিপ নিয়ে পূর্ব ইউরোপের চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্কসহ লন্ডন গিয়েছিলাম। সেটা স্টাডি ট্যুর এবং একা। একা একা বিদেশ-বিভুঁয়ে নতুন নতুন জায়গা, সুন্দর সুন্দর দৃশ্য এবং অপরিচিত মানুষের মধ্যে নিজেকে বড় বেশি একলা লেগেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল ঘরের মানুষকে সঙ্গে করে সেসব দৃশ্য এবং মানুষদের আবার দেখি। সেটা ছিল ১৯৭৮ সাল। তখন চেক রাজাধানী প্রাহাতে ছিলাম একমাস। শ্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিশ্লাভাতে ছিলাম একমাস। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ছিলাম পনেরোদিন, আর পনেরোদিন ছিলাম লন্ডনে।

ইউরোপিয়ানদের আচার ব্যবহার, তাদের খাদ্যাভ্যাস জীবনযাপন প্রণালী দেখবার মতো। ইউরোপের মাটি, আকাশ, আবহাওয়া, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, বনজঙ্গল সম্পূর্ণই ইউরোপের। চিন এবং ভারতীয় সভ্যতাকে ওরা শ্রদ্ধা করে। কারণ আমাদের সভ্যতা ইউরোপের তুলনায় অনেক প্রাচীন। যদিও আমাদের অগ্রগতি তাদের অগ্রগতির তুলনায় অনেক শ্লথ। তাদের যে আর্থিক এবং পার্থিব উন্নতি আমরা কল্পনাও করতে পারি না। মনে হয়েছে লোকসংখ্যার স্বল্পতা এবং প্রাকৃতিক আবহাওয়া তাদের উন্নতির মূলে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে তারা আরও ভালোভাবে আয়ত্ব করেছে এবং কাজে লাগিয়েছে। তাদের তুলনায় এ ব্যাপারে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে। ইউরোপ বেড়াবার মনের বাসনা নিয়ে খবরের কাগজ খুঁজি। ট্র্যাভেল এজেন্টদের, যেমন Cox & Kings, SITA ট্র্যাভেলস এবং SOTC-এর বিজ্ঞাপন। এর মধ্যে ডা. নেপাল ভৌমিক এবং ড. স্বপন সরকার সপরিবারে ইউরোপ ভ্রমণ করে এলেন, ওদের মুখে নানা খবরাখবর নিই। ওদের বয়স কম। আর আমরা বুড়াবুড়ি। আমরা কি পারব? গ্রুপ ট্র্যাভেলসের এত দৌড়াদৌড়ি ধকল সহ্য করতে? যাই হোক, চিঠি লিখে কলকাতা থেকে STOC-র একটা ব্রুসিওর আনালাম। আর টেলিফোনে কথা বললাম সত্তরোর্ধ্ব যাদের বয়েস মেডিক্লেম বা অন্যান্য বিমা করতে কত টাকা লাগবে। যার সঙ্গে কথা হল, তিনি বললেন, সন্ধান করে জানাবেন। কিন্তু তিনি আর জানাননি।

এর মধ্যে ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে পত্রিকায় খবর বেরোল আগরতলায় SOTC-র একটি অফিস খুলেছে। ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে জানা গেল অফিসটি পুরোনো আর এম এস-এর টেলিগ্রাম অফিসের লাগোয়া সাইবার কেফ-তে, শ্রী শান্তনু সাহা প্রেফারড এজেন্ট। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, ভদ্রলোক কমবয়েসি, স্মার্ট। বললেন, সব ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। কিছু কাগজপত্র দিলেন ফরম পূরণ করে জমা দিতে হবে। বললেন

— আরও কেউ যেতে চান — এমন সহযাত্রী পান কিনা দেখুন। পরিচিত কেউ থাকলে বিদেশ-বিভুঁয়ে অনেক ভরসা। ড. বিকাশ রায়কে বললাম। তিনি আমাকে একদিন শান্তনু সাহার অফিসে একসঙ্গে আলাপের জন্য বললেন। আলাপ হলে জানা গেল, ক্রুসিওর ও এস ওটিসি যে খরচ দেখিয়েছে তা মেইন ট্যুরের জন্য। এবং তা বম্বে এবং দিল্লি থেকে শুরু হবে। বাদবাকি আগরতলা থেকে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে বম্বে বা দিল্লির আসা যাওয়ার এয়ারফেয়ার ওরা দেবে না। আর দশদিনের মধ্যে ছটি দেশের কী দেখব? এই ছিল আমাদের প্রশ্ন। আমাদের বলা হল, লন্ডনে দুদিন আগে থাকার ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য লাগবে দুজনের জন্য আরও ছাব্বিশ হাজার টাকা, আর প্যারিসে আরও একটা রাত বাড়তি থাকার বন্দোবস্ত করা যায়, তার জন্য লাগবে দুজনের ষোল হাজার দু-শ টাকা। আমরা লন্ডনে দুদিন বাড়তি থাকার ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।

এখানে বলা যায় SOTC-এর আরও ট্যুর প্রোগ্রাম আছে। সেগুলো হচ্ছে একটি পনেরো দিনের, একটি সতেরো দিনের এবং অন্যটা কুড়ি দিনের। এগুলোর খরচ SOTC-এর ক্রুসিওর-এ দেওয়া আছে। ইচ্ছে এবং আর্থিক বিনিয়োগ করে এগুলো এভেইল করা যায়। দুজন এডাল্ট বুক করলে ১২ বছরের নিচে আরও একজন বিনা খরচে নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

ড. বিকাশ রায় মন ঠিক করতে পারছিলেন না। আমাদের আর দেরি করা চলে না। কারণ — এক বয়স বাড়ছে, তায় মিসেসের অসুস্থতা, তাই একদিন ত্রিশ হাজার টাকার ড্রাফট কেটে দশদিনের জন্য বাড়তি দুদিনের লন্ডনের জন্য বুক করে ফেললাম। বুকিং-এর সঙ্গে পাশপোর্ট এবং ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স স্টেটমেন্ট, আর আয়-ব্যায়ের হিসাব, আগে কী করতাম এখন কী করি ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো লাগে ইউকোতে এন্ট্রি পারমিট, বেলজিয়াম, জার্মানিতে এবং অন্যান্য ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতে ঢোকার জন্য ভিসার দরখাস্তের সঙ্গে। এগুলো হয়ে গেলে ওরা একটা ইনভয়েস পাঠান, তা হচ্ছে নিম্নরূপ — মেইন ট্যুর ১,৩৫,০০০, প্রিপ্যাকেজ ২৬,০০০, ভিসা ২৮,০০০, মেডিক্লেম ১০,৩৪৬, এয়ারপোর্ট ট্যাক্স ৮,০০০, গভঃ সার্ভিস ট্যাক্স ৭২০, এডিশনাল সার্ভিসচার্জেস ৬০০, এডুক্যাশন সেস ১৪, ফুয়েল সারচার্জ ৬২০০। যদি ২ মের মধ্যে সব টাকা দিই তবে, দশ হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দেবে। এই ডিসকাউন্ট ট্যুর শেষ করে এসে আমরা ফেরত পেয়েছি। দিল্লি থেকে ফেরার পথে আমরা কলকাতার SOTC অফিসে গিয়েছিলাম ওরা প্রসেস করে ডিমান্ড ড্রাফট পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভিসা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের পাসপোর্ট ফেরত পাওয়ার কথা। জানা গেল ২৪শে মে গিয়ে আমাদের নিজেদের যার যার পাসপোর্ট জার্মান কনস্যুলেট থেকে কালেক্ট করতে হবে। আমাদের দশদিনের ইউরোপিয়ান এক্সপেরিয়েন্স ট্যুরের মেইন গ্রুপ যাবে

৩১শে মে। আমাদের যেতে হবে দুইদিন আগে প্রিপ্যাকেজ অপশন্যাল ট্যুর লন্ডনের জন্য ২৯শে মে। আমরা বম্বে থেকে যাব না, যাব দিল্লি থেকে ছেলের সঙ্গে দেখা করে। ছেলে গুরগাঁওয়ে মারুতিতে কাজ করে। এয়ারপোর্টে আমাদেরকে রিসিভ করবে — এ ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। কাজেই রাতের ঘুম আর নেই। আমাদের বয়স হয়েছে, লন্ডনে ওয়েম্বলি প্লাজা হোটেলে আমাদের রুম বুক করা থাকবে, আমরা এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাকসি করে সেখানে চলে যাবো। যেমন তেমন ট্যাকসিতে উঠব না, উঠতে হবে ব্ল্যাক ট্যাকসিতে, ভাড়া একটু বেশি হতে পারে, পঁচিশ ছাব্বিশ পাউন্ড, তবে ওরা বিশ্বস্ত এবং নিরাপদ, ওরা আমাদের ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

দুদিনের অপশন্যাল লন্ডন প্যাকেজ ট্যুর, আমরা কী করব? SOTC বললেন কেন? আপনারা নিজেরা বাসে টিউবে বা ট্যাকসি করে লন্ডন শহর ঘুরে দেখবেন। পরে মেইন গ্রুপ গিয়ে পৌঁছলে তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। দুই বুড়াবুড়ির মহা দুঃশ্চিন্তা কোথায় হোটেল, কোথায় ট্যাকসি, কোথায় বাস, কোথায় টিউব। রাতে ঘুম নেই দুরু দুরু বুকে একলা দুজন।

STOC-এর শান্তনু খবর দিয়েছিলেন যে আগরতলা থেকে স্বপন নন্দীর মেয়ে এবং জামাই মে মাসের প্রথম দিকে ইউরোপ চলে গেছে। আমরা যাব ২৩ শে মে। ২৩শে মে আগরতলা থেকে রওয়ানা। কারণ ২৪শে মে কলকাতার জার্মান কনস্যুলেট আমাদের পাসপোর্ট ফেরত দেবে। ওরা আগেভাগে খবর দিতে পারেনি। সেজন্য আমরা আগরতলা-কলকাতা সেক্টরের এয়ার ফেয়ার সিনিয়র সিটিজেন হিসাবে কোনো কনসেসন পেলাম না।

জেট এয়ারওয়েজে গিয়ে প্রায় রাত ৮ টায় ত্রিপুরা ভবনে পৌঁছলাম। ২৪শে মে সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট করে প্রচণ্ড গরমে রাস্তায় বেরোলাম ন-টায়। একটুআধটু মেঘলা ছিল আকাশ, তবুও গরম আর ঘামের কমতি নেই। উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে মিসেসের জন্য হার্টের ওষুধ ট্যাবলেট কেনা। কাছে ওষুধের দোকান শীতল তখনও খোলেনি। কাজেই উজিয়ে থিয়েটার রোড ধরে পুবে এগোলাম। ক্যামাক স্ট্রিট পেরিয়ে এডিডাস-এর দোকানে এক জোড়া জুতো কিনতে হবে। কিন্তু এডিডাসও খোলেনি। কাজেই পুবে আরও এগিয়ে ভিয়েনে তাদের মিস্টি দই খেলাম। দই আগের মতন সুস্বাদু আর নেই। বললাম দোকানিকে, তিনি একটু হাসলেন। ওখানে অনেকক্ষন ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দই খাওয়া হল, উদ্দেশ্য সময় অতিবাহিত করা। ওখান থেকে বেরিয়ে এডিডাস-এর দোকানের পাশে আর এক দোকানের সিঁড়ি বসে রইলাম। সাড়ে ন-টায় এডিডাস খুলবে। এর মধ্যে টেলিফোন বুথে ঢুকে SOTC অফিসে ফোন করলাম। ওরা বলল ওদের অফিস খুলে গেছে, কাজেই আমরা এক্ষুনি যেতে পারি। শেষে এডিডাস খুললে মিসেসের জন্য ২৬৫০ টাকা দিয়ে

একটি হিল ছাড়া হালকা জুতো কেনা হল। এ জুতোর সোল এমনভাবে তৈরি, তা পিচ্ছিল বরফেও পিছলাবে না। আমরা আসলে বরফের দেশেই যাচ্ছি কিনা।

এরপর সকাল দশটায় কলকাতার শরৎ বোস রোডে SOTC-এর অফিসে গেলাম। ট্যাকসি নিল ৩০ টাকা। আমাদের আলিপুরে জার্মান কনস্যুলেট যেতে হবে বেলা দুটোর সময়। আমাদের বলা হল আপনারা SOTC-এর অমুককে পাবেন, এখন গিয়ে কোনও লাভ নেই। কারণ ওখানে ওয়েটিং-এর কোনও ব্যবস্থা নেই। ফিরে এলাম ত্রিপুরা ভবনে। ১টার সময় লাঞ্চ সেরে ঠিক পৌনে দুটোয় ট্যাকসি নিয়ে অনেক কষ্টে কনস্যুলেট খুঁজে পেলাম। চারদিকে কংক্রিটের উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বিরাট ফটক, ফটকের এক পাশে ছোট্ট একটা দরজা। বাইরে থেকে দরজা খোলার কোনো ব্যবস্থা নেই। ভেতর থেকে খুললে তবে ভেতরে ঢোকা সম্ভব। চারদিকে নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র বলয়, বুলেট প্রুফ কাচে ঘেরা ঘর, ভেতরে বাইরে গেল খুলে আমাদের ঢোকানো হল। আমাদের বলা হল সব জিনিসপত্র রেখে, ঘড়ি খুলে টাকার ব্যাগ রেখে যেতে হবে।

আমাদের ইতস্তত অবস্থা দেখে এক বয়স্ক পোড় খাওয়া সিকিউরিটি অফিসার হেসে ফেললেন, সকলে রেখে যায়, আপনারা জিনিস খোয়াবেন না। নিশ্চিন্তে রেখে যেতে পারেন। অগত্যা সব ব্যাগ এ্যাটাচি রেখে উঠোন পেরিয়ে মেইন বিল্ডিংয়ে গেলাম। ওখানে একটা রুমে অনেক লোকজন দেখলাম। এক ভদ্রলোক SOTC-এর আমাদের এক আধখোলা কাউন্টারের কাছে নিয়ে দেখালেন, কাগজপত্রের সঙ্গে আমাদের পাসপোর্টও দেখলাম। কাউন্টারের ভেতরের জার্মান ভদ্রলোক আমাদের দেখে বললেন, ঠিক আছে। আমরা ফেরত চলে এলাম। SOTC-এর ভদ্রলোক বললেন আবার শরৎ বোস রোডের SOTC অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করতে, তিনি অফিসে এসে আমাদের পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র দেবেন। গেটের সিকিউরিটি রুমে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে সই দিয়ে চলে আসছিলাম, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন আমরা বাংলাদেশের চিটাগাঙ-এর কিনা। বললাম, আমরা ত্রিপুরার, আগরতলার। তিনি চিটাগাঙের চাকমা সম্প্রদায়ের লোক। চেহারা দেখে মনে করেছিলেন আমরাও বুঝি চিটাগাঙের ট্রাইবেল। জার্মান কনস্যুলেট থেকে বেরিয়ে আমরা আবার SOTC-এর অফিসে এলাম। তখন বেলা সাড়ে তিনটা হবে। অফিসে আমাদের চা খাওয়াল। তখন অফিসের সকলে চা খাচ্ছিল। পরে ভদ্রলোক এলেন। আমাদের পাসপোর্ট ফেরত দিলেন। এয়ার টিকিট দিলেন এবং SOTC-এর লাল স্কাই ব্যাগ দিলেন। সেই ব্যাগ আমাদের খুব সাহায্যে এসেছে। এটা দেখেই আমরা এয়ারপোর্ট ও অন্যান্য জায়গায় আমাদের সহযাত্রীদের চিনতে পারতাম। এরপর ট্র্যাভেলম্যাট বলে একটি কিউবিক্যাল ফরেন এক্সচেঞ্জের জন্য গেলাম। কিছু ইউরো কিছু পাউন্ড

স্টার্লিং নেওয়া হল, কিছু ইউ এস ডলারও নিতে চেয়েছিলাম। ওরা বলল, ক্যাশ দিয়ে আমাদের কারেন্সি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি ফোরেক্স নেওয়া যাবে না। এই নিয়ম এমনি আজকাল বিদেশি ভ্রমণে গেল দশ হাজার ইউ এস ডলার মূল্যের ফোরেক্স নেওয়া যায়। কিন্তু তা নিতে হবে চেক দিয়ে। আমরাতো চেক বই নিইনি। ঠিক আছে, পরের দিন আমরা দিল্লিতে ছেলের কাছে যাব, ছেলেকে ক্যাশ দেবো। ছেলে চেক দিয়ে আর ফোরেক্স কিনে দেবে। কাজেই আমরা SOTC অফিস ছেড়ে চলে এলাম। SOTC-এর ট্র্যাভেলম্যাট ইউনিটের ইনচার্জের সঙ্গে আলাপে জানা গেল, তিনি আমাদের ভায়রা। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ত্রিপুরার চিফ ইঞ্জিনিয়ার কাম পি ডব্লিউ ডি-র সেক্রেটারি নীহার সিংহ-র ভ্রাতুষ্পুত্র। একেবারে আত্মীয় হিসাবে পেয়ে গেলাম। তিনি জানতে চাইছিলেন, আমরা কোত্থেকে গেছি। আগরতলা বলাতে, তিনি বললেন, আগরতলায় তার এক কাকা চাকরি করতেন। বর্তমানে বাগুইহাটিতে আছেন। নাম বলতে আমরা আত্মীয় বনে গেলাম। নীহার সিংহ আমার স্ত্রী করবী দেববর্মার বোন মালবিকার স্বামী।

দুই.

পরের দিন ২৫ মে সকালে ব্রেকফাস্ট শেষে গোছগাছ করে রওনা দিলাম দিল্লির উদ্দেশে। পাসপোর্ট এবং দিল্লি থেকে লন্ডনের এয়ার টিকিট কোটের পকেটে রাখলাম। যাতে না হারায় খুব সাবধানে রেখে দেওয়া হল। এর মধ্যে বন্ধুদের কথামতো পাসপোর্টের কয়েকটি পৃষ্ঠা জেরক্স করে দু-তিন জায়গায় রেখে দিয়েছি। মেইন পাসপোর্ট হারিয়ে গেলেও যাতে ডুপ্লিকেট দেখিয়ে ওদেশ থেকে ফেরত আসতে পারি। ফিজিতে বড় মেয়ে আছে, ও তার মাকে ফোন করে বার-বার বলে দিয়েছে মা আর যাই কর পাসপোর্ট কিন্তু হারিও না। পাসপোর্ট হারালে তুমি আর ইউরোপ থেকে ফিরে আসতে পারবে না। ভয়েরই কথা। কাজেই পাসপোর্ট সবসময় হাতড়ে হাতড়ে দেখি পকেটে ঠিক আছে কিনা। টাকা পয়সার চাইতেও পাসপোর্ট বেশি জরুরি।

এয়ার ডেকানে ই-মেইল টিকিট কাটা, সেই ই-মেইল এয়ারপোর্টের এয়ার ডেকান অফিসে আই কার্ড দেখিয়ে টিকিটের এনডোর্স করানো হল। তারপর চেক ইন। টেক অফ ১০-২৫ মিঃ, গিয়ে পৌঁছাব ১২-২৫ মিঃ। ছেলে দিল্লি এয়ারপোর্টে অপেক্ষায় থাকবে। লাগেজ বেশি হয়ে গেছে। আনারস, ইচরের জন্য কাঁঠাল, কচুর লতি, করলা ইত্যাদি ছিল। ওরা ৬৪০ টাকা বারতি লাগেজের চার্জ নিয়ে নিল। এমনিতে এয়ার ফেয়ার প্রত্যেকের

জন্য কলকাতা-দিল্লি ৬১১১ টাকার মতন। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের তুলনায় খুবই কম। ওরা এয়ার ক্র্যাফটে কোনও টিফিন বা রিফ্রেশমেন্ট দেয় না, যদি কেউ কোনও সফ্‌ট ড্রিঙ্ক ইত্যাদি নিতে চায় তবে ডবল দাম দিয়ে কিনে নিতে হবে। ওরা বলে লোকে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য প্লেনে উঠে, চা খাওয়ার জন্য নয়। ওদের কর্মীও খুব সীমিত। এভাবে ওরা খুব লাভ করছে এবং দু-তিনটে এয়ার ক্র্যাফ্‌ট নিয়ে শুরু করে দু-তিন বছরে ২৫-৩০টা এয়ার ক্র্যাফ্‌ট কিনে ফেলেছে। দিল্লি গিয়ে ফোরেক্স নেওয়া গেল। ছেলের চেক দিয়ে আরও কিছু ইউরো এবং ইউ এ এস ডলার কেনা হল। কিছুটা ট্র্যাভেলার্স চেক, কিছুটা ক্যাশে। সেখানে আর এক কাণ্ড করলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা ইউ এস ডলার না নিয়ে কাউন্টারেই ফেলে চলে এলাম। বাইরে এলে ছেলে বলল, বাবা কিছু মুরগির মাংস কিনব চলো। আবার অনেকদূর হেঁটে সন্ধের ব্যস্ততম রাস্তা পেরিয়ে সেই ফোরেক্স অফিসেরই পাশ দিয়ে মাছ মাংসের দোকানে যেত হয়। আমাদের দেখে ফোরেক্স অফিসের একজন ভদ্রলোক দৌড়ে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন, আপনারা ডলারের ক্যাশ এক হাজার ডলার নিয়ে যাননি, এই নিন। আমরা হতভম্ব। ওরা যদি এভাবে এসে আমাদের ফোরেক্স না দিত, আমরা খুঁজে দেখতাম না, এবং এই ডলারও এভাবে হারিয়ে যেতে পারত। যা হোক এখনও সৎ লোকের অভাব নেই। আবারও প্রমাণ পেলাম।

এখন কাপড়চোপড় এবং স্যুটকেস গোছানো, ছেলের কথায় বড় স্যুটকেস বাদ দিলাম। বড় স্যুটকেস বয়ে বেড়ানো আমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে। বদলে ছেলে আরও একটা ছোটো স্যুটকেস দিল। মিসেস অনেক কষ্ট করে শাড়ির সংখ্যা কমালো। কিন্তু তবুও স্যুটকেসে জায়গা হয় না। কোট ঠিক হলো। হাতেই নেওয়া হবে। বর্ষাতি একটা নিতেই হয়, কারণ বন্ধুরা বলেছেন — বৃষ্টি পড়বেই ইউরোপে। দুটো স্যুটকেস, মিসেসের দুটো হ্যান্ডব্যাগ এবং আমার ১টি হ্যান্ডব্যাগে সমস্যার সুরাহা হল।

২৯শে মে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাত্র তিনটায় ছেলে এবং ছেলের বৌ আমাদের পৌঁছে দিল। আমার ট্রলি নিয়ে ব্যাগেজসুদ্ধু ভেতরে ঢুকলাম। ছেলে অনিন্দ্য এবং বৌ নীলাঞ্জনা কিছুক্ষণ বাইরে থেকে হাত নেড়ে ফিরে গেল। আমাদের টেক অব টাইম সকাল সাড়ে ছটায়। ব্যাগেজ একসময়ে মেসিন দিয়ে পার করে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে চেক ইন কাউন্টারে পৌঁছলাম। দেখলাম আমরাই সর্বপ্রথম প্যাসেঞ্জার। তখনও কাউন্টার খোলেনি। যাই হোক অবশেষে কাউন্টার খুলল। যেখানে আমরা দাঁড়ালাম সেখানে এক সর্দারজি কাউন্টারে এসে কম্পিউটার মেসিন ঠিক করতে পারছিল না। দেখলাম পাশের কাউন্টারে দুটো মেয়ে এসে টপাটপ চেক ইন করিয়ে দিচ্ছে। মিসেস বললেন, দেখলে আমরা সবার আগে এসেও পেছনে পড়ে গেলাম। সর্দারজি শেষ পর্যন্ত চেক্ ইন করালেন, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করতে বললেন — ফর্মটা তখন তিনি নিতে বললেন না। আমরা

কাস্টমে আমাদের ছেলের দেওয়া ক্যামেরা দেখালাম, কাস্টমস অফিসার বললেন — এটা দেখবার দরকার নেই। ইমিগ্রেসনে গেলাম, ফর্ম কই, তখন আবার দৌড়ে সেই চেক ইন কাউন্টারে গিয়ে ফর্ম নিয়ে এলাম। তারপর সিকিউরিটি চেক। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সবকিছু হয়ে গেল। ওপারে গিয়ে দেখলাম সারি সারি ডিউটি ফ্রি শপ। কি নেই? বাথরুমে গেলাম। এখন চা খাব। অনেক ধকল গেছে। চা নিয়ে বসেছি। হঠাৎ দেখি SOTC-এর লাল স্কাইব্যাগ নিয়ে এক বাঙালি দম্পতি, দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলাম। আলাপ করলাম ওরা যাচ্ছেন সতেরো দিনের ট্যুরে, ওরা কলকাতা থেকে এসেছেন, দিল্লি হয়ে আমাদের মতো লন্ডন যাচ্ছেন। ওদের জুয়েলারির দোকান আছে। কলকাতার ব্যবসায়ী। ছটা বিশের জায়গায় সাড়ে ছটা বাজল। আমাদের এয়ার ইন্ডিয়ার জাম্বোজেট বিমানের কোনও ঘোষণা নেই। সিকিউরিটি লাউঞ্জ দেখতে দেখতে প্যাসেঞ্জারে ভর্তি হয়ে গেল। তিল ধারণের জায়গা নেই। পরে যারা এসেছে তাদের অনেকেই দাঁড়িয়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক ফ্লাইট চলে যাচ্ছে, কিন্তু লন্ডনের যাত্রীদের কোনও হেলদোল নেই। ৭টায় অবশেষে দেখলাম ৮ নং গেটে লাইন পড়েছে, বোর্ডিং-এর সময় কি হয়ে গেছে? আমরা লক্ষ্য রাখছি SOTC-এর লাল স্কাইব্যাগ নিয়ে যে দম্পতি চলেছেন তাদের দিকে। দেখলাম ওরাও লাইনে তবে অনেক পেছনে। এর মধ্যে এয়ারপোর্ট-এর লোক বলে গেল, মহিলা বাচ্চাসহ মহিলারা লাইনে না দাঁড়িয়ে আগে যেতে পারেন, মিসেসকে ঠেলে দিলাম সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে আমিও পেছন পেছন। অনেক লম্বা করিডোর পেরিয়ে ফ্রিস্কিং, হ্যান্ডব্যাগ চেকিং-এর পর এ্যারোব্রিজ দিয়ে পরে এরোপ্লেনের ভেতরে আসনে। সামনের আসন। তিনটি সিট জানলার পাশে, মিসেস। আমার বাঁয়ে এক কনসাসনেসের এক এশিয়ান ভদ্রলোক, গেরুয়া পোশাকে আপাদমস্তক জড়িত, এক হাতে নিরন্তর মালা জপছেন। পরে জিজ্ঞেস করে জানা গেল তারা উগান্ডা থেকে উচ্ছেদ হয়ে লন্ডনে চলে আসেন। তাঁর স্ত্রী আছেন লন্ডনে, স্ত্রী শিক্ষকতা করেন। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে কোনও ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেবেন। এসাইনমেন্ট নিয়ে চলেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুর থেকে এক বছর পরে লন্ডনে চলেছেন। এয়ার ইন্ডিয়ার জাম্বোজেট বিমান দোতালা। চারশ তিরিশজন যাত্রী নিয়ে লন্ডন যাবে। আমাদের ব্রেকফাস্ট এল। সঙ্গে ড্রিংকস, কোকাকোলা, পোর্টওয়াইন নিয়ে আমরা ননভেজ ব্রেকফাস্ট খেলাম। প্লেন উড়ে চলেছে। দিল্লি থেকে লন্ডন যেতে লাগবে দশ ঘন্টা। লাঞ্চ খেলাম ১টার সময় এবং গিয়ে যখন লন্ডনের হিথ্‌রো এয়ারপোর্টে পৌছলাম, তখন আমাদের ঘড়িতে বেলা চারটা। প্লেন থেকে নেমে বাসে করে লাউঞ্জের একটা ঘরে পৌছলাম। তারপর লাগেজ রুমে যেতে এঘর ওঘরের ভেতর দিয়ে লাউঞ্জের অলিগলি পেরিয়ে লাগেজের ঘরে পৌছলাম। বলা হল ৭নং কনভেয়ার বেল্টে এয়ার ইন্ডিয়া ১১১-এর লাগেজ আসবে।

পরে বলা হল না ৭নং নয়, আবার নয় নম্বর বেল্ট থেকে যে যার লাগেজ তুলে নিয়ে আমরা ইমিগ্রেশন পেরিয়ে ওয়েটিং লাউঞ্জে এলাম। লাগেজ টিকিট কেউ দেখল না, কোনও চেকিংও নেই। ওয়েটিং লাউঞ্জে SOTC-এর ব্যানার নিয়ে তিন চারজন লোক দাঁড়িয়েছিলেন। দেখলাম প্রায় শ-খানেক SOTC-এর যাত্রী এসে সেখানে জমা হয়েছে। এখানে বসার কোনও জায়গা নেই। কাজেই এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে। হাতে সময় আছে দেখে ভাবলাম বিশ পাউন্ডের একটি ট্র্যাভেলার চেক ক্যাশ করে নিই। কিন্তু চেকটি স্যুটকেসের পকেটে, দিল্লি এয়ারপোর্টে যে স্ট্র্যাপ দিয়ে স্যুটকেস বাঁধা ছিল, সেটা ছুরি দিয়ে না কেটে খোলা যাবে না। একজন তাগড়া জোয়ান হায়দ্রাবাদের ছেলেকে বললাম, স্ট্র্যাপটা ছিঁড়তে পারবে কিনা দেখো। অনেক চেষ্টা করে গায়ের জোরে স্ট্র্যাপটা ছিঁড়তে পারল না। শেষে সেই যুবকই চাবি দিয়ে স্ট্র্যাপটা কেটে কেটে খুলে দিয়েছিল। ট্র্যাভেলারস চেকটা ভাঙালাম। একচেঞ্জের ভদ্রলোক দেখলাম কোনও কমিশন নিলেন না। কুড়ি পাউন্ড কুড়ি পাউন্ডই দিয়ে দিলেন। শেষে সবার সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডের দিকে গেলাম। আগেই SOTC-এর লোকদের বলেছিলাম, আমাদের গ্রুপ আসছে দুদিন পরে, আমরা দুদিনের লন্ডনে থাকার জন্য অপশ্যনাল প্যাকেজ নিয়ে আগে এসেছি। ওরা বললেন, আপনারা দুটো কোচের কোনও একটিতে লাগেজ রেখে চেপে বসুন। ৫টায় হোটেল চেক ইন করবে এবং আজই আপনাদের লন্ডন দেখা হয়ে যাবে। আমরা তা-ই করলাম, কারণ হোটেলে যাওয়া এবং চেক ইন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এখানে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। SOTC-এর লোকেরা প্রথমে আমাদের স্বাগত জানালেন এবং বললেন আমরা খুব লাকি। কারণ এখন লন্ডনের আবহাওয়া খুব ভালো হয়ে গেছে, রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন অথচ, এক ঘন্টা আগেও মুশলধারে বৃষ্টি পড়েছিল।

ট্যুর ম্যানেজার বললেন, ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিতে। এখন লন্ডনে সময় বারোটা অথচ আমাদের হাতের ঘড়িতে বিকাল চারটা। তাই সময় মিলিয়ে নিলাম। দুটো বাস প্রায় একশোর বেশি যাত্রী। সবাই বাসের ওঠার পর বাস দুটো এক সঙ্গে ছেড়ে দিল। আমরা বাসের দেড়তলায় আর আমাদের লাগেজগুলো নিচে বাসের পেটে। বাস এগিয়ে চলেছে। মিলন সাব্বির বলে এক ভদ্রলোক আমাদের গাইড। প্রথমে বাস চললো পুরোনো শহরের মাঝখান দিয়ে। রাস্তা একটু নিচু, রাস্তার দুদিকে বাঁধের মতন উঁচু, মসৃণ রাস্তা। যেদিকে চলেছি সেদিকটায় নাকি প্রথমে জার্মানরা এসে ইংরেজ রাজত্বের পত্তন করেন। সেই পুরোনো শহরের দিকে আমাদের বাস চলেছে। চারদিকের দালানবাড়ির বর্ণনার সাথে সাথে এও বলে চলেছেন আমরা নূতন এসেছি, হোটেলে থাকার একটা প্রটোকল আছে। তা হচ্ছে এই যে, হোটেলের বাথরুমে জল ফেলা যাবে না। বাথরুম খুব শুকনা

রাখতে হবে। বাথরুমে জল জমলে নিচে যাঁরা আছেন তাদের দিকে জল যেতে পারে। অনেকে নাকি বিশ পাউন্ড পর্যন্ত ফাইন দিয়েছেন। বাথটবে স্নানের সময় স্ক্রিন ভাল করে টেনে শাওয়ার ছাড়তে হবে, যাতে বাথরুমে জল না পড়ে। জল পড়লে ফুট টাওয়াল দিয়ে তা মুছে, শুকনো করে রাখতে হবে ইত্যাদি।

এলবার্ট হলের সামনের এসে তিনি নেমে গেলেন। গাইড-এর চার্জে এলেন এক ইংরেজ মহিলা। তিনি নানারকম পার্ক, দালান বাড়ি, মিউজিয়াম, থিয়েটার স্কোয়ার নিয়ে কথা বলতে বলতে আমাদের নিয়ে গেলেন।

তিনি আমাদের মাদাম তুসোর মিউজিয়াম বাইরে থেকে দেখালেন। কারণ সেদিন কোনও একটা কারণে ছুটি। কাজেই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু হয়নি। তিনি বাইরে থেকে বাকিংহাম প্যালেস দেখালেন। চেঞ্জ অফ গার্ডস ইত্যাদি দেখলাম না। সেটা নাকি বেলা একটায় হয়। এখন বেলা প্রায় তিনটে। প্যালেসের সমানে একটা স্ট্যাচু, সেখানে মানুষের ভিড়, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতের মানুষের সমাগম, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ আধশোয়া অবস্থায় নানা ভঙ্গিতে চারদিকে ফটো তোলার ধুম। আমাদের গাইড দেখালেন — দূরে হাইড পার্ক। তারই কাছাকাছি প্রিন্স চার্লসের বাড়ি। অন্যদিকে নিয়ে গেলেন। দেখলাম বিগ-বেন সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রেল ট্র্যাফালগার স্কোয়ার, টাওয়ার ব্রিজ, বেশ কয়েকবার টেমস্ নদী বাসে করে পারাপার করলাম। বিগবেনের কাছে একটা দোকানে চা খেলাম। সেই চায়ের গ্লাস ব্যাগে নিয়ে আমরা বাসে এসেছি পরে হোটেলে এনেছি। কারণ ফেলার জায়গা পাইনি। সেটা আমাদের অনেক কাজে এসেছে বাথরুমে।

এখন পর্যন্ত দেখলাম ছুটির দিন বলে রাস্তায় লোক নেই। গাড়ি বাস একটা আপন গতিতে চলেছে, কোনও তাড়াহুড়ো নেই, কোনও হর্ন নেই, কোনও ওভারটেকের চেষ্টা নেই। ধূলাবালি নেই। মসৃণ গতিতে সব কিছু চলেছে। রাস্তা খুব বেশি বড় নয়, তবে মাঝখানে ডিভাইডার। গাড়ি রাইট হ্যান্ড ড্রাইভ। যাত্রীরা গাড়িতে বাঁ-পাশ দিয়ে ওঠানামা করে। লন্ডন শহরটি উঁচু, নিচু ঢালু আছে, পাহাড় আছে। তবে শিলং-এর মতন স্টিফ পাহাড় না। ধীরে ধীরে মসৃণ ভাবে উঠে গেছে। রাস্তার দু'ধারে গাড়ি পার্কিং করা আছে দেখলাম। আরও দেখলাম বাসের খোলা ছাতে চেয়ারে বসে বহু ট্যুরিস্ট শহর পরিক্রমা করছে। বাইরে মিষ্টি মধুর রোদ আর ঠান্ডা হাওয়া। এরকম তিন-চারটার বেশি বাস দেখেছি। ঘুরে ঘুরে শহরময় ট্যুরে দর্শনীয় জিনিস ইত্যাদি দেখাচ্ছে।

তিন.

৩০শে মে সকাল ৭টায় রওয়ানা দিয়ে আমরা লন্ডনে পৌঁছলাম বিকেল চারটায় অর্থাৎ টানা ৯ ঘন্টা আমরা এরোপ্লেনে ছিলাম। আগেই বলেছি, আমরা যখন লন্ডনে

পৌঁছেছি, তখন লন্ডনের সময় সাড়ে বারোটা। সাড়ে বারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ঘুরে আমরা হোটেলে এলাম। ক্লান্ত হওয়ারই কথা, কিন্তু কোনও ক্লান্তি বোধ করিনি, কারণ আবহাওয়া খুবই ভাল ছিল। দশ এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল টেম্পারেচার।

ওয়েম্বলি প্লাজা হোটেল ১২ তলা ৫৪০টি রুম। লাউঞ্জে এসে আমরা সবাই যে যার ব্যাগ এ্যাটাচি নিয়ে অপেক্ষায়। এক এক করে পঞ্চাশটি রুমে একশজনের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। আমরা দুজন দুদিন অপশন্যাল প্যাকেজ নিয়ে লন্ডনে এসেছি, লন্ডন দেখব বলে। আমাদের গ্রুপ আসবে ১ জুন। সবশেষে আমার নাম ডাকল। আমরা পেয়েছি রুম নম্বর ২০১। ব্যাগেজ নিয়ে চাবির খাম নিয়ে লিফ্‌ট করে উঠে গেলাম। খামের ভেতর থেকে চাবির বদলে বেরুল একটা কার্ড। এই দিয়ে রুম খুলবে। দিস সাইড আপ এবং এরো দিয়ে দেখানো। সেটকে শ্লটে ঢুকিয়ে কার্ড খুলে আনলাম। সঙ্গে সঙ্গে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ধাক্কা দিলাম। রুম খুলে গেল। রুমে পা দিয়ে দেখলাম বাঁয়ে বাথরুম শুকনো ধবধবে, লম্বা ওয়াল জুড়ে সাদা ফিটিংস। মাঝখানে ওয়াশ বেসিন। দুদিকে ছোটো ছোটো টিউবে, বডি শ্যাম্পু, বডিলোশন, হেয়ার কন্ডিশনার আর হ্যান্ড ওয়াশের জন্য ছোট্ট গোল সাবান। ওদিকে ইংলিশ কমোড, টিসু পেপার বা বাথটব এবং হাত মোছার জন্য দুটো, গা মোছার জন্য দুটো এবং মেঝে শুকোবার জন্য একটি সাদা তোয়ালে। বাথরুমের দরজার বিপরীতে সারি সারি হ্যাঙার, তারপর ওয়াল আলমারির ধার ধরে লম্বা সাদা টেবিল, মধ্যেখানে ড্রেসিং টেবিল, হেয়ার ড্রায়ার মেশিন, জল গরম করে চা খাওয়ার জন্য একটি মেটালের ইলেক্ট্রিক হিটার। একটি ট্রেতে টি-ব্যাগ, কফি, চিনির প্যাকেট, দুটো কাঁচের গ্লাস, চামচ ইত্যাদি। উত্তরে দেয়াল জুড়ে বিরাট কাচের জানালা, পর্দা সরানো রুম প্রাকৃতিক আলোয় আলোকিত, বিরাট বিরাট বিল্ডিং, গাড়ি রাখার জন্য কোবলেড মাঠ দেখা যাচ্ছে, সূর্য তখনও জ্বলজ্বল করছে। এখানে বলে রাখি, লন্ডনে রাত দশটায়ও সূর্য অস্ত যায় না। ওয়ালের সঙ্গে সাইড টেবিলে একটি হাতলওয়ালা চেয়ার, ওয়ালের দিকে নিচে, টেলিভিশন, সামনে একটি সোফা এবং একটি নিচু গোল টেবিল, দুটো পরিপাটি করে সাজানো শোয়ার খাট, দুটো খাটের মাঝখানে মাথার দিকে ছোটো ওয়াল টেবিল। টেবিলে একটি টেলিফোন। ছোট্ট প্যাড এবং একটি পেনসিল। মাথার দিকে রিডিং ল্যাম্প। উত্তর পশ্চিম কোণায় একটি ছোটো মেসিন ওয়ালে ফিট করা খুলে নামিয়ে জিম করার জন্য। সবকিছু দেখে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। সবচাইতে ভালো লাগছে চা করে খাওয়ার বন্দোবস্ত দেখে। প্রথমেই জল গরম করে (দার্জিলিং চা) টি-ব্যাগ দিয়ে তৃপ্ত করে খেলাম। তারপর বাথরুম সেরে রাস্তায় বেরুলাম। কারণ আজকের ডিনার নিজেদের। ড. নেপাল ভৌমিক একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের কথা বলেছিলেন, সেটা খুঁজে পেলাম না, কাজেই আর একটা হোটেল ইবিস -এ গিয়ে গিয়ে পিজা এবং নান্ খেয়ে সাতটায় ফিরে এসে ঘুরে ফিরে

হোটেলে জগদীস বলে এক গুজরাতির দোকানে জিনিস নাড়াচাড়া করলাম। ফোন করার জন্য কার্ড কিনলাম এবং ফিজিতে মেয়ের কাছে এবং দিল্লিতে ছেলে মেজরের কাছে দুটো ফোন করলাম। বাসে ফিরে এসে নয়টায় বিছানায় ঢুকলাম। সেন্ট্রাল হিটেড রুমে কোনও শীতই নেই। যখন জেগেছি সকাল তখন ভোর পাঁচটা। একটানা আটঘন্টা ঘুমিয়েছি। চা বানিয়ে খেয়ে স্নান করে সাড়ে সাতটায় ব্রেকফাস্টের জন্য নিচে গেলাম। ওখানে সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট, স্কোয়াশ কোর্ট রয়েছে। ছোট্ট একটি ফিটনেস রুমও রয়েছে। যার শপিং আর্কেভও রয়েছে যার মালিক জগদীশ, গুজরাতি ভদ্রলোক। ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে দেখলাম খাবার জন্য কী নেই? ফলের রস, চা, কফি, ঠান্ডা দুধ, গরম দুধ, বাটার রুটি, নানা জাতের সিদ্ধ ডিম, খোলা ছাড়া চিজ, হ্যাম, আপেল লাল এবং সবুজ এবং সিঙ্গাপুরি কলা যার যা ইচ্ছেমত খাচ্ছে, না খেতে পেরে টেবিলে ফেলে দিয়ে আসছে। গতকাল যে দুটো গ্রুপ এসেছে ব্রেকফাস্টের পরে তারা লাউঞ্জে এলেন এবং তাদের ট্যুর ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করানো হল। ১৫ দিনের ট্যুর ম্যানেজার ডেকে তার গ্রুপকে নিয়ে বাসে উঠলেন। সমস্ত লাগেজ এবং মালপত্র বাসের (কোচের পেটে) ঢোকানো হল। তেমনি ১৭ দিনের গ্রুপও আর একটি কোচে গিয়ে উঠলেন। তাদের ট্যুর ম্যানেজার আলাদা। শুধু আমরা দুজন পড়ে রইলাম, যিনি বড় ম্যানেজার তাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি আমাদের দুটো ট্র্যাভেল কার্ড দিলেন, এই কার্ড দিয়ে আমরা সারাদিন বাসে বা টিউব ট্রেনে ঘুরে ঘুরে দর্শনীয় জায়গা দেখতে পারব। সঙ্গে নিলাম মাড্যাম তুসোর মিউজিয়ামের দুটো প্রবেশপত্র। এখন আমরা নিজেদের নিয়ে নিজেরা স্বাধীন। আমাদের কোনও ট্যুর ম্যানেজার বা গাইড নেই। দিনের এবং রাতের খাবারও আমাদের নিজেদেরই খেতে হবে।

হালকা ব্যাগ নিয়ে আমরা বেরোব। প্রথমে ফিজিতে বড় মেয়েকে ফোন করলাম, দিল্লিতে ছেলেও ফোন করলাম। ফোনের জন্য কার্ড কিনে নিয়ে নিউ ক্যাসেলে ড. সতীবর চাটার্জিকেও ফোন করা হল। আমার স্ত্রীর পিসতুতো দাদা। আগে লন্ডনে ছিলেন। এখন নিউ ক্যাসেলে চলে গেছেন, বাড়ি তৈরি করছেন। শরীরও তেমন ভাল না। বাড়ি তৈরির কাজেও ব্যস্ত, তাই দুঃখ করে জানালেন এ যাত্রায় দেখা হল না। সে যাই হোক, আমার স্ত্রী প্রায় পনেরো ষোলো মিনিট ধরে আলাপ করল। ফোনের কার্ডের পয়সা শেষ হওয়াতে কথাবর্তা বন্ধ হল।

এরপর দুজনে বেড়িয়ে পড়লাম। বাসে উঠে তিন চারটা স্টপেজের পরেই ওয়েম্বলি, সেন্ট্রালে নামলাম।

এখানে আমরা পাতাল রেলে চড়ে ম্যাদাম তুসোর মিউজিয়াম দেখতে যাব। স্টেশনে ঢুকে দেখলাম লোকে কার্ড মেসিনে ঢোকাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে বেরিয়ে আসা কার্ড চট করে তুলে নিয়ে মেন্টালের গেটের বাধা ঠেলে চলে যাচ্ছে। নিচে

এসকেলেটার চলে যাচ্ছে, বহু নিচে। মিসেস এসকেলেটারে বহুদিন চড়েননি, তাই অভ্যাস নেই, আমি একজন কালো অফিসিয়েলকে অনুরোধ জানালাম। তিনি যদি মিসেসকে এসকেলেটারে নামিয়ে দেন। বলা মাত্র তিনি মিসেসকে বগলদাবা করে এসকালেটারে নামিয়ে দিয়ে এলেন। টিকিটও পানচিং করতে দিলেন না।

আমি নিজে নিজে এসকেলেটরে নেমে গেলাম, আমিও টিকিট পানচিং করলাম না। নিচে লোকজন খুব কম। সময় তখন সাড়ে ৯টা হবে। দুজন এশিয়ান ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে ওরা বললেন, আপনারা বেকার স্ট্রিট লাইনের মেট্রো ধরেন, তারপর লোকেদের জিজ্ঞেস করলে ওরা ম্যাডাম তুসোর মিউজিয়াম স্টেশনে নামিয়ে দেবে। ওরা বললেন, ওঁরাও সেদিকেই যাচ্ছেন আমরাও যেন সেই ট্রেনেই উঠি। আমরা তাই করলাম, মুখোমুখি বসা হল, কথায় কথায় জানলাম ওরা করাচি থেকে গেছেন — পাকিস্তানি। ওঁরা ওদের গন্তব্যস্থলে নেমে গেলেন। বলে গেলেন পাঁচটা স্টপ পরেই আপনারা নেমে যাবেন। ম্যাডাম তুসোর মিউজিয়াম পেয়ে যাবেন। আমরা তাই করলাম এবং ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেলাম। মাদাম তুসোর মিউজিয়ামে ঢুকে আমাদের ফ্রি পাসের কাগজটা দিতেই একটা মেয়ে নিয়ে ভেতরে এবং পরে এসে একজনের হাতে দিল যিনি আমাদের দুটো টিকিটের মতো পাস দিয়ে আবার ছিঁড়ে আমাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। আমরা ভেতরে একবারে উঁচু একবার নিচু সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে এরুমে ও রুমে রাখা নানারকম দ্রষ্টব্য দেখে এগিয়ে চললাম। ভিড়ে ঠাসা সিঁড়ি আর রুম। যেখানে ছবি ইত্যাদি আছে। মিসেস বললেন তিনি সেসব দেখবেন না। তাই এগিয়ে যেতে যেতে একটা রুমে পৌঁছলাম যেটা দেখার জন্য আমরা উৎসুক ছিলাম। এখানে নানা দেশের বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতিমূর্তি রাখা আছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তি আছে, কিন্তু পণ্ডিত নেহেরুর প্রতিমূর্তি দেখলাম না। নেপোলিয়ান, নেলসন, হিটলার থেকে শুরু করে ইংলন্ডের রাজা মহারাজা মহারানিদের প্রতিমূর্তি সবই আছে। প্রিন্সেস ডায়ানা, অমিতাভ বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই সবই আছে। প্রিন্সেস ডায়ানা প্রতিমূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে মিসেস ছবি তুললেন। আরও এগিয়ে অন্য একটা বড় হলঘরে গান এবং নাচ হচ্ছে। সেখানে দর্শকদের থেকে একটা ছোট্ট ছেলে গিয়ে নাচের দলে যোগ দিয়ে নাচতে লাগল। আমরা সবাই তারিফ করে উৎসাহ দিয়ে নাচ দেখলাম। সেখানে একদিকে রেস্টুরেন্ট আছে। আমরা ভেজেটেরিয়ান খাবার খেলাম। পরে বেরিয়ে আসতে গিয়ে একটা সুভ্যেনিরের শপে এসে পৌঁছলাম, যেখানে টুকটাক সুভ্যেনির মেমেন্টো র জন্য তিন পাউন্ড পাঁচ পাউন্ড দিয়ে মিসেস অনেক জিনিস কিনলেন। পরে বেরিয়ে এলাম। ফুটপাত দিয়ে হেঁটে কিছুদূর এগিয়ে নামকরা একটা পার্ক দেখলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট্ট দোকানে

ব্যাগ দেখে মিসেস কিনলেন একটা। দেখতে সুন্দর, বিগবেনের ছবি আঁকা এবং সোনালি অক্ষরে লন্ডন আঁকা। আমিও একটা কিনলাম। তিনি কিনেছেন নাতনির জন্য, আমি কিনলাম মিসেসের জন্য। দাম নয় পাউন্ড করে।

পরে ১৯ নম্বর দোতালা বাসে করে ওয়েম্বলি সেন্ট্রালে এসে পৌঁছলাম। সেখানে ফোটো মার্কেট বলে একটি গুজরাতি দোকানে একুশ পাউন্ড দিয়ে একটি ক্যানন ক্যামরা কিনলাম। সেদিনেই সকালে একটা ডিসপোজেবল ক্যামেরা কিনেছিলাম। ওয়েম্বলি প্লাজা হোটেলে এসে রুমে চা করে খেলাম। পরে মাদাম তুসোর সামনের দোকান থেকে কিনে আনা খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ টিভি দেখে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে যথারীতি সাড়ে সাতটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট করার জন্য নেমে দেখি যে রুমে আমরা ব্রেকফাস্ট খেতাম, সেখানে টেবিল চেয়ার অন্যভাবে সাজানো। কোনও খাবার নেই। পরে জানলাম অন্য একটা হলে আমাদের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখি তখনও সাহেবরা টেবিল চেয়ার ঠিক করছে, টেবিল ক্লথ সাজাচ্ছে। বসে থেকে যখন খাবারদাবার এল, তখন সেগুলো যে যার নিয়ে খেয়ে জগদীশের দোকান থেকে দুটো ট্র্যাভেল কার্ড পাঁচ পাউন্ড করে দশ পাউন্ড দিয়ে কিনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। আমরা পিকাডেলি সার্কাস গিয়ে ইরোস-এর প্রতিমা দেখতে যাব।

বাসে করে ওয়েম্বলি সেন্ট্রাল পেরিয়ে হ্যারোড শহরতলিতে গিয়ে পৌঁছলাম এবং জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম আমাদের বেশ কিছু দূর ফিরে গিয়ে মেট্রোতে করে পিকাডেলি সার্কাসের লাইন ধরে পিকাডেলি পৌঁছতে হবে। আমরা তা-ই করলাম। মাঝখানে আমাদের মেট্রো বদল করতে হয়েছিল। যখন পিকাডেলি গিয়ে পৌঁছলাম তখন বৃষ্টি পড়ছিল, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। সে যাই হোক, এরোস-এর ফোটো নেওয়া হলে এবং দোকানের সামনের ঢাকা বারান্দা দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাসস্ট্যান্ডের দিকে গেলাম। তখন সাড়ে বারোটা, সবাই খাচ্ছে, রেইন কোট আর ছাতা মাথায় ট্যাক্সির জন্য চেষ্টা করলাম। কোনও ট্যাক্সি থামছিল না। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, টাওয়ার ব্রিজ অব লন্ডনে কোন বাসে যেতে পারব। বললেন, ১৫ নং বাসে যেতে। আমরা ভুল করে ১৩ নং বাসে উঠে পরলাম। কন্ডাক্টার বলল, এ বাস কিছুদূর গিয়ে আর যাবে না। আমরা কোন বাসে টাওয়ার ব্রিজ অব লন্ডনে যাব? তোমরা ১৫ নং বাসে যাও। পরের স্টপেজে তোমরা নাম, এখানে পনেরো নম্বর বাস পাবে। আমরা তা-ই করলাম। পনেরো নম্বর বাসে করে আমরা টাওয়ার ব্রিজ অব লন্ডনে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। বৃষ্টিও পড়ছিল। খাওয়ার দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। মিসেস অন্য পাশ দিয়ে খাবার চাইল। বলল, লাইনে যাও। লাইনে গিয়ে গরম গরম ফিস এন্ড চিপস কিনে আনল রুবি এবং

দোকানের এক বারান্দার নিচে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেলাম। এত সুস্বাদু খাবার যেন অনেকদিন খাইনি মনে হয়েছিল। কথায় বলে হাঙ্গার ইজ দি বেস্ট সস। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ পরিস্কার। আমরা এগিয়ে গিয়ে ফোটো তুললাম এবং দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এক মঙ্গোলিয়ান মহিলাকে দিয়ে আমাদের দুজনের ফটো তোলালাম। তারপর পাকা ঢালু জায়গায় এসে বেঞ্চে বসলাম। রুবি জায়গায় জায়গায় লেখা দুর্গ প্রাকারের ইতিহাস টুকতে লাগল। এখানে বহু দুর্গ আছে, এক একটি এক এক ইতিহাস। সন তারিখসহ্ নানা প্রাকারের কথা বর্ণনা করা আছে।

আমরা ভুল করে টাওয়ারের ভেতর গেলাম না। এখন আপশোস হয়, কেন টাওয়ারের ভিতর গিয়ে সেখানকার দ্রষ্টব্য জিনিস দেখলাম না। সে যাই হোক, বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, স্থানীয় স্যুভেনিরের দোকানে গিয়ে মিসেস নানা টুকিটাকি জিনিস যেমন আংটি, লোহার চুড়ি ইত্যাদি কিনল। পরে আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে গিয়ে টিউব দিয়ে ওয়েম্বলি সেন্ট্রালে এসে নামলাম। মিসেস কাপড় ধোয়ার জন্য সাবান কিনতে চাইলেন পেলেন না। তারপর কিছু খাবার কিনে বাসে করে ওয়েম্বলি প্লাজা হোটেলে এসে পৌছলাম। ততদিনে রাস্তাঘাট আমাদের প্রায় চেনা হয়ে গেছে। পরদিন ৩ রা জুন যথারীতি ওয়েক আপ কল পেয়ে আমরা তৈরি হয়ে লাগেজ হ্যান্ড ব্যাগ ইত্যাদি নয়ে নিচে নামলাম। ব্রেকফাস্ট করেই আমাদের যেতে হবে — লন্ডনের ওয়াটারলু স্টেশনে।

চার.

সেখানে ইউরোস্টার ট্রেন ধরে ইংলিশ চ্যানেলের নিচে দিয়ে ইউরোপের মাটিতে পা দেব। প্রথমে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে দুটো আপেল ব্যাগে ভরে আমরা লাউঞ্জে এলাম, দেখলাম তিনজন ট্যুর ম্যানেজার নিজ নিজ গ্রুপের যাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত। এক দল যাচ্ছেন ১৫ দিনের ট্যুরে। আর এক দল যাচ্ছেন ১৭ দিনের ট্যুরে। আমরা যাচ্ছি দশ দিনের ট্যুরের গ্রুপে। আমরা আগে এসে দুদিন লন্ডনে কাটিয়েছি — এই দুদিন অপশন্যাল। তার জন্য দুজনে ২৬ হাজার টাকা দিয়েছি। আমাদের ট্যুর ম্যানাজারের নাম মহেশ। দেখতে সুশ্রী, গৌর বর্ণ, আনুমানিক ত্রিশ-একত্রিশ, অবিবাহিত। মহেশ পবন হংসকর। কমার্স গ্র্যাজুয়েট, বম্বেতে জন্ম, সেখানেই পড়াশোনা, তারপর SOTC চাকরি। ট্যুর এলাউন্স যা পান তা

দিয়ে ভালোভাবে একবছর চলে যায়। খুব ভাল বক্তা। বললেন, SOTC একটা ব্র্যান্ড নেম। সিন্ধি ওরিয়েন্টাল ট্র্যাভেলার্স কোম্পানির মালিক একজন সিন্ধি ভদ্রলোক, অবিভক্ত ভারতের করাচিতে তার বাসস্থান। তার এই কোম্পানি এখন সুইজারল্যান্ডের একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি কিনে নিয়েছেন, তারা হচ্ছেন KUONI TRAVEL Pvt. Ltd. এটা এত নাম করেছে যে এক ডাকে সবাই এটাকে জানেন। SOTC-র মালিককে ওরা কোম্পানীর চেয়ারম্যান করে এখন নাকি রেখে দিয়েছেন তার ম্যানজম্যাটের এক্সপারটাইস কাজে লাগাবার জন্য। সকলে বাসে উঠে পড়েছে। ছোটো ছোটো বাচ্চা সহ আমরা মোট ৫২ জন। ট্যুর ম্যানেজার মহেশ এবং ড্রাইভারসহ চুয়ান্নজন। এখন আটটা বাজে। নয়টায় ওয়াটারলু স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে হবে ইউরোস্টার ট্রেন ধরবার জন্য। এই ইউরোস্টার ইংলিশ চ্যানেলের নিচে দিয়ে আড়াই ঘন্টায় ইউরোপের কন্টিনেন্টে পৌঁছে দেবে। লন্ডন থেকে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের দূরত্ব ৩২০ কিমি। বেলা ২-৫০ মি. পৌঁছে দেবে।

ওয়াটারলু স্টেশন ভিড়ে ঠাসা। বাস দাঁড়াবার জায়গা নেই। যাই হোক ছোট্ট জায়গাতে কসরত করে এক মহিলা বাস ড্রাইভার ব্যাক করে বেরিয়ে এলেন। সেখানে আমাদের বাস দাঁড়াবার জায়গা পেল। সেখানে আমাদের মালপত্র নামানো হল। আমাদের এখন সিকিউরিটি চেক করে স্টেশনে যেতে হবে। এয়ারপোর্টে যেমন করতে হয়। গ্রুপ ট্যুর ম্যানেজার আমাদের বলে গেল একটু অপেক্ষা করতে, তিনি টিকিট কেটে আনবেন। তিনি টিকিট নিয়ে এলে আমরা একটা এন্ট্রি দিয়ে ঢুকতে পারলাম। মালপত্রের পরে আমাদের বডি ফ্রিসকিং চলল। কোট খুলে ফেলা হল, কোটের পকেট থেকে কয়েন চাবি জিনিস বের করা হল। ঘড়ি খুলে একটা ট্রেতে রাখা হল, কোটটাকে মেসিনের ভেতর দিয়ে পার করে দেওয়া হল, ঘড়ি ক্যামেরাসহ ট্রেও পার হয়ে গেল। জিনিসগুলো নিয়ে কোট পরে এখন পাসপোর্টে ছাপ লাগাতে হবে। ছাপ লাগাবার পর আমরা ওয়েটিং লাউঞ্জে গেলাম। ওখানে শত শত সাদা কালো মানুষ। খাওয়ার দোকান এবং সুভ্যেনির দোকানও রয়েছে। মিসেসকে বসিয়ে ওখানে দৌড়ে গিয়ে একটা কোকাকোলা কিনে আনলাম মিসেসের জন্য। এখন লোহার বাঁধা শেকল খুলে দিলে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে যেতে পারব। এদিকে টিক টিক করে দশটা বাজতে চলেছে। কালো গেটের শেকল খুলছে না। আমরা অধৈর্য। শেষে শেকল সরিয়ে আমাদের যাবার ব্যবস্থা হল। প্ল্যাটফর্ম নম্বর ২১-এ যেতে হবে। সমান জায়গা দিয়ে এসকেলেটার, মিসেস হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে স্মার্টলি চলেন গেলেন। আমাদের কোচ নম্বর ১৫, ১৬, ১৭ এবং ট্রেনে উঠে সামনেই লাগেজ রাখার জায়গায়। লাগেজ রেখে আমরা ৫৩-৫৪ নম্বর সিটে গিয়ে বসলাম। এক সুন্দরী মেয়ে এসে আমাদের এক পৃষ্ঠার কাগজ দিয়ে গেল। বললো, ৬

এবং ১৩ নম্বর কোচে বার রেস্টুরেন্ট আছে, ওখানে সব খাবার পাবে। কিছু খাবার কেনার জন্য গেলাম, তখন ওখানে লম্বা লাইন পড়ে গেছে। লাইনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর কিছু খাবার ও দুটো কোকাকোলার ক্যান কিনে এসে সিটে বসে খেলাম। ইচ্ছে ছিল পোর্ট ওয়াইন খাব, কিন্তু মিসেস বললেন, মাথাটাথা ঘুরবে, দরকার নেই। তাই খাওয়া হল না। বাইরে শস্য ভরা গ্রেট ব্রিটেনের মাঠ, দালান বাড়ি আছে। উঁচু নিচু টিলাও আছে নানা রং-এর গাড়ি দেখলাম চরে বেড়াচ্ছে। এক জায়গায় প্রচুর গাড়ি দেখলাম। এটা কি গাড়ির ফ্যাক্টরি? হতে পারে।

শেষে অন্ধকার সুড়ঙ্গে ট্রেন ঢুকে গেল। নিশ্চিন্তে ছিলাম, ইংলিশ চ্যানেলের নিচে নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গের দুধারে আলো থাকবে। কিন্তু অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে আমাদের ট্রেন। বেলজিয়ামে পৌঁছল। বেলজিয়ামে পৌঁছালে আবার দিনের আলো। এক ঘন্টা এগিয়ে আমাদের ঘড়ি এডজাস্ট করে নিলাম। এখন ২-৫০। ব্রাসেলসে পৌঁছে আমরা ট্রেন থেকে যে যার যার মালপত্র নিয়ে নামলাম। গাইড বলল, তার পেছন পেছন যাবার জন্য। আমরা বড় বড় লাগেজ ব্যাগ ইত্যাদি ট্রলিতে নিয়ে দৌড়বার চেষ্টা করলাম। বিরাট এলাকা শেষে বিরাট লিভট চড়ে নিচে নামা হল। আমরা যেখানে নেমেছিলাম — সেটা ছিল তেতালা বিল্ডিং-এর স্টেশন। শেষে লম্বা করিডোর পেরিয়ে স্টেশনের প্রান্তে পৌঁছে লিফটে করে নিচে নামলাম। গাইড একটা বিরাট বাসকোচ দেখিয়ে বলল, এই কোচটাই হবে আমাদের ঘরবাড়ি অন্তত দিনের বেলা, আর আট ফুট দীর্ঘ ইটালিয়ান ড্রাইভার সালভাদোরের সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ড্রাইভার খুব অমায়িক ভদ্র, ইউরোপিয়ান। গ্লাভস হাতে পরে — একলা আমাদের বড় ছোটো সবগুলো লাগেজ তুলে ফেলল। আর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল। কোচের নাম MABB। সবার জিনিস তোলা হয়ে গেলে আমরা কোচে গিয়ে বসলাম। গাইড আমাদের মাথা গুনে ড্রাইভারকে বলল, কোচ ছেড়ে দিতে। এখন ব্রাসেলস শহর ঘুরব। প্রথমে রাস্তায় আমাদের রাজপ্রাসাদ দেখাল। গাড়ি থেকে নেমে আমরা ফটো তুললাম। রাজপ্রাসাদের সামনের রাস্তায় সমানে দ্রুতগামী গাড়ি চলে যাচ্ছে। মাঝখানে কোনও ডিভাইডার নেই। গাড়ি এলে আমরা সরে আসছি। আর চলে গেলে আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফটো তুলেছি। গাইড বলল, এটা এখন রাজাদের অফিস, রাজারা এখানে থাকেন না। থাকেন পাহাড়ে নতুন তৈরি বাড়িতে। এরপর সিটি সেন্টার-এ আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আমাদের বলা হল, এক ঘন্টা সময় ফেরার পথে হোটেলে Ibis-কে ল্যান্ডমার্ক করে ফিরে আসো। প্রথমে গাইড সবাইকে নিয়ে ম্যানেকন পি দেখাতে নিয়ে গেল। একটা লোহার তৈরি বাচ্চা ছেলের নগ্ন মূর্তি (১৬০৯ খ্রিঃ) পেচ্ছাব করছে। ওটা ব্রাসেলের একটি পৃথিবী বিখ্যাত মূর্তি। ব্রাসেলসে

গেলে ওটা দেখতে হবেই। ফেরার পথে একটা বাড়ির দেয়ালে শায়িত তামার সেন্ট মাইকেলের প্রতিমূর্তি। কথিত আছে হাত দিয়ে মূর্তিকে ছুঁলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়। দেখলাম সবাই হাত দিয়ে মূর্তিকে স্পর্শ করছে, আমরাও করলাম। পরে ফিরে এসে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে ঠান্ডা পানীয় নিয়ে সঙ্গের খাবার খেয়ে নিলাম। খেয়ে ট্রে এবং গ্লাস যথাস্থানে রেখে বেরিয়ে এলাম। একটা চত্বরের মাঝখানে পুশকিনের এক লোহার মূর্তি আছে, সেখানে মিসেসকে বসিয়ে ফটো তুললাম। তারপর দৌড়ে গিয়ে একটা ফরেন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্রে গিয়ে পাউন্ড সিলিং দিয়ে বদলে ইউরো নিয়ে এলাম। মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা ফটাফট কম্পিউটারে হিসাব করে ইউরো দিয়ে দিল। এখানে ফুটপাতে প্রচুর লোক রঙিন ছাতার তলায় বসে বাইরে নানারকমের খাবার খাচ্ছিল। এখান থেকে অনেক রাস্তা বেরিয়ে গেছে যেগুলির নাম নানা খাবারের নাম দিয়ে রাখা আছে। যেমন বাটার স্ট্রিট, পিজা স্ট্রিট, টোস্ট স্ট্রিট ইত্যাদি। ওইসব রাস্তার একটিতে একটুখানি ঘুরে আমরা হোটেল Ibis-কে বাঁয়ে রেখে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে মেইন রাস্তায় উঠে এলাম, গ্র্যান্ড প্লেস অব ব্রাসেলস যেখানে আমরা এক্ষুনি ঘুরে এলাম, সেটা ছিল একটি ঢালু জায়গা। এরপর আমরা আরও ট্যুরিস্টদের সঙ্গে যেখানে বাস দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এলাম। বাস রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে ছিল, আমরা গিয়ে যে যার জায়গায় বসলাম। মহেশ এসে মাথা গুনল সবাই এসেছি কিনা। সবাই এসেছে নিশ্চিত হয়ে বাস ছেড়ে দিল। এবার বাসেই শহরের নানা দালান চার্চ এবং স্কোয়ার ইত্যাদি দেখতে দেখতে আমরা রাইন নদীর পাশ দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়েতে বেরিয়ে পড়লাম। এই রাইন নদী ১৩২০ কিমি দৈর্ঘ এবং ৪৩৩ ফিট চওড়া এবং উৎস থেকে বেরিয়ে এটা উত্তর মহাসাগরের গিয়ে মিশেছে। আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে এগিয়ে গেলাম হল্যান্ডের দিকে। আন্তঃরাষ্ট্র সীমানা এখানে কোনও বাধা নেই। কোনো চেকিংও নেই। বোঝাই যায় না আমরা বেলিজিয়াম থেকে হল্যান্ডে ঢুকেছি। হল্যান্ডের বৈশিষ্টের কথা শোনালো গাইড। বলল, এখানে ঘরে ঘরে দু-তিনটে করে গাড়ি আছে। কিন্তু পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সবাই সাইকেলে চড়ে। শত শত সাইকেল চলেছে, রাস্তায় বিশেষ করে স্কুলের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বাইসাইকেলে চড়তে তাদের মাথায় হেলমেট ব্যবহার করতে হয়। চারদিকেই বনায়নও বজায় রেখেছে। রাস্তার দু-পাশেই বন এবং বনাঞ্চল, ঘরবাড়ির চারপাশে বন সৃষ্টি করে রেখেছে।

হল্যান্ডের আইনডোভেনে Komungshop হোটেলে এসে পৌছলাম। দোতলা বিল্ডিং। চারদিকেই বন, জায়গায় জায়গায় মাঠ, চেয়ার, টেবিল বসার ব্যবস্থা, বিরাট এলাকা জুড়ে জোন, ব্লু জোন, গ্রীন জোন, রেড জোন, এখানে ব্লু জোনের STOC-এর একটা রেস্টুরেন্ট আছে। সেখানে আজ ভারতীয় খাবার পরিবেশিত হবে। তার আগে

ডাচদের একটা ক্লাসিকেল নৃত্য আমাদের দেখাবে।

সেটা আটটায়, এখন সাতটা। সূর্য এখনও জ্বলজ্বল করছে। যে যার নাম এলট করা রুমের চাবি নিয়ে ট্রলি করে মালপত্র নিয়ে চললাম। কোনদিকে রেড কোনদিকে গ্রিন এরো দিয়ে দেখানো আছে। আমরা দোতলায় রুম পেয়েছি। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে লিফটে করে ট্রলিসহ মালপত্র নিয়ে রুমে গেলাম। খাম খুলে দেখলাম এখানে লোহার চাবি, চাবি ঘোরে কিন্তু দরজা খোলে না। শেষে করিডোর দিয়ে যাচ্ছিল একটা ছেলে, ডেকে রুম খুলতে দিলাম। এখানে চাবি নিয়ে সবাই কমবেশি অসুবিধায় পড়েছিল, শেষে ছেলের বাবা পাশের রুম থেকে এসে আমাদের রুম খুলে দিল।

রুমে বেড টি খাওয়ার বন্দোবস্ত নেই। কোনও ফ্রিজও নেই, নইলে আর সবই আছে। টেবিল চেয়ার লাইট টেলিভিশন ফোন ইত্যাদি আমরা হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম, ডাইনিং হলে কফি খেলাম এবং একটা ছোটো জায়গায় এসে কাঠের বেঞ্চে বসলাম। নাচের জন্য সাবেকি পোশাক পরে মহিলা ও পুরুষ সবাই বয়স্ক ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকেরা এলেন। এক মহিলা ইংরেজিতে তাদের দলের নাম, কী নাচ নাচবেন ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তব্য রাখলেন। তারপর নাচ শুরু হল, এক-একটা নাচ তিন মিনিট চার মিনিট ধরে চলে এবং বক্তব্য রেখে নাচের নাম এবং নাচের ধরন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। প্রেমের নাচ, প্রেমের মধ্যে হিংসা ঈর্ষা, একজন আরেকজনকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা। নানা অঙ্গভঙ্গি চোখের মুখের ভঙ্গিমা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। প্রতিটি নাচের পর পরই প্রচণ্ড হাততালিতে উৎসাহ দিচ্ছিলাম, শেষে আমাদেরও নাচের জন্য আহ্বান, অনেক যুবক যুবতিরা নাচল এবং সবাই খুব আনন্দ উপভোগ করলাম। শেষে দর্শকদের মধ্য থেকে যাঁরা ভালো নাচলেন তাঁদেরকে নাচিয়েদের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হল। পুরস্কার ছিল হল্যাণ্ডের কাঠের তৈরি রঙিন সুদৃশ্য ছোট ছোট জুতো। সুন্দর স্যুভেনির। এরপর সাড়ে নটায় ইন্ডিয়ান ডিনার। এবং যে যার রুমে গিয়ে বিশ্রাম ও ঘুম।

পরদিন কন্টিনেন্টাল প্রাতঃরাশ এবং হোটেলের লাউঞ্জে ট্রলিসহ একে একে এসে জমায়েত, রিসেপশন রুমের চাবি বুঝিয়ে ফেরত দেওয়া। মিসেসের জন্য ছোটো বোতলের এক বোতল জল কেনা হল। দাম নিল দুই ইউরো। আমাদের কারেনসিতে ১২২ টাকা।

বাইরে আমাদের কোচ এসে গেছে, যার যার মালপত্র গাড়ির কাছে নিয়ে গেলাম। সদাহাস্যমুখ ড্রাইভার সালভাতোরে মালপত্রগুলো তুলে গাড়িতে রাখল। আমরা যে যেমনটি পারি কোচে উঠে বসলে মহেশ এসে আমাদের মাথা গুনল এবং সব উঠেছি দেখে সালভাতোরেকে বলল কোচ ছাড়তে। এবার আমরা চলেছি যেন উত্তরের দিকে। গাড়ির রাস্তার পাশে দু'পাশে সাইকেল লেন।

পাঁচ.

কিছুক্ষণ পর পর ক্রসিং। বিরাট বপু নিয়ে আমাদের কোচ চলেছে। একবার বাঁদিকে মোড় নিয়ে উপরের দিকে উঠে ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়ল। এখন সোজা মসৃণ নিখুঁত রাস্তা, মাঝখানে ডিভাইডার, রাস্তা সাদা চিহ্ন দিয়ে ভাগ করা, লেফটহ্যান্ড ড্রাইভ ইউরোপের সব যানবাহন। বাঁদিকের লেনে দ্রুতগামী ছোটো গাড়ি, তাদের গতি ১৫০ থেকে ২০০ কিমি পার আওয়ার। মধ্যের লেনে বড় বড় ট্রাক এবং প্যাসেঞ্জার কোচ, ডাইনে শ্লো মুভিং ভেহিক্যাল। ১০০ কিলোমিটার গতিতে যে ট্রাকগুলো চলেছে আমাদের কোচ যার গতি ১১০ কি মি, সেগুলোকে ওভারটেক করে চলে যাচ্ছে, এর মধ্যে কোনও হর্ন নেই। বাঁ-দিক দিয়ে ওভারটেক করেই কোচ আবার নিজের লেনে আসছে, পরক্ষণেই দ্রুতগামী ছোটো গাড়িগুলো, হর্ন ছাড়াই তাদের লেন ধরে দৌড়াচ্ছে। এ এক ডিসিপ্লিন এবং গতির খেলা। কোনও ব্রেক দেখলাম না, কিংবা হ্যাঁচকা ব্রেক দিয়ে যাত্রীদের ঝুঁকিয়ে দেওয়াও দেখলাম না। ড্রাইভারের পেছনে তার মাথার উচ্চতায় বসে বসে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছি। গাড়ির ভেতরের তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে করে রেখে দিয়েছে। গাড়ি চারদিকেই বন্ধ, কোনও হেলদোল নেই, যেমন রাস্তা তেমনি কোচের চলা। কোনও ধুলোবালি নেই। নেই একটি গাছের পাতাও, অথচ রাস্তার দুদিকেই ঘন বন-জঙ্গল। মাঝে মাঝে মেটালের হোর্ডিং দৌড়ানো হরিণের ছবি। অর্থ হচ্ছে এখানে হরিণ আছে। যেকোনও সময় রাস্তায় এসে পড়তে পারে। কোনও মানুষ দেখা যায় না। কিন্তু গাড়ির সংখ্যা প্রচুর, একদিকে যাচ্ছে, অন্যদিক থেকেও আসছে বলা যায়। নতুন নতুন গাড়ি, বোঝাই করে ট্রাক যেমন বাঁয়ে চলেছে, তেমনি ডাইনেও নতুন নতুন গাড়ি নিয়ে ট্রাক চলেছে। দূরে সারি সারি উইন্ড মিল দেখা যাচ্ছে, এই উইন্ডমিল থেকে ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হয় এখানে এবং জার্মানিতে ও এগুলো দেখেছি। হল্যান্ড থেকে আমরা সকাল দশটায় জার্মানির সীমান্তে এসে পৌঁছলাম। এখানে আমাদের বলা হল, আমরা কেউ নামব না, কেউ কোনও ফটোও তুলতে পারব না। শুধু ড্রাইভার আর গাইড মহেশ নেমে গিয়ে রাস্তার ট্যাক্স দিয়ে এল এবং আমাদের কোচ ছেড়ে দিল। আমরা জার্মানিতে ঢুকলাম, রাস্তা সেই একইরকম, সুন্দর মসৃণ রাস্তা। দুদিকে বন জঙ্গল সমতল ভূমিতে নানা শস্যক্ষেত, বোধহয় আলু খেত হতে পারে। কারণ আলু ছাড়া আর কোনও খাবার আমরা পাইনি। চালের খাবার পেয়েছি যেখানে SOTC আমাদের ইন্ডিয়ান লাঞ্চ বা ডিনার দিয়েছে। এখানে আলুই আমাদের ভালো লেগেছে, চালে পুরোনো একটা গন্ধ পেয়েছি। Auto roads থেকে এখন রাস্তার নাম হয়েছে Autobahn। এখন আমরা চলেছি Eaude cologne খ্যাত শহর কোলন শহরে। এখানে কোলন ক্যাথিড্রেল দেখলাম, যার উচ্চতা ৫১৫ ফুট,

এটাকে তৈরি করতে নাকি লেগেছে ছয় শতাব্দী। এখানে ভেতরে চল্লিশ হাজার লোক বসে প্রার্থনা করতে পারে। এখানে এক ঘন্টা থেকে এদিক ওদিক ঘুরে ওডি কোলন কিনে আমরা তারপর আবার কোচে ফিরে এলাম। বেরোবার আগে মিসেস এক বুড়ির কাছ থেকে এই ক্যাথিড্রেল সম্বন্ধে একটি চটি বই কিনলেন। ম্যাকাডোনালস্ে আমরা কিছু খেয়ে নিলাম।

১৯৯০ সালে দুটো জার্মান এক হয়ে গিয়েছিল। এর লোকসংখ্যা হচ্ছে আট কোটি চল্লিশ লক্ষ। এখানে নানা ধর্মের লোক বাস করে, ইহুদিরাও অল্প সংখ্যক রয়ে গেছে। প্রধান শিল্প নাকি গাড়ির ব্যবসায়। লোহা এবং কয়লা প্রচুর পাওয়া যায়।

রাইন ভ্যালিতে আমরা রাইন নদীর পারে এলাম। আমরা এখানে স্টিমারে উঠে রাইন নদীতে নৌকো বিহার করব। এগারোটা চল্লিশে আমরা স্টিমারে চাপলাম। আগেই স্টিমার বুকিং করা ছিল। সেজন্য সময়মতো পৌঁছানোর জন্য আমাদের তাড়াহুড়ো ছিল। যাই হোক, আমরা ঠিক সময়েই পৌঁছলাম, না পৌঁছলে নাকি স্টিমার ছেড়ে দিত, অথচ ওখানে আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা করা ছিল। এদের সময়ের নিয়মাবলিটা খুব কড়া,এটাই আবার মনে করিয়ে দিল। একজন দুজন সময়মতো না এলে এরা কারও জন্য অপেক্ষা করবে না। সেজন্যই কি এরা এত উন্নত? এত ধন দৌলতের অধিকারী কি এজন্যই। এদের মাথাপিছু আয় ৩০ হাজার ডলার আর আমাদের ২৫০ ডলারেরও কম। আমরা সারাদিনই স্টিমারে থাকব। ওপরে ডেকে সারি সারি চেয়ার পাতা। নানা জাতের, নানা বর্ণের মানুষ, নানা ভঙ্গিমায় ডেকে দাঁড়িয়ে বসে, কেউ আবার পানীয় খাচ্ছে, কেউ এমনি এমনি বসে আছে ক্যামেরা নিয়ে দূরের কাছের ফটো তুলছে। আমরা পোর্ট ওয়াইন নিয়ে বসলাম, মাঝে মাঝে ফটো তুললাম। নদীর দু-পারে নানা দৃশ্য, দুর্গ, পুরোনো আধা পুরোনা। ভিনিয়ার্ড বা ফলের চাষ হচ্ছে, এখানে আঙুরের চাষ হয় ঢালু পাহাড়ের ওপর, নানা কায়দায় নদীর দু'ধারেই মোটরের রাস্তা, ট্রেনের জন্য রেল রাস্তাও রয়েছে। ঠিক দেড়টায় আমাদের সকলের খাওয়ার ডাক পড়ল। আমরা টেবিলে বসে — যে যার খাবার ইচ্ছামতো নিয়ে এসে খেলাম। ডাইনিং হল নিচে, জাহাজের খোলে, যেখানে রেস্টুরেন্ট রয়েছে। সেসব জায়গায় বাথরুম, বারান্দায় রেস্ট রুম ইত্যাদি রয়েছে। ডিনার সেমি ইন্ডিয়ান, আমাদের ডাইনিং হল ছাড়াও আরও ডাইনিং হল রয়েছে, সেদিকে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা খাওয়াদাওয়া করে আবার ডেকে ফিরে এলাম। চারদিকে মেঘ করেছে, বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা প্রবল।

শেষে আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টিমার থেকে নামছি, হঠাৎ হুড়মুড় করে বৃষ্টি আর প্রবল হাওয়া, পড়ি কি মরি করে আমরা স্টিমার থেকে নেমে দৌড়ে এসে আমাদের কোচে উঠলাম। তখন বৃষ্টি আর মেঘের জন্য কিছুটা অন্ধকার হয়েছে। আটটার আগে

ক্রিসবার্গের হোটেল মারকিউরিতে পৌঁছতে হবে।

হোটেল মারকিউরি রুম নম্বর ৪১ লিফট দিয়ে নেমে নিচে যেতে হল।

জানালা খুলে দেখলাম, পাশে গাড়ি পার্কিং করা আছে, তার মানে আন্ডারগ্রাউন্ড নয়। হোটেল আসার আগে আমরা নেকার নদীর দুপাশে অবস্থিত Afstand বলে একটা পুরোনো জার্মান শহর দেখলাম। রাস্তায় হোলি স্পিরিট এবং জেস্যুইট চার্চ দেখলাম। মার্কেট স্কোয়ারে গিয়ে হারকিউলিসের ফোয়ারা দেখলাম। পরে কামিগস্টুহি পাহাড়ের ওপরে হাইডেলবার্গে দুর্গ দেখলাম। নেকার নদীর ওপর পুলের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা ওই দুর্গের ছবি তুললাম। নেকার নদী নাকি রাইন নদীর ট্রিবিউটরি।

এখানে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে হয়। টয়লেট খুঁজে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে চললাম কোথায় কোন পাতালে। টয়লেট খুঁজে না পেয়ে ভয়ে আমরা আবার অনেক কষ্টে বহু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। টয়লেটে যাওয়া আর হলো না। মহেশ বসেছিল আর একটা সিঁড়ির মুখে। আমাদের কথা শুনে তিনি আর একটা সিঁড়ির মুখ দেখিয়ে দিলেন। আমরা সেখানে গিয়ে পয়সা দিয়ে টয়লেট সেরে এলাম। আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল। যাই হোক, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে আমরা যে জায়গায় কোচ থাকার কথা সেখানে এসে কোচ দেখলাম না। শেষে দু-একজন সহযাত্রীদের দেখে আমাদের প্রাণ ফিরে এল। আমাদের কোচ যেখানে আমাদের নামিয়ে দিয়েছিল সেখানে অন্য ট্যুরিস্টের কোচ দাঁড়িয়ে আছে, পরে দেখলাম। আমাদের কোচ এমএবিবি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সবাই মিলে হোটেল মারকিউরিতে। হোটেলটা হাইডেলবার্গের শহরতলি ক্রিসবার্গে। এখানে SOTC-এর আয়োজিত ভেজ ননভেজ ডিনার খেলাম। ডিনার ব্রেকফাস্ট সবসময়ই প্রচুর থাকে এবং তা হয় অপূর্ব। পরের দিন কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা চললাম ব্ল্যাক ফরেস্টে অবস্থিত Cuckoo Clok making ফ্যাক্টরি দেখার জন্য। বনজঙ্গলের উঁচু নিচু পাহাড় পর্বত উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে ড্রুবব বলে জায়গায় প্রায় বারোটার সময় Cuckoo Clock সেন্টারে গিয়ে পৌঁছলাম। গাইড আগেই আমাদের বলে রেখেছিল যে সেখানে প্রথমে সাত-দশ মিনিট বক্তৃতা শুনতে হবে। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে এক জার্মান পরিবার এই ঘড়ির কারখানা চালিয়ে আসছিল। যে ছেলেটি আমাদের বক্তৃতা শোনাল, তার বয়স আঠাশ উনত্রিশের বেশি হবে না। বলল তাদের পরিবার দু-তিন জেনারেশন ধরে এই ঘড়ি তৈরি করে আসছে। ঘন্টা বাজলে কোকিলের মত একটি তৈরি পাখি প্রত্যেকবার ঘড়ির মাথা থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঢুকে যাবে। এই পাখিওয়ালা ঘড়িই হচ্ছে, Cuckoo Clock এটা পৃথিবী বিখ্যাত। নানা সাইজের নানা জিনিসের

কাঠের, মেটালের নানা আকৃতির ঘড়িতে ঘর ভর্তি, দামও সেইভাবে, তিরিশ ইউরো থেকে শুরু করে লক্ষ ইউরো দামের ঘড়িও রয়েছে। শেষে দেখলাম কেনাকাটার আগেই সহযাত্রীরা রেস্টুরেন্টের দিকে চলে যাচ্ছেন। আমরাও গেলাম, ছবি দেখে খাবারের অর্ডার দেওয়া হল, নিরামিশ খাব। কিন্তু প্লেট এলে দেখলাম, খুবই ঠান্ডা, ওদের একজনকে ডেকে বললাম গরম করে দাও। গরম করল, কিন্তু খুব বেশি গরম হল না, কারণ তখন কাউন্টারে ভিড় লেগে গেছে। সেটা নিয়ে এসে টেবিলে বসে খাওয়া হল, ঠান্ডা দেখে করে মিসেস খেলেন। খাবারের পরে মিসেস বলল — তোমার কাছে Sorbitrat ট্যাবলেট আছে সেটা বের করো, আমার শরীর খারাপ লাগছে। বলতে না বলতেই চেয়ারে ঢলে পড়ে গেলেন। আমি কোনওমতে ধরে চেয়ারে বসিয়ে রাখলাম — এদিকে লম্বা জ্যাকটে প্যান্টের পকেট খুঁজে খুজে কোনও Sorbitrat আর পাই না। ইতিমধ্যে মিসেস টেবিলে মাথা রেখে বলছেন — বমি বমি ভাব হচ্ছে — বমি করবার জন্য কাগজের প্যাকেট এলে বমি হল না, কিন্তু তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কপালে সারা শরীরে, পায়ের দিকে ঘামে ঘামে সব কাপড়চোপড় ভিজে গেল। আমি ধরে কোনওমতে চেয়ারে বসিয়ে রেখেছি। লোক জমে গেল, পাল্‌স দেখলাম তির তির করে চলছে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। লোকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছে। কী উত্তর দেব? প্রায় মিনিট পাঁচেক পর মিসেস আমাদের কথায় সাড়া দিলেন। এখন কেমন লাগছে খুব খারাপ? উঠে দাঁড়াতে পারবে? বললেন, না। সবাই বলল, কিছুক্ষণ আরও বিশ্রাম করুন, ততক্ষণে দুটো প্রায় বাজে। দুটোর সময় আমাদের কোচে ফেরার কথা। আরও কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এবং দু-তিনজনে ধরে এনে কোচে বসালেন। দিল্লির এক ভদ্রমহিলা তার মূল্যবান উলেন কোট এনে দিলেন, ম্যাডাম যেন সামনের র‍্যাকে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে পারেন। সবাই খুব সহানুভূতিশীল। সবাই সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ড্রাইভার সালভাদোরে কোত্থেকে একটা বালিশ এনে মিসেসকে দিলেন, যেন সে বালিশে মাথা রেখে গাড়িতে বসে থাকতে পারেন। বালিশ পাওয়ার পর আমি উলেন ওভারকোট মহিলাকে ফেরত দিলাম ধন্যবাদসহ।

আজ আমাদের ট্যুরের চতুর্থদিন। কাজেই সবাই সবাইকে চিনে ফেলেছেন। গাইড মহেশ তার আগে আমাদের যার যার পরিচিতি দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। চলন্ত গাড়িতে আমরা যে যার পরিচয় দিলাম। কর্ডলেস মাইক নিয়ে বসেছি। আমাদের মধ্যে অনেক ডাক্তার, জুয়েলারির দোকানের মালিক, এক্সপোর্ট ইনপোর্ট বিজনসের মালিক অনেক মেরিন ইঞ্জিনিয়ার কনসালেটেন্ট অনেকে কোনও প্রফেশন ছাড়াই আছেন, আগে চাকুরি করতেন, এখন পেনশন পান ইত্যাদি। এক মহিলা চাটার্ড একাউন্টটেন্ট, নিজেদের স্টিল ম্যানুফেকচারিং ফ্যাক্টরি আছে, সব হিসাবনিকেশ রাখেন।

আমরা এখন সুইজারল্যান্ডে ঢুকেছি, এমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ইউরোপের আর কোথাও নেই। অনেকদিন আগে আমাদের রাজবাড়ির কুমারী বীরবিক্রমের বোনের যক্ষ্মা রোগ হয়েছিল। তখন কোনও ওষুধপত্র ছিল না। শুনেছি সুইজারল্যান্ডের প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় রোগ মুক্তির জন্য তাঁরা এসেছিলেন। মনে হচ্ছিল এমন নির্মল আবহাওয়া পাহাড়ি বাতাসের জন্যই তাঁরা এখানে আসতেন। তখন পৃথিবীর সব দেশ থেকেই মানুষ এখানে রোগমুক্তির জন্য আসতেন।

রাইন নদীর জলপ্রপাত দেখলাম, দূর থেকে লোকে কাছে গিয়ে দেখে এসেছে, আমি মিসেসের জন্য যাইনি, কারণ তখন তাঁর গাড়ি থেকে নেমে টিলা-টঙ্কর বেয়ে জলপ্রপাতের কাছে যাওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না। সালভাদোরে তার গাড়ি খোলা রেখে আমাকে বললেন, তিনি কফি খেতে যাচ্ছেন, পাঁচ মিনিটেই ফিরে আসবেন, আমি যেন গাড়ির দিকে খেয়াল রাখি।

ছয় .

পরে মহেশ এলে আমি মহেশকে পাহাড়ায় রেখে একটু নিচে গিয়ে বাথরুম সেরে আসি। এর আগে চলন্ত গাড়িতে গাইড মহেশ আমাদের সকলের কাছ থেকে আগামী তিনদিনের জন্য যে অপ্‌শন্যাল প্রোগ্রাম আছে, তার লিস্ট দিয়েছিল এবং টাকা জমা নিয়েছিলেন। প্রোগ্রাম ছিল ১ নং টিটলিস বলে পাহাড়ের শিখরে বরফের রাজ্য রোপওয়ে দিয়ে গিয়ে সেখানে সারাদিন কাটানো। তার জন্য লাগবে একশো পঞ্চাশ ইউ এস ডলার। মাউন্ট টিটলিশ দেখে ফেরার পথে লেইক লুসার্ন নৌকা বিহার এবং তার জন্য লাগবে একশো নিরানব্বই ইউ এস ডলার। এবং Jungfraujoch ইয়ংফ্রুয়ক-এ যেতে আসতে একশো নব্বই ইউ এস ডলার। এর সঙ্গে ইন্টারলেকেন বলে সহরে শপিং এবং চকোলেট তৈরির কারখানা দেখা। ইয়ংফ্রয়ক-এ স্ফিংকস টেরেস এবং আইস প্যালেসে নানা ধরনের বরফের তৈরি মূর্তি নানা স্থানে সাজানো, তা দেখা। ইয়ংফ্রুকে বলা হয় টপ অফ ইউরোপ। ইউরোপের সব চাইতে উঁচু পাহাড় ১১৩৩৪ ফুট উঁচু।

সেখানে গিয়েছি ৬ জুন। তার আগের দিন মিসেসের শরীর খারাপ হয়েছিল, আমরা হোটেল টেরেসেই কাটিয়েছিলাম। ৪ জুন cuckoo clock দেখে মিসেসের শরীর খারাপ নিয়ে আমরা সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ এঙ্গেলবার্গ শহরে এসে হোটেল টেরেসে উঠি। হোটেলটা বেশ উঁচু পাহাড়ের ওপরে ফিউনিক্যুলার ট্রেন দিয়ে উঠতে হয়।

একসঙ্গে ১২ জনের বেশি লোক উঠতে পারে না। দুটো ট্রেন আছে। একটা থাকে ওপরে, অন্যটা নিচে — একই সঙ্গে দুটো ট্রেন চলে। ট্রেনের ট্র্যাকও ওপরের নিচের দিকে একটাই শুধু মাঝখানে এসে দুটো ট্রেন পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সেটা বেশ মজার এবং অন্য কোনও জায়গায় এরকম আছে কিনা আমার জানা নেই। উঁচু পাহাড়ের ওপর পাঁচতলা হোটেল। রিসেপশ্‌ন লাউঞ্জের পরে দোতালায় আমাদের রুম ১৬২ নং। রুমের চাবি বেশ বড় সাধারণ চাবি, রুম ইউরোপের অন্যান্য হোটেলের মতই সাজানো। ঝকঝকে, টেলিফোন টেলিভিশন থেকে শুরু করে কি নেই। সর্বমোট একশো চুয়াত্তরটি রুম নাকি ছিল, এখন সে সংখ্যা আরও বাড়িয়েছে। শুধু SOTC-এর পর্যটকরাই প্রায় দুশো হবে। প্রতিটি গ্রুপে পঞ্চাশ জন করে ট্যুরিস্ট রয়েছে। এর মধ্যে সবই ভারতীয়। বুড়োবুড়ি থেকে শুরু করে কচিকাঁচারাও সংখ্যায় কম নয়। আজকালকার যা নিয়ম, যে যত কম বয়েসি, সে ততবেশি স্মার্ট, ততবেশি গেজেটসমৃদ্ধ তাদের জ্ঞান।

আমরা সন্ধ্যায় রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিলাম। মিসেস একটু সুস্থ বোধ করছেন। সাড়ে আটটা ন-টায় ডাইনিং হলে গিয়ে খাবার খেতে পারবেন। পরের দিনের রোপওয়েতে করে টিটলিস, দশ হাজার ফুট উঁচু বরফের পাহাড়ে যাওয়া আমরা ক্যানসেল করলাম, সেইসঙ্গে লুসার্নে শহর দেখা, লায়ন মাউন্টেন দেখা, তেরশ তেত্রিশ সালে তৈরি জেস্যুইট চার্চ, আর লেইক লুসার্নে নৌকা বিহারও বাদ গেল। মহেশকে বললাম কালকের অপশ্যনাল টিটলিস পর্বত আমরা আর যাচ্ছি না। আমরা একটু বিশ্রাম নেব। তিনি বললেন সেই ভাল, তবে আমরা ইয়াংফ্রুয়ক-এ যাব। আশা করি একদিন বিশ্রামের পর আমরা অবশ্যই যেতে পারব।

পরদিন সকালে আমরা নিচে ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্ট করলাম। কিছুক্ষণ লাউঞ্জে বসে রইলাম। আমাদের সহযাত্রীরা অনেকে টিটলিস যাচ্ছিল না। অনেকে নিজেরা দল বেঁধে লুসার্ন যাবেন, জুরিখ শহরে ঘুরে আসবেন, ট্রেন আছে। আমরা আর গেলাম না। ট্রেন শ্লটে পয়সা ফেললে টিকিট বেরিয়ে আসে। দুপুরের দিকে বেরিয়ে এঙ্গেলবার্গ টাউন দেখলাম। লোকজন নেই, এক বুড়ির দোকানে গিয়ে ছোট্ট কাঁচি এবং কিছু স্যুভেনির কেনা হল। দুপুরের প্রায় দিনেই নিজেদেরই খেতে হয়। ঘুরতে ঘুরতে একটা কো-অপারেটিভ শপিং সেন্টারে গিয়ে এক বোতল জল, একটি আপেল, দুটো কলা, দুটো কোকাকোলা এবং একটি রুটি নিলাম। রুটি গরম করার জন্য একটি ওভেন আছে। সেটা একটা বোতাম টিপলে খুলবে। চার পাঁচ মিনিট পরে বের করে নেওয়া যায়। কোন্ বোতাম টিপব আমরা জানি না। ওখানকার মেয়েদের বললাম, আমাদের জন্য রুটি একটু গরম করে দাও। ওরা বলল, তাদের সময় নেই। শেষে যা পেয়েছি সেটা নিয়ে বাইরে একটা ফোয়ারার পাশে বসে খেয়ে নিলাম। সঙ্গেই আবর্জনা ফেলার বাক্স আছে। সেখানে আবর্জনা ফেলে

চলে এলাম একটি ঘড়ি এবং চশমার দোকানে। সেখানে মিসেস একটি চশমা কিনলেন। পরে ঘুরেফিরে সময় কাটিয়ে ফিউনিক্যুলার ট্রেনে চেপে হোটেল টেরেসে ফিরে এলাম। ফিউনিক্যুলার ট্রেনটি যে কেউ অপারেট করতে পারে। বাইরে একটি গ্রিন লাইটের বোতাম আছে। দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে উঠে বসলে, পিঁ পিঁ শব্দ করে আপনা আপনি দরজা বন্ধ হয়ে চলতে শুরু করে। ওপরে কিংবা নিচে স্বস্থানে গিয়ে পৌঁছলে ভেতর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে পরতে হয়। রাস্তায় যে সহযাত্রীরা জুরিখ দেখতে গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা। ওরা জিজ্ঞেস করল চার্চ কোথায়? ওরা গীর্জা দেখতে যাবেন। ততক্ষণে বিকেল পাঁচটা, আমরা আর কয়েকটা দোকানে জিনিস দেখে হোটেলের দিকে ফিরে এলাম। এঙ্গেলবার্গ ছোটো ছিমছাম শহর। স্টেশনে স্যুভেনির-এর দোকানে সাদা কাগজ কিনতে চেয়ে পেলাম না। হোটেলের লাউঞ্জে ফিরে রিসেপশ্নিস্টকে চা পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। যুবতি মহিলা, বলল ওয়ান মিনিট। দুটো প্লেটে দুটো বড় বড় কাচের গ্লাসে গরম জল ভর্তি করে নিয়ে এল। সঙ্গে টি ব্যাগ, চিনির ছোটো ছোটো প্যাকেট এবং ছোটো ছোটো সাদা প্লাস্টিকের চামচ। আমরা খুশি মনে লাউঞ্জে বসে তৃপ্তি সহকারে চা খেলাম। এ না হলে সাতটার সময় রেস্টুরেন্ট খুলবে এবং তখনি চা কিংবা অন্যান্য ড্রিঙ্কস্ পাওয়া যেত। এই যে চা খেলাম, এটা ছিল ব্যতিক্রম। এখনো সূর্য অস্ত যায়নি। দলে দলে অন্যান্য ট্যুরিস্টরা ফিরে আসতে শুরু করল। আমরা রুমে গিয়ে জিনিসপত্র রেখে হাতমুখ ধুয়ে সাড়ে আটটা নাগাদ ডিনারের জন্য লাউঞ্জ হয়ে ডাইনিং হলে গেলাম। মাঝে রেস্টুরেন্টে মহেশকে ইয়ংফ্রুয়েকে যাওয়ার খরচা দিলাম। একশো নব্বুই ইউ এস ডলার করে তিনশো আশি ডলার দুজনের জন্য। ওরা তিন চারজন গাইড মিলে একটা টেবিলে গোল হয়ে বসে ড্রিঙ্ক করছে। মহেশ কোকাকোলা খাচ্ছিল দেখলাম। মহেশ বলল, পরের দিন সাড়ে ছটায় ব্রেকফাস্ট, সাতটায় সবাই যেন কোচের সমানে হাজির হয়। সাড়ে পাঁচটায় কল আপ রিং দেবে। ম্যাডামের শরীর কেমন খোঁজ খবর নিল। আমরা ডিনার খেতে চলে গেলাম।

পরের দিন ৬ জুন, যেখানে কোচ দাঁড়াবার কথা সেখানে সবার আগে আমরা উপস্থিত হলাম। গাড়ি দাঁড়িয়ে কিন্তু সালভাতোরেকে দেখলাম না। শেষে এসে ড্রাইভার কোচ খুলে দিল। আমরা যে যার মতো করে কোচে ঢুকে সিট নিলাম। অনেকে এল ধীরে দেরি করে। কাজেই কোচ ছাড়ল আটটার একটু পরে। কোচ চলল সরু মসৃণ রাস্তা ধরে। প্রথমে লুসার্ন শহর এবং পরে ইনটারলেকেন শহর। চারদিকে উঁচু-নিচু পাহাড়। সবুজ বনানী, নরম মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যপট দেখতে দেখতে আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম। দেরি হয়ে গেছে। বাথরুমে যাওয়ার সময় নেই। ট্রেনেও বাথরুমের কোনও সুবিধে নেই। ট্রেনও এক্ষুণি ছেড়ে দেবে এবং ট্রেন ছাড়লে আমাদের রিজারভেশন চলে যাবে। কিছুটা পাহাড়

তার ওপর লিফট, দৌড়াদৌড়ি করে আমরা চলেছি, কোনদিকে যাব ঠিক নেই, শেষে সালভাতোরে এসে আমাদের লিফটে চড়িয়ে ট্রেনে পৌঁছে দিল। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ট্রেন, কগ্ হুইল, ট্রেন। আমরা ট্রেনে বসার পর মহেশ এল রিজার্ভেশনের টিকিট নিয়ে।

কোনও জায়গায় এঁকেবেঁকে কোনও জায়গায় সোজা টেনে টেনে কগ্ হুইল চলল ওপরের দিকে। বসতি নেই বললেই চলে। তবে একটা বড় জংশনে এসে দেখি একটা যেন ছোটো শহর। চারদিকেই দালান ঘরবাড়ি। লোকজনও বেশি অধিকাংশই স্টেশনের কর্মচারী। মনে হল, বুড়োবুড়িও দেখলাম, এমনি হাঁটছে। জংশনের নাম ডাইজনার। সেখানে ট্রেন বদল করতে হল। কি সুন্দর বরফের গ্লেসিয়ার। চারদিকেই বরফ। শেষে আমরা ১২৩০ মিটার উঁচু ইয়ংফ্রুয়ক-এ পৌঁছলাম। ১১,৩৩৪ ফিট উঁচু। তাড়াতাড়ি করে সকালে ট্রেন থেকে নেমে ভেতরে ঢুকলাম। কারণ হাড় কাঁপানো শীত বাইরে। ভেতরে গিয়ে সকলে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং হলে চলে গেল। সেখানে SOTC-এর সৌজন্যে নিরামিশ খাবারের ব্যবস্থা ছিল, সকলে খেয়ে নিল এবং স্যুভেনির কেনার জন্য দোকানে ভিড় করল। অনেকে উঁচুতে রেয়ারিফাইড এয়ারের কবলে পড়ে অক্সিজেনের অভাবে মাথা ব্যথা বমি বমি ভাব ও অসুস্থতা বোধ করতে লাগল। আইস প্যালেসে যাব ভাবছিলাম, দেখি আমার পা টলমল করছে। মনে হল, ছোটোখাট ভূমিকম্প, অথবা কাঠের ফ্লোর কি নড়ছে? কেন? না কোনওটাই নয়। ভূমিকম্প না, মেঝেও কাঠের না, রীতিমতো টাইল দিয়ে পাকা মেঝে। তখন বুঝলাম, মাথা ঘুরছে, এত উঁচুতে অক্সিজেনের অভাব। মিসেসকে কিছুক্ষণ পর খাবারের দোকানের কাউন্টারের সামনে পাকা নিচু বেঞ্চে বসিয়ে দিলাম। অনেকেই দেখলাম অসুস্থ হয়ে ফ্লোরে এবং দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। যারা পেরেছে তারা অনেকেই উঁচু স্ফিঙ্কস্ টেরেসে উঠে, ইয়ংফ্রুর পিক শিখর দেখতে গিয়েছে, অনেকে আইস প্যালেসে গিয়ে বরফের টানেলে নানা ধরনের বরফের তৈরি এবং সাজানো মূর্তি দেখতে গেছে। আমিও গেলাম, এবং কী অপূর্ব সুন্দর সব মূর্তি তৈরি করে রেখেছে দেখলাম। মনে হল আমাদের অমরনাথের লিঙ্গ মূর্তিও বোধহয় এভাবেই রাখা আছে। এ মূর্তিগুলো কোনওদিন গলবে না। কারণ এখানে অনন্তকালের জন্য বরফের রাজ্য। এই আইস প্যালেস না দেখলে খুব মিস করতাম। কিন্তু অনেকেই দেখতে পেল না, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়াতে। যাই হোক, মিসেস চা কফি খেয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করে অনেক স্যুভেনির কিনলেন নানা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে বিলি করার জন্য।

শেষে ট্রেনের সময় হয়ে এলো। গাইড এসে তাগাদা দিল। আড়াইটায় ট্রেনে চেপে বসলাম এবং ট্রেন নিচের দিকে গড়িয়ে চলল। দরজা জানালা সব বন্ধ। এর মধ্যে প্যাসেঞ্জারদের ক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলার হিড়িক চলেছে। জানালার কাঁচ নামিয়ে ফটো তোলা হয়। আর এক রাশ শীত ট্রেনে ঢুকে পড়ে। বাইরে মাইনাস চার ডিগ্রি সেলসিয়াস

টেম্পারেচার। যাওয়ার সময় ওপরে ওঠার সময় ট্রেনে দুটো মঙ্গোলিয়ান চেহারার বাচ্চা ছেলে দেখলাম। তারা দুষ্টুমি করে দৌড়াদৌড়ি করে ট্রেনের মাঝখান দিয়ে এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাচ্ছে, মাঝখানের দরজা খুলে অন্য কম্পার্টমেন্টেও গেল দেখলাম। কেউ কিছু বলছিল না। বোঝা গেল এরা স্থানীয় বাসিন্দা। কিন্তু এখানে চাইনিজ চেহারার মঙ্গোলিয়ান বাচ্চা ছেলে কি করে এল? তাহলে এরা কি এখানকার অধিবাসী। এখানে কি আগে চাইনিজ জনগোষ্ঠির কেউ ছিল? কালের কপোলতলে এখন এরা সুইস ভাষা বলে এবং মেইনস্ট্রিমের জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। আর পর্বতের শিখরের নাম ইয়ংফ্রুয়ক কি চাইনিজ নাম? আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

নিচে নামতে নামতে যে স্টেশনে আমরা ট্রেনে চেপেছিলাম সেখানে এসে পৌঁছলাম। সেখানে এক জায়গায় আমাদের অতি পরিচিত এমএবিবি বিরাট বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাছেই ড্রাইভার হাসিমুখে — সালভাতোরে এবং সকলে আবার কোচে। এবার নামা, কত রকমের ঘড়বাড়ি, বাগান বাগিচা, ভেড়ার পাল ঘেরাওর ভেতর। ঘেরাও-এর ভেতর, ছোটো দু-একটা ঝরনাও দেখি, রাস্তার দু-পাশে ড্রেন, কোনও কোন জায়গায় ঘাসে ঢেকে গেছে। মোট কথা সব জিনিসকেই সুন্দর দেখছি। মনে আনন্দ ধরে না। একটা জায়গা দেখে এলাম বটে। অবশেষে ইন্টারলেকেন বলে একটা শহরে এসে পৌঁছলাম। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, মাঝে মাঝে থামছে, একটা বিরাট মাঠের একদিকে বড় রাস্তার পাশে আমাদের কোচ থামল। আমরা সবাই নামলাম। অনেকে যাবে চকোলেট তৈরির কারখানা এবং চকোলেট তৈরির পদ্ধতি দেখতে, অনেকে শপিং-এর জন্য অন্যদিকে। আমরা ঢুকলাম। দু-তিনটে ঘড়ি কেনা হল। একটা অর্নামেন্টাল, চুড়ির মতোন, খুলে দেখলে ঘড়ি চলছে, সময় নিয়ে চলেছে। অন্যথায় মনে হবে স্বর্ণের চুড়ি। দাম কিন্তু তিরিশ ফ্র্যাঙ্ক। আমাদের ভারতীয় টাকায় প্রায় পনেরোশো টাকা।

সাত.

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি এই থামে, এই আসে, ফুটপাথের চা কিংবা অন্য ড্রিংকস-এর জন্য চেয়ারগুলো সব উল্টে রাখা হয়েছে। রঙিন ছাতাতেও বৃষ্টি মানছে না। এর মধ্যে ছাতা মাথায় আমরা এ-দোকান সে-দোকান ঘুরেছি, এক দোকানে কমবয়েসি দোকানি, আমার স্ত্রীর হাতঘড়িটি দেখে কত দাম নিয়েছে জিজ্ঞেস করল। আমরা বললাম; তিরিশ ফ্রাংক। ও বলল, ঠিকই আছে, আমাদের এখান থেকে তিনটি ঘড়ি নিলে আমরা একটি

ফ্রি দেব। আমরা দোনামনা করে ঘড়ি নিলাম না, পরে হোটেলে ফিরে এসে স্ত্রী বললেন, এই ঘড়িগুলো নিলে ভালো হত, নাতিনদের এ ঘড়িগুলো গিফ্‌ট দেওয়া যেত। পরে যে কয়দিন ইউরোপে ছিলাম এই ঘড়িগুলো আর পেলাম না। এঙ্গেলবার্গে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ ধরনের ঘড়ি পাওয়া গেল না। ডিজন এবং প্যারিসে এসেও আমরা নানা শপিং সেন্টারে ঘড়ি কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করেছি, এমন ঘড়ি আছে কিনা। কোথাও নেই। এখনো আপশোস সেদিন কেন ঘড়িগুলো কিনলাম না, এমন সুন্দর অর্নামেন্টাল ঘড়ি। এই ইন্টারলেকেন শহর এবং সপিং সেন্টারগুলো এখন চোখের ওপরে ভাসে, ইচ্ছে হয় আবার যাই, ঘুরে ঘুরে যাই, টুকটাক জিনিস কিনি। আসলে এসওটিসি-র ট্যুরিস্টদের সপিং-এর জায়গাই হচ্ছে ইন্টারলেকন শহরটা।

পরের দিন যে প্রোগ্রাম রাখা ছিল, চকোলেট তৈরির ফ্যাক্টরিতে গিয়ে চকোলেট তৈরির পদ্ধতি দেখা, এবং অর্ডার দিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের নামে চকোলেট তৈরি করিয়ে কিনে আনা। সে প্রোগ্রামে ট্যুরিস্টরা বেশিরভাগই যেতে চাইল না, তাই চকোলেট তৈরি ফ্যাক্টরি দেখতে যাওয়া হল না। অনেকে ট্রেনে করে লুসার্ন হয়ে বড় শহর জুরিখ দেখতে গিয়েছিল। আমরা সারাদিন সকাল-বিকেল এঙ্গেলবার্গে মিসেস টুক্‌টাক স্যুভেনির কিনলেন। এক দোকানে ঢুকে মিসেস অনেক খুঁজে পেতে অনেক সময় নিয়ে বেছে বেছে এক সেট গয়না কিনলেন। একটা পেন্ডেন্টওয়ালা নেকলেস, দুটো ম্যাচ করা কানের দুল। দেখতে খুব সুন্দর।

দেখলাম সেলসম্যান এবং ক্রেতার ধৈর্য। ছয়-সাতটা বড় বড় কাঠের ট্রের মধ্যে বহু গয়না, একে একে দেখাচ্ছেন, আর ক্রেতা বেছে নিচ্ছেন, শেষে উল্লিখিত এক সেট গয়না কেনা হল। বিক্রেতা মহিলা সেই সেটটি কৌটায় ভরে এক সুন্দর রঙিন কাগজ দিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে একটি বাক্স বানালেন, যেন উপহার সামগ্রী দিচ্ছেন। মিসেস খুব খুশি হয়ে দাম দিয়ে জিনিস নিয়ে এলেন।

আজকের মতো হোটেল টেরেসে ফিরে শেষ রজনী। পরের দিন ৮ই জুন, আমাদের ট্যুরের অষ্টম দিবস। সাড়ে ছয়টায় ওয়েক আপ কল, সাড়ে সাতটায় ব্রেকফাস্ট, আটটায় কোচে জায়গা নিতে হবে। আমরা স্বামী-স্ত্রী সকলের আগে কোচের কাছে এসে দেখলাম, দেখতে দেখতে গাড়ির কাছে ভিড় লেগে গেল। শেষমেশ সালভাতোরে এল সাড়ে আটটায়, গাড়ি খুলল। লাগেজগুলো কোচের পেটে ঢোকানো হলে। আমাদের গাইড যা বলছে তা আমাদের তাড়া দেওয়ার জন্য। বলেছিল আমাদের আজকে লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে হবে। তাড়াতাড়ি রওনা দিতে পারলে ভালো, তখনও কিন্তু আমাদের গ্রুপের কয়েকজন যাত্রী এসে পৌছায়নি। সালভাতোরে জানত এবং সেজন্য সে অনেক দেরি করে এসেছে। সে যা হোক অবশেষে তাড়াতাড়ি করে সিটে বসা হল এবং হেড কাউন্ট শেষ হল। গাইড

মাইক নিয়ে রাস্তা এবং জায়গার বর্ণনা দিতে শুরু করল। আজকে আমরা ফ্রান্সে ঢুকব। ডিজন বলে একটা জায়গায় রাত্রি কাটাব। এটা ডিউক অব বার্গান্ডির রাজধানী ছিল। খুবই সুন্দর শহর, বাড়ি ঘরের ছাদে নানা রং-এ রঙিন করে রেখেছেন। এটা একটা হেরিটেজ শহর। এখানে একটা স্যাটো আছে পুরানো রাজবাড়ি। আগে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি করে রাখা। শুধু বাথরুম আর টয়লেট আধুনিক করা হয়েছে ট্যুরিস্টদের জন্য।

আমাদের কোচ চলেছে ঘন্টায় একশত দশ কিমি বেগে, মসৃণ রাস্তা যদিও পাহাড় ও উপত্যকা রয়েছে। ফ্রান্সে ঢোকার সময় সেই একই ব্যবস্থা, বর্ডারে আমরা কেউই নামব না, ফটো তোলাও বারণ। শুধু সালভাতোরে আর মহেশ গিয়ে কাস্টমসে রাস্তার ট্যাক্স দিয়ে এল, দু-জন পুলিশের লোক গাড়ির কাছে এল — গাড়িটা ছেড়ে দিল। সাড়ে আটটা থেকে কোচে বসে আছি, এখন সাড়ে এগারটা বারটা বাজে। মহেশ বলল, এক্ষুণি আমাদের কম্‌ফোর্ট স্টপ, সামনে। সেখানে এসে পৌঁছলাম তাই হুড়মুড় করে নেমে প্রায় দৌড়ে ভেতরে গিয়ে বাথরুমে লাইন লাগিয়ে রিলিভড হয়ে এলাম। এখানে প্রচুর ড্রিংকস্। খাবার আর সুভ্যেনির-এর দক্ষিণ অংশে দেখলাম, রেস্টুরেন্টে লোকে খাবার কিনে খাচ্ছে। আমরাও তাড়াতাড়ি গেলাম, চারদিকে ঘুরে ছবি দেখে খাবারের অর্ডার দিলাম। মেমসাহেব, খাবার গরম করে ট্রেতে করে এগিয়ে দিলেন, আমরা ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে পয়সা দিয়ে খাওয়ার জন্য টেবিলে এসে বসলাম। দেখলাম এখানে ইউরো চলে, ইউরো দেওয়ার জন্য ওরা ইনসিস্ট করল, ইউরো বাড়িয়ে দিলাম, ওরা হিসেব করে নিয়ে ব্যালান্স ফিরিয়ে দিল। খাবার খুবই সস্তা মনে হলো। খাবার খেয়ে কফি হাতে বেরিয়ে এলাম, যেখানে কোচ দাঁড়িয়েছিল। তখনও অনেকে আসেনি। পরে সবাই এলে কোচ ছেড়ে দিল। ডিজন শহরে প্রথম আমাদের হলিডে ইন হোটেলে নিয়ে গেল, সেখানে আমরা যে যার এলটেড রুমে লাগেজ রেখে ফ্রেশ হয়ে সময়মতো বেড়িয়ে এলাম, একটা গ্রামে পুরোনো রাজবাড়ি স্যাটোতে বেলি ডান্স দেখে এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ করে ডিনার খাওয়ার জন্য। তার আগে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা আন্ডারগ্রাউন্ডে ওয়াইনারি দেখাতে। কথা ছিল মদ তৈরির কারখানা দেখার, কিন্তু সময়াভাবে সেখানে যাওয়া সম্ভব হল না। তার বদলে যেখানে মদ স্টক করে রাখা হয়, সেখানে আমরা গেলাম। যে আধো অন্ধকার মাটির তলার গহ্বরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল — সেটা প্রস্থ কত মনে নেই তবে দৈর্ঘ্য এক কিলোমিটার। সেখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বোতল মদ রাখা আছে। অনেকের বয়স একশো বছরের কাছাকাছি, অনেকের বয়স পাঁচ, দশ, পনেরো, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর হয়ে গেছে। যে মদ যত বেশি পুরোনো তার তত বেশি মূল্য। তার নাকি তত বেশি স্বাদ। বিরাট বিরাট পিপেও দেখলাম, সেখানেও কি মদ আছে? নিশ্চয় মদই থাকবে।

আমাদের একটা আবছা আলো-অন্ধকার হলঘরে নিয়ে যাওয়া হল এবং ওয়াইন

টেস্টার প্রত্যেককে দেওয়া হলো। খুব সুন্দর জার্মা সিলভারের হ্যান্ডেল ওয়ালা। ওটা দিয়ে দশ বছরের এবং প্রায় ষাট সত্তর বছরের পুরোনো মদ খেতে দেওয়া হল। জিজ্ঞেস করল — কোনটা বেশি স্বাদের। আমার তো মনে হলো, একইরকম স্বাদ। পরে ছাড় দিয়ে আমাদের মদের বোতল কিনতে বললেন। আমরা একটি শ্যাম্পেন বোতল কিনলাম। পরে বাইরে যাওয়ার পথে উপরে এসে দেখি এসওটিসি-এর পক্ষ থেকে প্রতিটি পরিবারকে মহেশ এক একটি করে শ্যাম্পেন বোতল উপহার দিচ্ছে। আমরাও পেলাম। পরে অনেক নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড কোচে পার্কে গিয়ে কোচে উঠলাম। অনেক কসরত করে কোচ সেখান দিয়ে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এল। এখন আমরা যাব সেই শ্যাটোতে যেখানে নাচ-গান এবং, বেলি ডান্স এবং ডিনার হবে। Chateau মানে হচ্ছে ইউরোপের কোনও অভিজাত ব্যক্তির বিরাট পল্লি ভবন বা দুর্গ। আগেই বলেছি এটা একটা হেরিটেজ বিল্ডিং। ফরাসি সরকার এটা যেমন ছিল, তেমনিভাবে রেখে দিয়েছে। মেরামতও করতে দেয় না। শুনলাম, শুধু বাথরুম আধুনিক করে দিয়েছে. গাঁয়ের ছোটো ছোটো রাস্তা অতিক্রম করে ছোট্ট এক গেইট পেরিয়ে আমরা গাছ-গাছড়া ভর্তি মাঠের মাঝখানে একটি পুরোনো দালানে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকেই উদ্যানমতো, ইটের সোলিং দিয়ে শক্তপোক্ত করে রাখা হয়েছে। বেশ বড় বারান্দা। তিন-চারটে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। যেখানে আমাদের কোচ দাঁড়াল তার বিপরীত উঠোনে রঙিন ছাতার নিচে বড়ো বড়ো গোলটেবিলে বসে নাচগানের দেখার ব্যবস্থা কর হয়েছে। আমাদের কোচ এখন চলে যাবে, কারণ ড্রাইভার সালভাদোরে সাড়ে আটটা থেকে গাড়ি চালিয়েছে, এখন কিছুক্ষণের মধ্যে সাড়ে আটটা বাজবে। সে আর গাড়ি চালাতে পারবে না। কারণ একজন ড্রাইভার ১২ ঘন্টার বেশি গাড়ি চালাতে পারে না। এরোপ্লেনে যেমন ব্ল্যাকবাক্স থাকে, এসব কোচেও নাকি, ডিসক্ থাকে, যেখানে আজকের তারিখ ড্রাইভারের নাম গাড়ির নম্বর কটা থেকে কতক্ষণ ধরে কত কি. মি. চলেছে সবই রেকর্ড হয়ে যায়। এবং এ রেকর্ড পুলিশ সবসময় পরীক্ষা করে দেখে, যাতে কেউ নিয়ম না ভাঙে।

মহেশ বলল, যার যার হ্যান্ডব্যাগ বের করে রাখুন, শ্যাম্পেনের বোতল গাড়িতেই থাকুক, সেগুলো লক করা কোচে সালভাদোরের হেফাজতেই থাকবে। হারাবার কোনও আশঙ্কা নেই। কাল সকালে আবার ওই কোচই রওয়ানা দেবো। আজকে রাতে আমাদের অন্য গাড়িতে করে হোটেলে পৌঁছে দেওয়া হবে। সালভাদোরে গাড়ি নিয়ে চলে গেল হোটেলে। সামনের পুর্ব দিকের বিরাট দরজা দিয়ে ঢুকে একটা হলঘর মতোন, চারদিকে চেয়ার পাতা, লেখা আছে প্রাইভেট। সেই রুমের পশ্চিমে তেমনি এক বল রুম যেখানে মাইক এবং গান বাজনার জন্য ডিভিডি প্লেয়ার ইত্যাদি ফিট করা আছে। পশ্চিমের বারান্দায় একটা চাতাল মতো, সেটা থেকে চার-পাঁচটা বড় বড় সিঁড়ি নিচে উঠানে নেমে

গেছে। উঠান বেশ বড়। উঠানের চারদিকে বড় টেবিল এবং টেবিলের ওপর বড়ো বড়ো রঙিন ছাতা বসানো। চারদিকে ট্যুরিস্টরা বসেছে। রীতিমতো মেলা বসে গেছে। টেবিলগুলোর ওপর ঝকঝক জগে জল, দুটো করে শ্যাম্পেনের বোতল এবং অন্যান্য ওয়াইনের বোতল, বড় বোতল কোকাকোলা কাচের গ্লাসে করে এবং পেপার ন্যাপকিন। কি সব স্ন্যাকসও প্রচুর রয়েছে। মাঝখানে ফাঁকা উঠানে নাচের জন্য সকলকে ডাকা হচ্ছে। মাইকে এক যুবক ট্যুরিস্ট গাইড, যিনি এর আয়োজন করেছেন। তিনি নাকি ব্রিটিশ সিটিজেন ইন্ডিয়ান। গাইছেন মুঝে সাদি করোগি.... গান। পঞ্চাশ ষাটজন ট্যুরিস্ট গানের সঙ্গে নাচ শুরু করেছেন, তার মধ্যে উত্তর ভারতের লোকই বেশি আর ছেলেমেয়ে ও যুবকরা। এদিকে শীত পড়ে আসছে। সন্ধ্যে সাতটা হবে, যদিও সূর্য তখনও জ্বলজ্বল করছে এবং আসছে প্রচুর ঠান্ডা হাওয়া। ওপরে ঘরের ভেতর একটা রুমে রান্নাবান্না হচ্ছে। তন্দুরি চিকেন, নান রুটি থেকে শুরু করে কি নেই? কতরকমের নাচ হয়েছে, মিউজিকেল চেয়ারও হল, দশ-বারো রকমের আইটেম নাচ হয়েছে, এর মধ্যে যে বা যারা ফার্স্ট হয়ে গেছে তাদের নামও ঘোষণা হচ্ছে। যারা দর্শক তারা বসে বসে ড্রিংকস ও শ্যাম্পেন নিচ্ছে। শীতের দাপটও বাড়ছে। কারণ খোলা মাঠ। শেষে প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ এক মহিলা এলেন, বেলি ডান্সার, ছোটোখাটো, নন হোয়াইট ব্রাজিলিয়ান, নাম লুসিয়ানা। আমরা ভেবেছিলাম, ফরাসি-টরাসি হবে, একটু নিরাশই হয়ে গেলাম। সে যাই হোক, অনেক নাচল, তেমন আহামরি কিছু নয়। এক ভদ্রলোককে দর্শকের মাঝখান থেকে ধরে নিয়ে গেল, তাকে রঙিন কোট পরিয়ে টুপি ইত্যাদি পরিয়ে চেয়ারে বসিয়ে তাকে ঘুরে ঘুরে সেই চাতালেই নাচলেন। প্রচুর হাততালি সহকারে সব সাঙ্গ হল। যারা নাচে ফার্স্ট হয়েছিল প্রাইজ দেওয়া হল। অনেকে শ্যাম্পেন বোতলও পেয়েছিল। আমরা খাবার জন্য ভেতরে গিয়ে প্লেটে করে যার যার পছন্দমতো খাবার নিয়ে খেলাম। অনেক বুড়োবুড়ি আর একটা উত্তরের ঘরে গিয়ে বসে খেল। সেটা মনে হল লাইব্রেরি, কারণ চারদিকেই বইয়ে ঠাসা আলমারি। ঘরে এইজন্য যে বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল। সব শেষে এবার হোটেলে ফেরার পালা, রাত দশটা। কিন্তু তখনো সূর্য অস্ত যায়নি। সমগ্র ইউরোপেই এই অবস্থা, সূর্য একেবারে অস্ত যায় কিনা সন্দেহ আছে।

অনেক আমোদ ও স্ফূর্তি উপভোগ করে ক্লান্ত শরীরে হোটেলে ফিরে এলাম। একটাই আইটেম, বেলি ডান্স। সেটা কোনও ডান্সই হয়নি। বেলিতো দূরের কথা।

আট.

৯ই জুন, ব্রেকফাস্টের পর আবার লাগেজ গাড়িতে তোলা হল, চলেছি প্যারিসের পথে। এখান থেকে ৯০ কি.মি। মাত্র। রাস্তায় কোনও থামাথামি নেই, আমরা দুপুরে

গিয়ে পৌঁছাব। কারণ রাস্তায় এখন গাড়ির প্রসেশন চলছে, স্পিড আর নেই। ওভারটেকের কোনও প্রশ্ন নেই। প্রায় বারোটায় আমরা প্যারিসের সুবার্বে গিয়ে পৌঁছলাম। শ্যেন নদী অতিক্রম করে ঢুকেছি। কচ্ছপ গতিতে গাড়ির সারি চলেছে। রাস্তার ওপরে জায়গায় জায়গায় তোরণের মতো বিশাল বিশাল বোর্ডে লেখা রয়েছে, অমুক জায়গায় পৌঁছতে তোমার ১৫ মিনিট লাগবে, অমুক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে ১০ মিনিট লাগবে। এভাবেই এগোচ্ছি। এগোতে এগোতে আইফেল টাওয়ারের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। চারদিকে লোকে লোকারণ্য, কোচ পার্কিং-এর কোন পার্কিং শ্লট নেই, জায়গাটা যদিও বিরাট মাঠ, পার্কিং রাস্তাসহ অনেক বড়। গাড়ি রাখতে গিয়ে ব্যাক করে করে সালভাতোরে কি করে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির সামনেটায় লাগিয়ে দিল। একটু খানি ডেন্ট হয়েছে কি হয়নি, তবুও ফরাসি ইংরেজি আর ইটালিয়ান ভাষা মিলিয়ে তর্ক বিতর্ক হয়েছে। শেষ যার গাড়িতে লেগেছে, তিনি আর কি করেন ছেড়ে দিলেন। আগের কথামতো এখানে মহেশ আমাদের প্যাকেট লাঞ্চ বিতরণ করে দিল। বলল, সবাই তাকে যেন অনুসরণ করে চলে আসেন। তিনি গ্রুপ টিকিটও কাটবেন এবং লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা বিরাট লিফটে চড়ে উপরে যাব। প্রথমে যে তলা সেখান পর্যন্তই আমরা যাব। আরও উপরের দিকে যাওয়ার সময় নেই। যদি কেউ যেতে চান তবে টিকিট কেটে লিফটে করে যেতে পারেন। অনেক উঁচু লোহার ইমারত বলা যায়। এটা দেখতে দেখতে সারদিনেও শেষ হবে না। আমাদের বলা হল সবাই যেন দুটোর মধ্যে যেখানে বাস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে যেন চলে আসি। চারটে লিফটের মধ্যে একটা লিফটে আমরা প্রায় ৬০-৭০ জন লোক একসঙ্গে আইফেল টাওয়ারে উঠে গেলাম। বিরাট চত্বর। সুভ্যেনির দোকান আছে, রেস্টুরেন্ট আছে। আমরা বসার জায়গায় চেয়ার পেলাম না। একটা পার্টি আমাদের চেয়ার ছেড়ে দিলে সেখানে বসে আমরা খাবার খেয়ে নিলাম। তারপর ঘুরে, দেখে ফটো তুলে গেলাম স্যুভেনির কিনতে দোকানে। কিছুক্ষণ ঘুরে দেখে কয়েকটা জিনিস নেয়া হল। একটা হচ্ছে আইফেল টাওয়ারের প্রতিকৃতি। লাইট আছে, জ্বালানো যায়। কিন্তু দাম দিতে গিয়ে এক দঙ্গল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে আটকে গেলাম। সেলসওম্যানকে বললাম, আমাদের বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের আগে ছেড়ে দিন। আকারে ইঙ্গিতে আমাদের লাইনে থাকতে বললেন। আমরা অধৈর্য হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওখানে দুটো বেজে ছয় মিনিট হয়ে গেল। তারপর ঘুরে ঘুরে যে লিফট নিচে নামছে সেখানে কোনওমতে ঢুকে বেরিয়ে এলাম। ততক্ষণে আড়াইটা বেজে গেছে। আমরা দৌড়ে চলে এলাম বাসের কাছে। মহেশ বলল, আমরা ভাবলাম আপনারা বোধহয় হারিয়ে গেছেন। সে যাই হোক, এই একবারই আমরা লেট হয়েছি। তাড়াতাড়ি করে আমাদের যেতে হবে, কারণ শহরটা চক্কর মেরে অনেক দ্রষ্টব্য, ঐতিহাসিক ইমারত, স্তম্ভ, চার্চ ইত্যাদি দেখতে হবে। এর মধ্যে

মহেশ এক ছোটোখাটো টুপি মাথায় সাহেবকে ধরে পরিচয় করিয়ে দিল, তিনি এখন থেকে আজকের জন্য আমাদের গাইড। আইফেল টাওয়ারের পরে একটা আর্মি স্কুল যেখানে নেপোলিয়ন মিলিটারি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন সেটা দেখানো হলো। নেপোলিয়নের বিজয়স্তম্ভ, চূড়াটা আড়াই টন খাঁটি সোনায় মোড়া। ইংরেজরা নেলসনকে নিয়ে যেমন গর্বকরে, ফরাসিরা তেমনি নেপোলিয়নকে নিয়ে। দুজনেই যার যার জাতির গর্ব। সকলে নেমে ক্যামেরা নিয়ে পোজ করে ফটো তোলা হল। আমরা আর নামলাম না। সে ফরাসি গাইড বললেন, একসময় আইফেল টাওয়ারই ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ইমারত। আমেরিকানরা যখন ১০৩ তলা নিউ এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং তৈরি করল তখন আইফেল টাওয়ারের সে উচ্চতা হারিয়ে গেল। এখন ফরাসি গভর্নমেন্ট একটা উঁচু বিল্ডিং করার জন্য কাগজ কলমে ডিজাইন করে রেখেছেন, কিন্তু টাকার অভাবে সেটা তৈরি করতে পারছেন না। যদি এটা তৈরি করা যায় তবে এটাই আবার পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু ইমারত হবে।

আমরা এগিয়ে চলেছি। কনকর্ড বলে একটা সেন্ট্রাল স্কোয়ারে এসে গাড়ি আর চলে না। জ্যাম হয়ে গেছে। পাঁচ-ছয় দিক থেকে বড়ো ছোটো গাড়িগুলো আসছে, আর সেখানে আটকে যাচ্ছে, তিন-চারজন কালো ট্রাফিক অফিসার কন্ট্রোল করতে হিমসিম খাচ্ছেন। অনেকসময় নিয়ে ধীরে ধীরে সেই জায়গাটা পেরোলাম। ওই দিকে আমেরিকান এ্যাম্বেসি, তার পাশে সবচাইতে দামি হোটেল। বাইরে থেকে দেখতে আহামরি কিছু নয়। তবে এখানে পৃথিবীর বহু দেশের রাজা-মহারাজারা, ধনিক বণিক সম্রাটেরা এসে ওঠেন। মিসেস ডায়ানাও মৃত্যুর আগে এখানে থেকেছিলেন। আমরা আরও এগিয়ে আর একটা বাধার সম্মুখীন হলাম, কী ব্যাপার ? না এখানে কমিউনিস্টরা ডেমনোস্ট্রেশন দিচ্ছে, ওদিকে গাড়ি যেতে দিচ্ছে না পুলিশ। অবশ্য চারটার পরে ডেমনোস্ট্রেশন শেষ হয়ে গেলো। সব গাড়িই ওদিকে গিয়ে ঘরে এল। একটা বিখ্যাত চার্চ নতরদাম ক্যাথিড্রেল আমরা গাড়িতে বসেই দেখলাম। প্যারিস শহরের মাঝখান দিয়ে শ্যেন নদী চলে যাচ্ছে। শ্যেন নদী পারাপারের জন্য অনেক ব্রিজ আছে। আমাদের একটা টানেল দিয়ে নিয়ে গেল এবং সেই ব্রিজের তেরো নম্বর থামে মিসেস ডায়ানার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল এবং তিনি সেখানে মারা যান। সেই থাম যেমন ছিল তেমনিই নাকি থাকবে। ওখানে কোনও মেরামত বা স্মৃতি রক্ষার কোনও ব্যবস্থা থাকবে না। যদি কেউ ফুল দিতে চায় তবে পুলের ওপর একটা জায়গা আছে রেখে দিয়ে যেতে পারে। প্যারিস ফ্যাশেনের জন্য, আর্টের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। পৃথিবীর সব আর্টিস্টদের তীর্থস্থান এটা। এখানে না এলে তাদের জীবন অপূর্ণ থেকে যায়। এখানে এসে আর্টের স্কুলে শিক্ষা নিতে পারলে আর্টিস্টের জীবন সার্থক। সেই প্যারিস ঘুরে ঘুরে আমরা দেখছি, কত কথাই মনে হচ্ছিল। এখানে একদিন ওভার

স্টে করে থাকার বন্দোবস্ত করা যেত, আরও কিছু টাকা খরচা হত, কিন্তু সে ব্যবস্থা করলাম না, দেশে ফেরার সময় প্লেনে একলা পড়ে যেতাম। বিদেশ-বিভুঁয়ে কে কাকে সাহায্য করে?

এবার আমাদের নিয়ে আসা হল, বেন লাকস বলে একটি পারফিউমের দোকানে, ডিউটি ফ্রি শপ, হুড়মুড় করে সকলের সঙ্গে দোকানে ঢুকলাম, কিন্তু পারফিউমের আমরা কি বুঝি? লোকে কে কি কিনছে দেখতে দেখতে সময় প্রায় শেষ হয়ে এল, শেষে যা হাতের কাছে পেয়েছি, তাই কয়েকটা কিনে নিলাম, মিসেস অনেক রঙ বেরঙ-এর লিপস্টিক কিনলেন, নাতনিদের জন্য। ডিউটি ফ্রি শ্‌প, মানে ডিসকাউন্ট দেবে, তবে যারা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কিনেছে তারা এক্ষুণি ডিসকাউন্টের টাকা ফেরৎ পেয়ে গেল। আমরা ইউরো ক্যাশ দিয়ে কিনেছি। আমাদের কাগজপত্র দিয়ে দেবে, সেটা দ্য গল আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে কাস্টমসে গিয়ে দেখাব, কে কি পারফিউম কিনেছি, তবে তারা একটা কাগজে স্টাম্প মেরে দেবে, সেটা ক্যাশ কাউন্টারে নিয়ে গেলে আমরা ক্যাশে ডিসকাউন্ট ফেরত পাব। সেটা পেয়েছিলাম যেদিন ফিরে আসি, সেদিন এয়ারপোর্টে।

বেনলাকস্ কসমেটিক সেন্টারের পরে হোটেলে নিয়ে গেল। চেক্ ইন করার জন্য। ফরেস্ট হিল টপ হোটেল। ওখানে চেক্ ইন করে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আবার বেরোব। সময় আধঘন্টা। এখান থেকে কোচ এমএবিবি-এর এবং ড্রাইভার সালভাতোরে চলে যাচ্ছে। অনেক হ্যান্ডশ্যাক হল, ফটো তোলা এবং অটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে। অনেকদিনের প্রিয় বন্ধু চলে গেল। সকলে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। আমরা চললাম অন্য কোচ করে রেস্টুরেন্টে ডিনারের জন্য। সারি সারি রেস্টুরেন্ট। ফুটপাথে রঙিন ছাতার নিচে বসে প্রচুর লোক চা, কফি, ড্রিংকস্ খাচ্ছে। আমরা সবাই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। ঘরের শেষদিকে বিরাট লম্বা কাউন্টার। বহু কাউন্টারে অনেক লোকের লাইন। লোকে গিজগিজ করছে। দু-তিনজন লোকের পেছনে আমরাও দাঁড়ালাম। লোকে সুন্দর সুন্দর খাবার ট্রেতে নিয়ে, পয়সা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি খাব, কোনও খাবারের নামই আমার জানা নেই, শেষে চপস ফিস ফ্রাই নিয়ে ইউরো দিলাম, ওরা কম্পিউটারে হিসাব করে ক্যাশমেমো দিয়ে দিল। ওখান থেকে কোকাকোলা বা অন্য ড্রিংকস্ নিতে ভুলে গেলাম। সস্‌ও আনলাম না। এখন আবার লাইনে গিয়ে কোকাকোলা আনতে অনেক সময় লেগে গেল। এদিকে বসে খাবারের প্রশ্ন ওঠে না, দাঁড়িয়ে খাবার জায়গাই নেই। শেষে ট্রে রাখার জায়গা পেলাম। এখন পেপার ন্যাপকিন কোথায় পাই? একজনকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি চট করে গিয়ে অনেক পেপার ন্যাপকিন এনে দিলেন। কাঁটা চামচ? সেও সেই ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন। খাবার খাওয়ার পর ট্রে লোকে কোথায় ফেলে?

দেখা গেল ট্রে ফেলবার জায়গা। ট্রে রেখে আসার পর মিসেস বলল, আইসক্রিম বা ওই জাতীয় কিছু খাবেন। সেগুলো আবার ওই ঘরের একদিকে বিক্রি হচ্ছে। সেটাও নেওয়া হল, এদিকে মহেশ এসে বলে গেল, হারিয়ে যাবেন না। দলের সঙ্গে কোচে চলে আসুন। তাড়াতাড়ি করে এক ছোট্ট বাচ্চাসহ দম্পতিকে অনুসরণ করলাম। তখন প্যারিস সন্ধ্যার সজ্জায় ঝলমল করে উঠেছে। ফটো তোলার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। এর মধ্যে দেখলাম, যে দম্পতিকে অনুসবণ করছিলাম, তারা নেই। কি হলো ? তাঁরা কোথায় গেল। শেষে দেখলাম তারা আমাদের পেছন দিক থেকে আসছে। ওরা ফটো তুলছে।

শেষে সবাই কোচে চলে এলাম। এবার ইভিনিং ইন প্যারিস। এক জাহাজঘাটায় নিয়ে আমাদের স্টিমারে উঠিয়ে দিল। শ্যেন নদীর উপর আমরা, স্টিমারে চলেছি, পাড়ে বিখ্যাত সব ইমারত, কিছুক্ষণ পর পরই আমরা কোনও না কোনও ব্রিজের তলা দিয়ে যাচ্ছি। এর আলেকজান্ডার ব্রিজ ন্যাশনেল এসেম্বলি, এবং তারপর একটা দ্বীপের মতো একটা জায়গায় দেখলাম স্ট্যাচু অব লিবার্টি। এটাই নাকি অরিজিনাল স্ট্যাচু, ফরাসিরা নাকি আমেরিকানদের এটার প্রটোটাইপ করে আমেরিকান স্ট্যাচু অব লিবার্টি উপহার দিয়েছে। যেটা আমেরিকানরা নিউইয়র্কের প্রবেশপথের বন্দরে রেখে দিয়েছে। সেই স্ট্যাচুর বাঁ হাতে আইনের বই, ডান হাত উঁচু করে একটি টর্চ ধরে রাখা। আধ ঘন্টা মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা আবার ফিরে চললাম — যে ঘাটায় স্টিমার চড়েছি সেখানটায়। জাহাজ থেকে নেমে আবার কোচে। এতবার কোচে করে ঘুরে ঘুরে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত প্যারিসের রাস্তাঘাট, দালান, স্ট্যাচু দেখতে দেখতে চললাম, আটটা বেজে গেছে। আইফেল টাওয়ার আলোকিত হয়ে উঠেছে। এবার আমরা পশ্চিমদিক থেকে আইফেল টাওয়ার দেখবার সুযোগ পেলাম। কোচ দাঁড়াল, সবাই নেমে গিয়ে টাওয়ার দেখলাম, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ.বাসে, সবাই ফটো তুলছে। কালো মানুষেরা টুকটাক জিনিস কেনার জন্য সাধাসাধি করছে, তারা নাকি এসব বিক্রি করেই তাদের খরচপত্র চালায়। ওখানে অনেকক্ষণ কাটিয়ে আবার কোচে করে আরও অনেক শহরের অংশ দেখে প্রায় সাড়ে দশটায় হোটেলে ফিরলাম।

মহেশ বলে দিল, আগামীকাল সাড়ে ছটায় ওয়েকিং কল, সাড়ে সাতটায় ব্রেকফাস্ট এবং আটটায় কোচে মালপত্র নিয়ে দ্য গল আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট যেতে হবে, সাড়ে ন-টা রিপোর্টিং। একটায় আমাদের প্লেন টেক অফ করবে।

নয় .

১০ই জুন, ২০০৫। সকালে স্নানাদি সেরে ব্রেকফাস্ট করে যে যার ব্যাগ লাগেজ নিয়ে আমরা কোচে উঠলাম। তখন সাড়ে আটটা। সাড়ে নটা বা দশটা বাজবে এয়ারপোর্টে

পৌঁছোতে। অনেকদূর এয়ারপোর্ট। আমাদের আবার কসমেটিক্সগুলো একটা হ্যান্ড ব্যাগে রেখে বসতে হবে। কারণ এগুলো কাস্টমস চেক্ করবে এবং ডিসকাউন্টের জন্য ছাপ দেবে। সেটা যে এয়ারপোর্টের কোন অংশ, তাই আমার জানা নেই সেই একটা উৎকণ্ঠা। মহেশ বলল, ও দেখিয়ে দেবে।

এয়ারপোর্টের আট নং দরজায় যেখানটা এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউন্টার সেখানে পৌঁছেছি দশটায়। বাস থেকে নেমে লাগেজগুলো একত্র করে দুটো ট্রলি করে ঢুকলাম। ঢুকেই কিউ। ছোট্ট জায়গা, কাউন্টারের সামনে লোহার শিকল কয়েকটি স্ট্যান্ডের মাথায় লাগিয়ে একবার দক্ষিণে একবার উত্তরে করে অনেকগুলো কিউ বানানো হয়েছে। একটা কিউতে তিন-চারজনের বেশি লোক নেই। এঁকেবেঁকে কিউ এক একটা। পার্টির যতজন লোক আছে, ততজনই কিউতে দাঁড়ানো, ফলে গিজগিজ করছে যাত্রীতে যাত্রীতে। আমাদের লাগেজ হয়েছে বড়ো চারটে, ছোটো বা হ্যান্ড ব্যাগ আর তিন-চারটে। কিউ এগুচ্ছে, আমরাও এগুচ্ছি, শেষ কিউর বাইরে দুই পার্টি চেক ইন করছে। দেখা গেল বিজনেস ক্লাসের কাউন্টার খালি, আমারে সামনে মহেশ্বরী প্রসাদ আর তার স্ত্রী, বললাম এগিয়ে যান। তাঁরা গেলেন এবং চেক ইন হয়ে গেল। আমরা যখন গেলাম তখন একজন এয়ার ইন্ডিয়ার কালো অফিসার বললেন — ওটা বিজনেস ক্লাস কাউন্টার, আপনারা যাবেন না। তবু আমরা গেলাম কারণ মহেশ্বরী প্রসাদরা তাহলে কি করে গেল? আমাদের মালপত্র ওজন করে চেক ইন করে দিলেন ভদ্রলোক। বোর্ডিং কার্ডে কোনও সিট নম্বর নেই, তাহলে? সে পরে দেখা যাবে। এখন কাস্টমস-এর কাউন্টারে গিয়ে আপনাদের কস্‌মেটিকস্ দেখাতে হবে। মহেশ বলল, ওদিকে যান পেয়ে যাবেন। দুজনে মিলে গেলাম এবং কাউন্টারও পেয়ে গেলাম। কাস্টমস কাউন্টারে কাগজ বাড়িয়ে দিলাম, ওরা জিনিসগুলো দেখল এবং একটা স্ট্যাম্প মেরে দিল, বলল ক্যাশ কাউন্টারে যাও, সেখানে কাগজটা দেওয়া মাত্র মেশিনে ক্যাশ হিসেব করে আমাদের ইউরো ফেরত দিয়ে দিল। চেক ইন কাউন্টারের কাছে আসতেই মহেশ বলল — সিকিউরিটি চেকে চলে যান। মহেশের সঙ্গে হ্যান্ডশ্যাক করে সিকিউরিটিতে গেলাম, সেই একই অবস্থা। যাত্রীতে যাত্রীতে গিজগিজ করছে। ছোটো জায়গা, সেই আঁকাবাঁকা কিউ, অনেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বসে পড়েছে। শেষ চেকিং ক্যামেরা চাবি কয়েন সব একটা ট্রেতে দিয়ে চেকিং চলছে। মহিলা মিসেসকে বলল — তোমার ব্যাগ খোলো। খুলে একটা ছোট্ট কাঁচি পাওয়া গেল, ভুলে রয়ে গেছে। বলল এটা নেয়া যাবে না। কি করি, ডেস্ট্রয় করে ফেলো। বললাম, তোমরা ডেস্ট্রয় করে ফেলো। মহিলা আমাদের সামনেই সেটা ডেস্ট্রয় করে ফেলল। আমরা ওয়েটিং লাউঞ্জে চলে এলাম। এখন দেখছি আট নম্বর গেইট দিয়ে

আমাদের প্রস্থান। টেক অফের এখনো অনেক দেরি, তাই মিসেস আবার স্যুভেনিরের সন্ধানে গেলেন।

একটা ছোটো দোকানে মিসেস শো-কেশে একটা গহনা মতন জিনিস কিনতে চাইলেন। কাউন্টারে এক মহিলা ও একজন ভদ্রলোক ছিলেন। ভদ্রলোক বাইরে এসে দেখলেন জিনিস। দোকানের ভেতর গিয়ে ড্রয়ার খুলে প্যাকেট নিয়ে ওইরকম জিনিস বের করতে চাইলেন। যেই না ড্রয়ার টান দেওয়া এমনি কেঁউ কেঁউ শব্দ হতে লাগল। আসলে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে ড্রয়ারগুলো খোলার কথা। কিন্তু রিমোট নিয়ে মহিলা বাইরে গেছেন। তাই এই বিপত্তি। শেষে মহিলা এসে দেখল ড্রয়ারের সেই জিনিস নেই, কাজেই অনেক ফোনাফোনি করে কর্তাদের অনুমতি নিয়ে তাদের সেই জিনিসটাই বিক্রি করতে হল।

এদিকে আমাদের ফ্লাইটের কোনও খবর নেই। ফ্লাইট-এর শেষ খবর পাওয়া গেল আট নয়, ছয় নম্বর গেট দিয়ে আমাদের বোর্ডিং হবে। দেখলাম কর্মচারীরা এসে গেটে দাঁড়িয়েছে। সবই ঠিকঠাক। আমরা প্রায় অধৈর্য হয়ে লাইন দিয়েছি। তবে এখানেও লম্বা লাইন দেওয়ার কোনও জায়গা নেই, যেমনটি দিল্লি কিংবা কলকাতায় রয়েছে। এক একজন অফিসারমতো লোক আসছে, নিজেরা কথাবার্তা বলছে, মনে হচ্ছে এক্ষুণি বুঝি খুলে দেবে, কিন্তু খোলে না। ওদিকে কিন্তু বেশ বড় করিডোরে লোক চলে এসেছে। আবার একপ্রস্থ চেকিং-এর জন্য এবং এয়ার ইন্ডিয়ার জাম্বোজেট অনেকক্ষণ দাঁড়ানো, দেখাই যাচ্ছে। শেষে পৌনে একটায় দরজার শেকল খুলল এবং আমরা একে একে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে এগিয়ে চললাম। বোর্ডিং কার্ড-এর কাউন্টার ফয়েল ফেরৎ নিয়ে অ্যারো ব্রিজ দিয়ে প্লেনে প্রবেশ। যথারীতি বোর্ডিং কার্ড দেখে এয়ারহস্টেস দুজন প্রবেশ পথ থেকে বলে দিচ্ছে কে কোন্ দিকে যাবে। আমাদের বোর্ডিং কার্ডের কাউন্টার ফয়েল দেখে বলে দিল, আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাব। আমাদের কোনও সিট নাম্বার ছিল না। আমরা কিছুটা অবাক হয়ে খুশিমনে ওপরে উঠে গেলাম। জাম্বোজেটের দোতলা। এতদিন শুধু বাইরে থেকে দেখেছি, এবার ভেতরে চলেছি। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে আরও অবাক হবার পালা। মধ্যবয়সি এক এয়ারহস্টেস সিঁড়ির মাথায় যেতেই ট্রে থেকে হাসিমুখে জনে জনে একটি করে ভেলভেটের পাউচ দিলেন, দেখেই বুঝলাম, ভেতরে পারফিউম রয়েছে, কারণ সুগন্ধ বেরোচ্ছিল। এখানে কোনও সিট নম্বর নেই। আমাদের যেখানে বসতে দিলেন, তার সামনে খালি জায়গা, বাঁয়ে একটা লম্বা গর্তওয়ালা ড্রয়ার রয়েছে, যেখানে ব্যাগ রাখা যায়। আমাদের সিটের সঙ্গে লাগানো ট্রে রাখার জায়গা খুলে দিলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট ট্রে নিয়ে আমাদের সামনে এলেন, আমরা বুঝতে পারছি না, কোন্ পানীয়

নেব, কারণ ছোটো বড় লাল নীল হলুদ হরেকরকমের পানীয় বোতল রয়েছে। শেষে ভদ্রমহিলা নিজেই একটা করে কাচের গ্লাস ও তাতে বরফের কিউব দিলেন এবং হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশির মতো শিশি খুলে সেই বরফে সাদা ঘন লিকুইড ঢেলে দিয়ে বললেন, এটা খান। আমরা খুশিমনে প্রথমে একটু চেখে বললাম, দারণ জিনিস। মিষ্টি মদ, তারপর আরও অনেক পানীয় আমাদের খাওয়ালেন। আস্তে আস্তে বিরাট প্লেন নড়াচড়া শুরু করল। শেষে টেক অফ। প্রায় এক ঘন্টা পরে খাবার নিয়ে এল। আমাদের সিটটা একেবারে রিক্লাইন করে বিছানা বানিয়ে দেয়া যায়, শুধু বোতাম টেপার অপেক্ষা। আমাদের সামনে অন্য কোনও সিট না থাকার ফলে এটা আরও সুবিধা হয়েছে। এরপর বিশ্রাম। প্রায় ঘন্টা চারেক পরে আবার খাবার এল টিফিন, আমরা আর কিছু খাইনি, তখন যা লাঞ্চ নিয়েছি সেটাই হজম হয়নি, অন্যেরা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু খেল দেখলাম। দু-ঘন্টা বাদে ডিনার। এরপর লাইন সুইচ অফ্। মধ্যে রয়েছে সেই মহিলাই আমাদের হোস্টেস। আরও দুজন পুরুষ পারসার, মহিলা মিসেসকে এসে বলল, আপনাকে দেখে আমার আন্টির কথা মনে পড়েছে। আমার আন্টি হুবহু আপনার মতন। তিনি নেপালে থাকেন। এই হোস্টেস মিসেসকে খুবই আদর আপ্যায়ন করতে লাগলেন। বাথরুমে টয়লেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যান, সিট বালিস ঠিক করে দিয়ে যান। কোনও দরকার আছে কিনা বারেবারে জিজ্ঞেস করে যান।

দশ .

একে তো আমরা ইকনমি ক্লাসের টিকিট নিয়ে একজিকিউটিভ বিজনেস ক্লাসে চড়েছি, তাও আবার জাম্বোজেটের দোতলায়। ড্রিম কামস্ ট্রু বলে একটা কথা আছে, আমাদের তা-ই হয়েছে। তবে আমরা জীবনে কোনওদিন প্লেনের একজিকিউটিভ ক্লাসে চড়তে পারব ভাবিনি, কাজেই আমাদের আনন্দ আর খুশির মাত্রা বোঝাই যায়। ভাগ্যে ছিল, তাই হয়েছে।

আটটা বাজতেই আবার ডিনার। পোলাও মাংস ফিস্ ফ্রাই ইত্যাদি। ডিনারের আগে ড্রিংকস। সামান্য খাদ্য নিয়ে আমরা সারলাম। এরপর লাইট অফ করে দিয়ে ঘুমোবার প্রয়াস। ঘুমিয়েছি হয়তবা কিছুক্ষণ। রাত একটায় আমাদের প্লেন মুম্বাই এসে পৌঁছাল। এটা দিল্লি যাচ্ছে না। আমাদের আর একটা এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট দিল্লি নিয়ে যাবে। এটা যাবে আহমেদাবাদ। আমরা এ্যারোব্রিজ দিয়ে নেমে মুম্বাই-এর এয়ারপোর্টের

লাউঞ্জে এলাম। আমাদের লাগেজগুলি নামিয়ে রাখা হয়েছে। সেটা দিল্লি ফ্লাইটের জাহাজে আপনাআপনি চলে যাবে। বলা হল আটঘন্টা আমাদের লাউঞ্জে বসে থাকতে হবে। লাউঞ্জে এসে তাপসকে (স্ত্রীর ছোটোভাই) ফোন করার চেষ্টা হল, কিন্তু নম্বর লাগছে না। শেষে গুঁরগাও-এ ছেলেকে ফোন করে জানালাম, আমরা আটটার ফ্লাইট ধরে দিল্লি পৌছাব। দুপুরে এগারোটায় সে যেন এয়ারপোর্টে থাকে। তাকেই জিজ্ঞেস করে তাপসের ফোন নম্বর জেনে নিলাম। তাপস ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার চিফ আর্কিটেকট্ হয়ে দিল্লিতে ছিল। গুরগাঁওয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে। মুম্বাই-এ ছোটোছেলে চাকরি করে, তাই আর একটা ফ্ল্যাট কিনে এখন মুম্বাইবাসী। শেষে ছেলে যে ফোন নম্বর দিল সেটাতে ফোন করে তাদের সঙ্গে কথা হল। কেন নেমেই আমরা তার কাছে গেলাম না, অনুযোগ করল। এতক্ষণ এয়ারপোর্টে লাউঞ্জে কী করে কাটাব? এরপর ফরেন এক্সচেঞ্জ কাউন্টারে গিয়ে কিছু ইউরো এবং পাউন্ড স্টার্লিং ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে কনভার্ট করে টাকা নিয়ে এলাম। সারারাত ধরে ডিউটি ফ্রি শপ খোলা রয়েছে। এসে ট্রেনজিট প্যাসেঞ্জার রিপোর্টের কাউন্টারে এসে রিপোর্ট করে নতুন বোর্ডিং কার্ড নিয়েছিলাম। এখন গেলাম রেস্টুরেন্টের দিকে, এক কাপ করে কফি খাওয়ার জন্য। তখন প্রায় চারটা বাজে। অর্ডার দিয়ে দু-কাপ কফি খেলাম। ব্ল্যাক কফি। দাম নিল একশো আশি টাকা। পাঁচটার সময় এয়ার ইন্ডিয়ার লোক এসে বলল, আপনার বোর্ডিং কার্ড দেখিয়ে টিফিন খেয়ে আসুন। দুটোয় আবার রেস্টুরেন্টে গেলাম। ওরা বলল, ফ্রি টিফিনের কোনও অর্ডার তাদের কাছে নেই। ভাগ্যিস, এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসার যিনি আমাদের টিফিনের কথা বলেছিলেন তিনি কাউন্টারে এসে হাজির। তাঁকে বললাম, অর্ডার নাকি নেই। কেন? অর্ডার তো কবেই দেওয়া হয়ে গেছে। তিনি অবাক! রেস্টুরেন্টের লোকগুলিকে বললেন, আমি অর্ডার দিচ্ছি, আপনারা এঁদের টিফিন দিয়ে দিন। শেষমেশ টিফিন পাওয়া গেল। টিফিন নিয়ে আমরা আবার লাউঞ্জে, আমাদের সঙ্গে যে-যাত্রীরা এসেছিলেন তাঁরা আমাদের ডাকল ওখানে জায়গা আছে। কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম করুন, আমরা তা-ই করলাম। শেষে সাতটার সময় আমাদের নয় নম্বর গেইট দিয়ে কার্ড হাতে নিয়ে সিকিউরিটিতে যেতে বলল। সিকিউরিটি এনক্লোজারের পথে, এক্সরে মেশিন, বডি ফ্রিসকিং, বোর্ডিং কার্ডে ছাপ মারা এবং যিনি ফ্রিসকিং করেছেন কার্ডে তার ইনিসিয়েল। এনক্লোজারে বসতে না বসতেই প্লেনে ওঠার জন্য ডাক। ঠিক আটটায় প্লেন নড়ল। প্লেনে আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়েছে ভালো। সঙ্গে কোল্ড ড্রিংকস। তিরিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ে এল প্লেন, নামল দিল্লির ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে সাড়ে দশটায়। এ্যারোব্রিজ হাজারে চার থেকে পাঁচ। যেখানে আমাদের দেশে হাজারে ৬৪। শিক্ষিতের হার যেখানে শতকরা ৯৯ আর আমাদের দেশে গড়ে শতকরা ৫৫। ওদের পিপিসি হচ্ছে ৩০,০০০ ডলার আর আমাদের হচ্ছে আড়াই হাজার ডলার। গড় আয়ু হচ্ছে ওদের ৭৯-৮০ বছর,

আর আমাদের ৬৩-৬৪ বৎসর। উল্লিখিত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে আমরা দেখতে পাই, ইউরোপের দেশগুলো আমাদের দেশ থেকে লক্ষ গুণ উন্নত ও ধনী। লোকসংখ্যাও তাদের অবিশ্বাস্যভাবে কম। যে-কোনও দেশের জিডিপি, দেশের প্রতিটি লোককে সমভাবে ভাগ করে যা আসে, তাকেই বলা হয় মাথাপিছু আয়। লোকসংখ্যা বেশি হলে জিডিপি যাই হোক না কেন তা বন্টনের পরে কম হতে বাধ্য। আমাদের ভারতে তা-ই হচ্ছে, উন্নয়নের সুফল আমাদের জনসাধারণ ভোগ করতে পারছে না। তা বিশাল জনসমষ্টিতে হারিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশ প্রচুর উন্নতি করেছে। খাদ্য উৎপাদনে আমরা এখন স্বয়ম্ভর, কিন্তু এত বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না, ফলে অনাহারে মৃত্যু এখনও লুকিয়ে রাখতে পারছি না আমরা। গড় আয়ের বৃদ্ধি হয়েছে। মেডিকেল প্রযুক্তিতে আমরা ইউরোপের সমকক্ষ, পশ্চিমের রোগিরা আমাদের দেশে আসছেন চিকিৎসার জন্য। বাসস্থানের অভাবে এখনও অসংখ্য মানুষ গৃহহীন, শতকরা ৬৪ জন মাত্র পানীয় জল পায়, শতকরা ৫৪ জনের কোনও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নেই। জনসংখ্যার তুলনায় যতটা বিদ্যালয় দরকার ততটা আমাদের নেই। সেজন্য এখনও শতকরা ৪৫ জন অর্থাৎ ৪৫ কোটি মানুষ আমাদের দেশে নিরক্ষর। পরিধেয় বস্ত্র উৎপাদন হচ্ছে, কিন্তু বেকারত্বের জন্য ক্রয়ক্ষমতার অভাবে বেশিরভাগ মানুষ এখনও অর্ধনগ্ন। বিদ্যুৎ এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা এখনও অর্ধেক মানুষের নাগালের বাইরে। কত বছর পরে এসব সুযোগসুবিধে জনসাধারণের নাগালে আসবে তা কেউ বলতে পারবে না। উন্নত ধনি ইউরোপের কয়েকটা দেশ দেখে মনটা খুব খুশিতে ভরে গিয়েছিল। কারণ প্রাচুর্য দেখলে বড়লোকের দালানকোঠার জৌলুষ দেখলে সে যারই হোক, মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

ইউরোপের দেশ ঘুরে ১১ই জুন দিল্লিতে এসে পৌঁছোলাম। হঠাৎ পত্রিকায় দেখলাম ৭ই জুলাই লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। যেসব জায়গায় এইমাত্র ঘুরে এসেছি, সেসব জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, আল্ কায়দা নাকি এর জন্য দায়ী। জীবন উৎসর্গ করে তারা এখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। তারা এখন পৃথিবীব্যাপী অশান্তির কারণ। এখন পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের শত্রু হয়ে, বলা যায়, বিশেষ করে সাদা মানুষের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ এখন আর লুকোতে পারছে না। কিন্তু কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের যেতে হবে আফগানিস্তান, ইরাক বা প্যালেস্তাইনে, যেখান মুসলিমদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অন্যায়, অবিচার এবং সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা রুখে দাঁড়াতে চাইছে। নিজের জীবন উৎসর্গ করে তারা কোথাও প্রতিরোধ কোথাও প্রতিশোধের জন্য প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

তাদের বাধ্য করা হচ্ছে এইসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস হবার পরে আমেরিকা সতর্ক হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের স্বভাব বদলায়নি। ভিয়েতনামের যুদ্ধও তারা ভুলে গেছে। তারা সমগ্র পৃথিবীটাকে পদানত করার প্রয়াস এখনও জারি রেখেছে। মিথ্যার বেসাতি করে তারা ইরাক আক্রমণ করে পদানত করেছে। এখন ইরান এবং উত্তর কোরিয়াকে পর্যুদস্ত করার জন্য নানা অজুহাত তৈরি করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

আমেরিকার সঙ্গে যুক্তরাজ্য এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলো সহযোগিতা করে চলেছে, ফলে ইউরোপে এবং আমেরিকায় সহসা শান্তি আসবে বলে মনে হচ্ছে না। বর্তমানে আমেরিকা ইরানকে অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখাতেও শুরু করেছে। যদিও ফ্রান্স তাকে নিরস্ত্র করতে চাইছে।

যারা ধনী তারা আরও ধনী হতে চায়, যারা শক্তিধর তারা আরও শক্তিমান হতে চায়, নইলে আমেরিকা আর ইউরোপে কেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যবসাবাণিজ্য করে ধনদৌলত সমভাবে বন্টন করে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে বাঁচতে পারে না? তাদের কোনও কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু তারা তা পারে না, এই কারণে যে তারা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নাগপাশে বন্দি। এ সমাজে লোভ এবং মুনাফাই হচ্ছে শেষ কথা। সেখানে সমাজের বৃহত্তর গরিব অংশের সুখদুঃখের সঙ্গে মুষ্টিমেয় কতিপয় ধনিক বণিকদের কোনও সম্পর্ক নেই। জাতিপুঞ্জের (ইউএনও) হিসেব মতে পৃথিবীর ৬৪৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৪৯০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি। তার মধ্যে ১১০ কোটি মানুষের দৈনিক আয় ১ ডলারের নিচে। আমাদের ভারতে ৩৬ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। মনুষ্যসমাজে অতীতে যখন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হয়নি তখন সরাসরি দ্রব্য বিনিময় করে ব্যবসাবাণিজ্য করা হত। এক গোষ্ঠীর উদ্বৃত্ত জিনিসের বদলে অন্য গোষ্ঠী খাদ্যশস্য বা অন্য কোনও জিনিস নিতে পারত। এটা হত সমানে সমানে, যার যার চাহিদা অনুযায়ী। আর মানুষের তো চাহিদার অন্ত নেই। এখন হচ্ছে গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়া। ছলে-বলে-কৌশলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করা, হুমকি দিয়ে নয়ত নগ্নভাবে অস্ত্র দিয়ে একটি দেশ বা রাজ্য দখল করে বাজার তৈরি করা। নিজের দেশের পণ্যকে যেভাবেই হোক সে দেশে বিক্রি করে মুনাফা লোটা। দেশে যদি সেই পণ্যের চাহিদা নাও থাকে, তবু কায়দা করে আগ্রাসী দেশের জন্য সেখানে বিক্রি করবেই। যেমন আমেরিকা খুব সস্তা দরে খুব কম আমদানি শুল্ক দিয়ে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে চায়। যদিও আমাদের খাদ্যশস্যের দরকার নেই। আমাদের দেশে তাদের রপ্তানি করা জিনিস সস্তা দরে বিক্রি হয়, তার সঙ্গে আমাদের উৎপাদকদের জিনিস সেই দরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে না। তখন আমাদের কৃষকদের সে জিনিস তৈরিতে আর উৎসাহ

থাকবে না। আমাদের দেশে ক্রমে সে জিনিস আর উৎপাদন হবে না। সে জিনিসের আকাল দেখা দেবে। তখন তারা তাদের জিনিসের দাম বাড়িয়ে আমাদের দেশ থেকে লাভের মুনাফা বেশি করে লুটে নিয়ে যাবে। এইভাবে পরোক্ষভাবে আমাদের দেশে তারা বাজার দখল করছে। কিংবা দখল করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সরকার তাদের কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য ভর্তুকি দিতে পারবে। আমাদের সরকার আমাদের কৃষকদের সেভাবে ভর্তুকি দিতে পারবে না, এই হচ্ছে তাদের বিচার। এরাই একমাত্র দেশ যারা পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারবে অন্য কোনও দেশ আনবিক রিঅ্যাকটার দিয়ে বিদ্যুৎও তৈরি করতে পারবে না, আনবিক অস্ত্র তো দূরের কথা।

শক্তিশালী দেশের রাষ্ট্রনায়কদের এই একপেশে, অযৌক্তিক মনোবৃত্তি এবং তার ফলশ্রুতিতে যে বিদেশনীতি তারা অনুশীলন করে চলেছে, তাতে পৃথিবীতে সহসা শান্তি আসার সম্ভাবনা নেই। সমগ্র মানবসমাজকে আজ এই নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে তাদের তা থেকে নিরস্ত্র করতে হবে। তবেই শান্তি আসবে।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বেমার তাই বিনি কাসুনানি কক (চিকিৎসা সংক্রান্ত ককবরক বই)
বেমার তাই বিনি হামরিমুঙ (সাধারণ অসুখবিসুখ বিষয়ক ককবরক বই)